কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি

২

সম্পাদনা

কিরীটি মাহাত • বিশ্বনাথ মাহাত

কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি
(২য় খন্ড)

সম্পাদনা :
কিরীটি মাহাত
বিশ্বনাথ মাহাত

মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি

Kudmali Vasa O Sanskriti (2)
A Collection of Essays on Kudmali Language & Literature
Price : 350.00

❖ গ্রন্থস্বত্ব : কিরীটি মাহাত

❖ প্রথম প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর, ২০২২

❖ প্রকাশক : মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি-র পক্ষে বিশ্বনাথ মাহাত।

❖ প্রচ্ছদ : পার্থপ্রতীম দাস

❖ বর্ণ সংস্থাপন : বুদ্ধেশ্বর মাহাত

❖ মুদ্রণ: সারনা প্রিন্টার্স, মহানন্দ চক্রবর্তী লেন, মুনসেফডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

❖ প্রাপ্তিস্থান : বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ৫ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কোলকাতা-৭০০০৭৩, এ.কে. ডিস্ট্রিবিউটর, পুরুলিয়া।

❖ ঋণস্বীকার : আমজাদ কাজী ওরফে সারিআন মাহাত, শ্রীপদ বঁসরিআর,
সাধন মাহাত, ফুলচাঁদ মাহাত।

❖ ISBN :

❖ মূল্য : ৩৫০ টাকা

উৎসর্গ

ড. বঙ্কিম মাহাত

ডাঃ বিদ্যাভূষণ মাহাত

অজিত প্রসাদ মাহাত

— সূচীপত্র —

অসরান

কুড়মি জাতি, কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি আজ একটি আন্তজার্তিক চর্চার বিষয়। নিঃসন্দেহে এর কারণ বিষয়টির অপরিসীম গুরুত্ব ও মহত্ত্ব। দুর্ভাগ্যের বিষয় সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, ওঁরাও, শবর আদি জনজাতি ও তাদের ভাষা-সংস্কৃতি নিয়ে দীর্ঘ অতীতকাল থেকে অনেক অনেক চর্চা, গবেষণা হয়েছে, গুরুত্ব পেয়েছে কিন্তু কুড়মি জাতি ও তার সংস্কৃতি আজও সেভাবে গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু এইকথা সর্বৈব সত্যি যে কুড়মি জাতি হলো ভারতবর্ষের অন্যতম একটি আদিম মানবগোষ্ঠী। যাঁরা প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে নানা নামে, নানা পরিচয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং আরো আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁরা প্রায় সকলেই আজও কৃষিকেন্দ্রিক এবং নিবিড় কৃষিজীবি সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। বলা যায় এরাই হলো ভারতের প্রাগৈতিহাসিক কৃষি সভ্যতা সংস্কৃতিরও স্রষ্ঠা বা জনক। অতীব লক্ষ্যণীয় বিষয় সেই প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির ভাষা, সমাজ এবং সাংস্কৃতিক পরম্পরা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, বাক ও স্মৃতিগুলি এরা আজও সযত্নে বহন করে চলেছে। তার অকাট্য বহু প্রমান ও নিদর্শন এই সমাজের মধ্যে আজও বর্তমান। এর থেকে দাবি করাই যায় এই জনগোষ্ঠীর মানুষেরাই নিশ্চিত কোনো একদিন কৃষির সূচনা ও আবিষ্কার করেছিল। জন্ম দিয়েছিল ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির। তাই আরও দাবি করা যায় এদের মাতৃভাষা কুড়মালিও হলো মানব সভ্যতার অন্যতম একটি প্রাচীন ভাষা। আসলে কুড়মি ও কুড়মালি হলো একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার প্রতীক। যে সভ্যতায় রয়েছে বহুমুখী দিক ও দিগন্ত।

আশাকরি সুধী পাঠক কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রন্থের ২য় খন্ডের প্রতিটি প্রবন্ধে এর পরিচয় পাবেন। এই জাতির নানা গৌরবময় দিকগুলির সন্ধান পাবেন। আমাদের সংকল্প পরবর্তীকালে আরও তা খন্ডে খন্ডে প্রকাশিত হবে।

এই সংকলনে যাঁরা মূল্যবান লেখা দিয়ে গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁরা সকলেই সম্মানীয় পন্ডিত গবেষক। এই সংস্কৃতির স্বনামখ্যাত ব্যক্তি । তাঁদের প্রত্যেককে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা।

-সম্পাদক

জাতি

ভারতের কৃষি সভ্যতা ও কুড়মি জাতি

কিরীটি মাহাত

মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম পীঠস্থান হলো এই ভারতবর্ষ। পৃথিবীর পাঁচটি সভ্যতা সংস্কৃতির একটির জন্ম এই ভারতবর্ষেই। ঐতিহাসিকগণ যাকে সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা, হরপ্পা-মহেঞ্জদড়ো সভ্যতা অথবা সিন্ধুঘাটি সভ্যতা বলে অভিহীত করেছেন। পৃথিবী বিখ্যাত প্রত্নবিজ্ঞানী জি.এল.পসেলের মতে চীন, সুমের, মিশরের প্রাচীন সভ্যতা সমূহের তুলনায় সিন্ধু সভ্যতা নানা দিক থেকেই অনেক উন্নত ছিল। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে সিন্ধু-সরস্বতী তথা পঞ্চ নদ ভূমিকে কেন্দ্র করেই যে এই মহান কৃষি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা আজ সর্বজন বিদিত এবং স্বীকৃত। আর কেবল কৃষিই নয়- কৃষিবাণিজ্য কেন্দ্রীক সমৃদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণ সুসভ্য উন্নত নাগরিক সভ্যতার এক অসামান্য নিদর্শন হলো এই সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা। বর্তমান গবেষণার দাবী অনুসারে এই সভ্যতার সময়কাল সাড়ে আট হাজার বছরেরও প্রাচীন হলে, পৃথিবীতে কৃষি সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন নিঃসন্দেহে এইটিই প্রাচীনতম। কিন্তু লাখ টাকার প্রশ্ন, এই মহান কৃষি সভ্যতার স্রষ্টা কে বা কারা বা কোন জনগোষ্ঠীর মানুষ? প্রায় দশ হাজার বছর পরেও সেই সভ্যতার কোন স্মৃতি বা পরম্পরা আজও বেঁচে রয়েছে কি না? থাকলে কে তার ধারক বাহক? প্রশ্ন আরও থেকে যায়, কেবল উন্নত সভ্যতায় নয়, এই সভ্যতার মানুষেরাই কি কৃষির সূচনা বা আবিষ্কার করেছিল? সে রকম প্রত্যক্ষ নিদর্শন আজও বেঁচে রয়েছে কিনা? স্বভাবতই বিষয়টির আলোচনায় এইরকম হাজারো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

সিন্ধু থেকে সুমেরের নদী উপত্যকা অঞ্চলেই যে কোন এক সময়ে প্রকৃতিকে অতিক্রম করে মানুষের প্রথম উৎপাদনী আবিষ্কার কৃষি এবং মনের উৎপাদনী আবিষ্কার সংস্কৃতি তথা সর্বোপরি বাণিজ্যের সূচনা ঘটেছিল এমনতর অনুমানের ভিত্তি রয়েছে। সুবিখ্যাত "এনসিয়েন্ট সোসাইটি" গ্রন্থের লেখক লুইস হেনরি মর্গ্যান প্রকারান্তরে এই কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর কথায়- "ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় ভারতে

এবং এশিয়ার স্টেপ অঞ্চল সমূহে, পশুকে পোষ মানানোর ফলে এক নতুন ধরণের জীবনযাত্রা শুরু হয়ঃ প্যাস্টোরাল বা পশুচারণের জীবন।" অধ্যাপক জোনাথন মার্ক কেনোয়ার তাঁর "সিন্ধু ঐতিহ্যে সমাজ ও সংস্কৃতি" প্রবন্ধে আরও বলেছেন, "খ্রীষ্টপূর্ব ১০,০০০ অব্দ নাগাদ প্লাসটোসিন যুগের শেষে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই জাতীয় অর্থনৈতিক রুপান্তর শুরু হয়েছিল-পশ্চিম এশিয়ার মিশরের উত্তরাংশ থেকে মেসোপটেমিয়া এবং আফগানিস্থান থেকে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত। এই কৃষিকেন্দ্রীক সভ্যতা সংস্কৃতির স্রষ্টা এবং ধারক বাহক কারা তা আজও রহস্যে ঢাকা, ইতিহাসও এখানে নীরব।" এই প্রশ্নের সমাধানে ঐতিহাসিকগণ নীরব হলেও ভারতের কৃষি সভ্যতা সংস্কৃতির অন্যতম ধারক বাহক কুড়মি জাতি ও কুড়মালি সভ্যতা সংস্কৃতি যে এই প্রশ্নের যথার্থ সমাধান দিতে সম্ভব সে প্রসঙ্গে আমরা পরে যাব তবে তার পূর্বে বিশিষ্ট নৃ-বিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী ও প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ A.L. Bassam এর সেই অভ্রান্ত উক্তিটিও আমাদের স্মরণ করে নেওয়া ভালো। তিনি তাঁর জনপ্রিয় গ্রন্থ "The Wander : that was India" বা "অতীতের উজ্জ্বল ভারত" গ্রন্থে মানব সভ্যতায় ভারতের অবদানের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, "প্রাক আর্য যুগে এ দেশে কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল এবং এর জন্য সারা বিশ্ব ভারতের কাছে ঋণী।" মণিশী বসমের সত্য দৃষ্টি ও সুস্পষ্ট কথন থেকে এই কথায় প্রতীয়মান হয় যে অতি প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষেই মানুষ অরণ্য জীবন থেকে কৃষিতে উত্তরণ ঘটাতে সমর্থ হয়েছিল এবং উন্নত কৃষি সভ্যতা গড়তেও সমর্থ হয়েছিল। কেবলমাত্র তাই নয় কৃষি বাণিজ্যকেন্দ্রীক অর্থনীতি ও আধুনিক নাগরিক সভ্যতারও স্রষ্টা ছিল তারাই। সভ্যতার অগ্রগতিতে সারা বিশ্বকে তারা পিছনে ফেলে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিল। সে কথায় বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত "ইতিহাস অনুসন্ধান" ১৪নং খন্ডে- "কৃষি নির্ভর স্থায়ী সভ্যতা সৃষ্টির পরেও (হরপ্পা) প্রায় দু হাজার বৎসর ইউরোপের সমস্ত অঞ্চল বরফাচ্ছাদিত ছিল।"

ভারতবর্ষের এই মহান কৃষি সভ্যতা হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়, কালিবোঙা, লোথাল বা বিশিষ্ট কয়েকটি শহরকেন্দ্রীক (১০৫২টি কেন্দ্র) বা পঞ্চনদ কেন্দ্রীকই ছিল না এই কৃষি সভ্যতা ভারতের প্রায় ৫ লক্ষ বর্গ কিমি অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। বলা যায় প্রায় সারা ভারতবর্ষ জুড়েই এই সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল তারও বহু প্রমান পাওয়া যায়। এই মহান কৃষি সভ্যতা কিভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল সে বিষয়ে পন্ডিতদের মধ্যেই বিবাদ রয়েছে। এছাড়াও সিন্ধু লিপি আজও অপাঠ্য হওয়ায় এই সভ্যতার ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়ে বহু কিছুই আজও জানা সম্ভব হয়নি। তবে এই কথা আমাদের মনে রাখতে হবে কোন সভ্যতা সংস্কৃতি কোন বিশেষ শহর বা নগর কেন্দ্রীক

যেমন হয় না তেমনি তার ধ্বংসের সঙ্গে এর বিলুপ্তির প্রশ্নও অবান্তর। সভ্যতা সংস্কৃতি মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত। তা ধ্বংস হতে হাজার হাজার বৎসর সময় প্রয়োজন হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা বহিঃশত্রুর আক্রমনে বহু মানুষের মৃত্যুও ব্যাপক ধ্বংস লীলাও সম্ভব কিন্তু একটি সভ্যতা সংস্কৃতির সব মানুষের মৃত্যু বা সম্পূর্ণ অবলুপ্তি কখনোই সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রেও তা হয়নি। ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী বা মূলবাসী মানুষদের বিশেষ করে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের সভ্যতা সংস্কৃতির অভ্যন্তরে আজও এর অনুসন্ধান অত্যন্ত জরুরী। মতভেদ থাকলেও পন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ণ এই কৃষি সভ্যতার স্রষ্টা ও ধারক বাহক হিসেবে দমিল বা দ্রাবিড় জাতির মানুষদেরই কৃতিত্ব বলে দাবী করেছেন। যারা 'দর' বা "দ' কেন্দ্রীক কৃষি ও কৃষি সভ্যতা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। অর্থাৎ "দ্রব = তরল এবং "ভিভিদি" = তেলেগু ভাষার দৃষ্টিতে এর অর্থ যে সব মানুষ নদ ও নদীর বা সরোবরের ধারে বসবাস করত। তাদেরই দ্রাবিড় বলা হত। কুড়মি জাতির মানুষেরাও নিজেদের দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত জনজাতি বলেই মনে করে। কুড়মালি প্রবাদেই রয়েছে কুড়মিদের সেই আদিম পরিচয়-

"জঁদে জঁদে পানিক সত
তঁদে তঁদে কুড়মিক জট।"

বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় আজও সমগ্র ভারতবর্ষের কুড়মিরাই 'দ্রব' ও 'ভিভিদি'-র আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি। এমন সুমহান সভ্যতার যারা স্রষ্টা তারা তাদের জীবনদর্শন থেকে সরে যাবেই বা কেন? হাজার হাজার বছর প্রাচীন তাদের সভ্যতা সংস্কৃতির অনন্য কৃতি ও কীর্তি, ভাষা, সাহিত্য, নৃত্য, গীত, আচার অনুষ্ঠান, সংস্কার, সংস্কৃতি বিশ্বাস, স্মৃতি ও চিহ্নগুলি পরম যত্নে আজও তারা আগলে রেখেছে। এইগুলিই তাদের জাতিসত্ত্বার পূর্ণ পরিচয়। ইতিহাসও বটে। তবে সে ইতিহাসের বিবর্তন ও স্বরূপটির সটিক পাঠ আজ অত্যন্ত জরুরী। তাই আজকের অভিধায় যারা কুড়মি, কুর্মি, কুনবি, কুলবি, কুরুম্বা, কুড্ডুবা, কুড্ডুম্বা, সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও, হো, খাড়িয়া শবর জনজাতি বেদ ও বেদোত্তর পর্বে তাদের পরিচয় কি ছিল তা বিশেষভাবেই বিচার্য বিষয়। চুমুরি, ধুনি, অসুর, বঙ্গৃদ, পিপ্রু, পিশাচ, শম্বর, খত্র, শুষ্মক, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, সৃবিন্দ, অর্বুজ, দাস, দস্যু, যাতুধান, অহি, বর্চি, বরশিখ, ক্রিবি, বৃচিবন্ত, দ্রুহ্য, মল্লই, সিবি আদি জাতিগুলি যে ভারতের আজকের আদিবাসীদের পূর্বজ এই বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। সম্ভবত এদের একটি অংশের সম্মিলীত রুপটিই ছিল খেরোয়াল বা খেরোয়াড়। "বাঙ্গালীর ইতিহাস" গ্রন্থের লেখক নীহার রঞ্জন রায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন,-"হরপ্পা হলো নিগ্রোবটু, নিষাদ, অসুর, রাক্ষস,

দ্রাবিড়, কুটুম্বিয়ান জাতিগুলি সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা।” বিশিষ্ট গবেষক অমরেন্দ্র ভট্টাচার্য এই মতটিকেই গুরুত্ব দিয়ে তার “সিন্ধু লিপির সন্ধানে” গ্রন্থে বলেছেন-“সিন্ধু উপত্যকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি থেকে তাদের যে ধর্ম বিশ্বাস ও সংস্কৃতি ফুটে উঠে সেগুলো বর্তমান ভারতীয় আদিবাসী সমাজের জনগোষ্ঠীর (খেরোয়াড় গোষ্ঠীর) ধর্ম বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া কলাপের সঙ্গে বেশ মিলে যায়। অপরদিকে নৃতাত্ত্বিক তত্ত্বে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীর সঙ্গে ভারতীয় আদিবাসী জনজাতির সাদৃশ্য বর্তমান। তাই সিন্ধু সভ্যতার লিপি খেরোয়াড়ী গোষ্ঠীর ভাষাগুলোর হরফ হিসেবে গণ্য করার ধারণাটা জোরদার হয়। (পৃষ্ঠা-৩৪)

ভট্টাচার্য মহাশয়ের ধারণার যৌক্তিকতা বা সারবত্তা অনস্বীকার্য কিন্তু এই বৃহৎ খেরোয়াড় জনগোষ্ঠী বলতে কেবল সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, শবর আদি বিশেষ জনগোষ্ঠীগুলির কথা ভাবলেই হবে না খেরোয়াড় জনগোষ্ঠীর বড় ভাই বা মূল জাতি কুড়মি জনগোষ্ঠীর বিষয়ে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় তাঁর আলোচনা বিশ্বাস যোগ্যতা বা সম্পূর্ণতা পায়নি। কারণ কুড়মিরাই আজও ভারতবর্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষিজীবি জনগোষ্ঠী। যারা আজও প্রাচীন কৃষি সভ্যতা সংস্কৃতির অন্যতম ধারক এবং বাহক। এরাই ভারতীয় কৃষির মূল মেরুদন্ড। অধ্যাপক গোপবন্ধু মহন্ত-র মতে সারা ভারতবর্ষে এদের সংখ্যা ২০ কোটির অধিক। খেরোয়াড় প্রসঙ্গে “বাঙ্গালীর ইতিহাস” গ্রন্থের লেখক নীহার রঞ্জন রায়ের উক্তিটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, “ইহাদের সবারই জীবিকা ছিল কৃষিকার্য একথা বলা যায় না।...নিষাদ ও ভীল কোল শ্রেণীর মুন্ডা, গদব হো, সাঁওতাল প্রভৃতিরা ছিল প্রধানত পশু শিকারজীবি।” যুক্তির খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় সিন্ধু সভ্যতা ছিল হড় বা খেরোয়াড় সভ্যতা তাহলে এই কৃষি সভ্যতার মূল চালিকা শক্তি বা স্রষ্টা কারা ছিল? সিন্ধুর বিষয়ে গবেষণা ঠিক এই জায়গায় আজও পৌঁছায়নি। খেরোয়াড় সভ্যতা বা সিন্ধু সভ্যতার বিষয়ে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা আশা করি এই প্রশ্নের সদুত্তর দিবে। প্রথমতঃ “খেরোয়াড়” শব্দটি। কুড়মালি ভাষার দৃষ্টিতে শব্দটি দুটি শব্দের সম্মিলন বলেই মনে হয়। এক “খের” অপরটি “হড়”। খের কথাটির অর্থ ও সমার্থক শব্দগুলি হলো -খড়, খেরই, খারিপ, খলিহান, খেড় ইত্যাদি। যার মূল অর্থ দাঁড়ায় খড় বা ধানের পোয়াল এবং বৃহৎ অর্থে শস্য বা ফসল। আর সকল আদি ভাষায় হড় কথার অর্থ মানুষ। যুক্ত ভাবে খেরোয়াড় শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় শস্য বা শস্য উৎপাদনকারী মানুষ বা কৃষক সমুদায়। কৃষির আবিষ্কার থেকে কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষি বাণিজ্যকেন্দ্রীক সভ্যতার সুচনার কৃতিত্ব খেরোয়াড় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বিশেষভাবে কুড়মি জাতির প্রাপ্য। এই দাবীর সবচেয়ে বড় প্রমান এদের জাওয়া-করম, বাঁদনা,

টুসু, আখান, রহিন আদি কৃষি আচার ও উৎসবগুলি। জাওয়া বা করম উৎসব বিশেভাবে প্রমান করে এই সমাজের মেয়েরাই কোন একদিন কৃষির আবিষ্কার করেছিল। এই উৎসব তারই স্মৃতি উৎসব। বালিতে বীজ পুঁতে অঙ্কুরউদ্গমের রহস্য যে একদিন মেয়েরাই করেছিল ফ্রেজারের "গোল্ডেনবাও" গ্রন্থে তার সমর্থন রয়েছে। খেরোয়াড় গোষ্ঠীর অনেক সম্প্রদায়েই করম বা কারমা উৎসব পালন করলেও জাওয়া করম উৎসবের মূল আচার, অনুষ্ঠান পারম্পরিক রীতিগুলি কুড়মিরা যেভাবে পালন করে অন্যেরা সে ভাবে নয়। তাই দাবী করাই যায় কুড়মি মেয়েরাই কোন একদিন এই রহস্যের উন্মোচন বা আবিষ্কার করেছিল।

যাইহোক মানব সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাসে এই খেরোয়াড় জাতির উপস্থিতির কিছু অপ্রত্যক্ষ প্রমান পাওয়া যায়। যেমন বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়ের কথায়-"বাবিরুষ অধিকার করেন কাশিয়গণ। তাহাদিগের সর্বপ্রাচীন দেবতার নাম সূর্যস, পবন দেবতা, মরুওস, (মরুৎ) ইহারা আপনাদিগকে "খারি" নামে অভিহিত করিত।" স্ট্র্যাবোর মতে, "আবেস্তার airyao dahavo বা আরিয়ান বলিতে পূর্ব ইরাণের অন্তর্ভূক্ত আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান প্রভৃতি বোঝায়।... আরিয়ার অধিবাসীদিগকে হৈরভ, হারে, বা হারি বলা হইত। সিরিয়া, মিশর ও মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে হারি বা খারি (Hari, Khari) জাতির নাম উল্লেখিত হইয়াছে।" সোভিয়েত নরতত্ত্ববিদ স্টার্ভে সিন্ধু সভ্যতায় "হাড়ি" জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। আবার Hrosny-এর মতে হারি বা হাড়ি জাতি অনার্য জাতি। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই হারি, হাড়ি বা খারি শব্দগুলি সবই কুড়মালি বা খেরোয়াড়ী ভাষার নিজস্ব শব্দ। যার অর্থ মানুষ। যার ধাতুরুপটি হলো "হড়" বা হর। ব্যাপক অর্থে যা সমস্ত পার্থিব বস্তু, জীবজন্তু, প্রকৃতি, উদ্ভিদ শস্যশ্যামলতাকেও তা বোঝায়। সারা ভারতবর্ষেই এই আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষজন হো, হোরো, হড়, হাড়ি আদি নামে আজও পরিচিত ও অভিহীত হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে এরাই সাঁওতাড়, হো, মুন্ডা, বীরহড়, শবর খেড়িয়া, হাড়ি, কুড়মিদের কইড়আর, বঁসরিআর, কেসরিআর, গুলিআর, কেটিআর, বানুহার, আদি টোটেম বা গুষ্টি নামে এরা পরিচিতি লাভ করেছে। টোটেম নামের শেষে উক্ত "আর" শব্দটি যে "হর বা হড়" শব্দেরই বিকৃত রুপ এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। সিন্ধু সভ্যতার বিনাশ কালেই খেরোয়াড় সমাজ সার্বিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। টোটেম বিভাজন ও পরিচিতির পর পেশা, বৃত্তি বিভাজন তথা কর্মের ভিন্নতার কারণে এরা পৃথক পৃথক সম্প্রদায় ও জাতিসত্ত্বার পরিচিতি লাভ করে। কুড়মি শব্দের বহুল মান্যতার পূর্বে এই কুটুম্বিন শব্দটির স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা বেশী ছিল তার প্রমান পাওয়া যায়। আবার কুড়মি শব্দটির ব্যুৎপত্তি ও ব্যাখ্যায় অনেকে "কুটুম্বিন"

শব্দের বিবর্তনে এর সৃষ্টি বলেও মত প্রকাশ করেন। কুটুম্বিন শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে। তাৎপর্য্যপূর্ণ বিষয় কুড়মি জাতির মানুষ নিজেদের কুটুম্ব সমাজ বলেই আজও অভিহীত করে। তবে অর্থ শাস্ত্রেরও বহু পূর্বকালেই কুরুম বা কুড়ুম শব্দটি একটি প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজন মান্য শব্দ ছিল তা প্রমান করে ক্রুমু বা কুরুম নদী, কুড়ুম পাহাড় (কারাকোরাম?), কুর্মাঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থান ও স্থান নামগুলি। কুড়মালি সংস্কৃতির জাউআ করম গীত, বিবাহ গীত, বাঁদনা গীতে বারবার কুরুম দেশ বা উপত্যকা, কুরুম নদী, কুরুম বা কুড়ুম পাহাড়ের নানা স্মৃতি ও প্রসঙ্গের উল্লেখ সেই কথায় প্রমান করে। যেমন-

<u>জাউআ গীত</u>

কনে রে করম গুসাঞ আনল নেউতি
কুরুম নেদিক ধারিঞ কনেরে করল খেতি।
তহরি বেনাউঅল খেতিঞ কুরুমেক পানি
ছউআ পুতা লেহি গসাঞ করলে খেতি।
ভিনসার হেল মাহান, ডালা লেই বাহরাই
চালা সভে ফুলা লঢ়ে কুরুম পাহাড়ি।।

অর্থাৎ, কে করম গুসাঞ বা দেবতাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছে? কেই বা কুরুম নদীর তীরে খেতি বা কৃষি করে? তোমার দান এই কৃষি জমিতে কুরুম নদীর জল সেচ করা হয়। কৃষি ও এই সকল সন্তান-সন্ততি সবই তো করম ঠাকুরের দান। ভোর হলেই চল সকলে করম ঠাকুরের পূজার জন্য কুড়ুম পাহাড় থেকে ফুল তুলে নিয়ে আসি। কৃষিতে প্রযুক্তি ব্যবহার ও জল সেচের ব্যবস্থা ও ব্যবহারকালেই কুড়মি জাতির মানুষ সুমের থেকে সিন্ধুর মধ্যবর্তী অঞ্চলে যে বসবাস করত গীতটি তার সুনির্দিষ্ট প্রমান।

তবে ভাবা যেতেই পারে কুর্মাঞ্চল, কুরুম নদী বা কুরুম পাহাড় শব্দগুলির পিছনে কুরু বা কুড়ু শব্দটিই বিদ্যমান। কুরম, শব্দটি তেমনি ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্য বহন করে। যেমন দ্রাবিড় ভাষায় চালকে বলা হয় কুরু বা কুড়ু। কুড়ব অর্থে ধানও বোঝায়। আবার কুরু অর্থে শস্যদানাও হতে পারে। কারণ তামিল ভাষায় মাড়ুআকে বলা হয় "কুরুক্কান"। হলে কুর্মাঞ্চল অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যায় আরও বলা হয়েছে- "According to the Anthropological Survey of India the term Kunbi is derived from "Kun" and 'bi' meaning People and Seeds respectively. The two terms mean those who germinate more Seeds from one Seeds.

Another etimologi States that Kunbi is belived to have Come from Sanscrit "Kur" mean agriculture tillage. Yet another etimology states that Kunbi derives from Kutumba (family):
(http/trti.gujrat/gov.in/kunbi).
ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি (৩য়) গ্রন্থে ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত বলছেন, "কুল্য শব্দের মূল "কুল" (ল্যাটিন colo) অর্থ কর্ষণ বা চাষ করা।" শব্দটি যে বিশ্ব ভাষায় স্থান করে নিয়েছিল এইগুলি তারই প্রমান। ভাবা যেতেই পারে মূল কুর, কুল, colo বা কুল্য শব্দ থেকেই বিশ্বভাষায় নানা নতুন শব্দেরও সৃষ্টি করেছে। যেমন ইংরেজী cult, Cultivation বা Culture শব্দ। তেমনি কোল, এবং কুর, কুল বা কুল্য থেকেই কুলুম্বি → কুরুম্বি → কুরুমি → কুড়ুমি শব্দের সৃষ্টিও যথাযথ ও প্রকৃত অর্থবহন করে।

সংস্কৃত এবং বাংলাতে কৃষ্টির সঙ্গে কৃষির সম্পর্কই জড়িত। পন্ডিতগণ বলেন ভূমিকর্ষণই ছিল নবপোলীয় যুগের কৃষ্টির বনিয়াদ। এই কৃষ্টি শব্দের উৎস নাকি কৃষি শব্দ থেকে। যা People অর্থও বহন করে। এর থকে অনুমান করা যায় ভাষা, সংস্কৃতি এবং লিপি সবই সৃষ্টির পিছনে রয়েছে কৃষি। কৃষকেরাই পৃথিবীর মানব সভ্যতার স্রষ্টা, সৃজক, পালক, ধারক এবং বাহক। এই সত্যকে আজ মেনে নিতে হবে। ভারতের প্রাচীন ভাষা ও লিপির নিদর্শন হলো সিন্ধু সভ্যতার সিলমোহরগুলি। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় সিন্ধুর অধিকাংশ লিপি আজও কুড়মি জাতির মানুষ বহন করে চলেছে। সিন্ধুর ভাষাটির ক্ষেত্রেও এই কথা সত্য হবে এই অনুমানের যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে। এই বিষয়ে লেখকের "সিন্ধু সভ্যতার ভাষা ও কুড়মালি" পুস্তিকাটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

এছাড়াও অথর্ব বেদে "প্রজা কুরু" দের উল্লেখ এবং মহাভারতের কুরু বা কৌরব বংশের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির কথা সর্বজন বিদিত। সারা ভারতবর্ষেই কুরু বা কুড়ু নামধেয় অজস্র জাতির পরিচয় পাওয়া যায় যা সম্ভবত মূল একটি কৃষিজীবি জনগোষ্ঠী থেকেই দেশ ও কালের অমোঘ ভেদ ও প্রভাবেই নানা জাতি ও জনগোষ্ঠীতে বিভাজিত হয়ে পড়েছে। যেমন- কুনবি, কুরুবা, কুরুমান, কুরুম্বাস, কোলি মালহার, কুবি, কাপু, কানবি, কুরুবাস, কুরমি ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি গ্রন্থে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এদের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, "কাদির, কুরুম্বা, নিম্ন জাতির লোকসমুহ লম্বা মাথা, চওড়া নাক ও ক্ষুদ্রকায় বিশিষ্ট। ইহাদিগকে দ্রাবিড় পূর্ব Pre-Drabidian বলা হয়।" আরও বলা হয়েছে-

others spellings and varient include: Kulubi (Daccan) Kulwadi (South Kankon) Kanbi (Gujrat) Kulbi (Belgaun) Reddies (Andhra Pradesh), Kurmi (Bihar, Uttarprades) Jharkhand Sing and Lal also report Coccona is Synonymous with Kunbi in Gujrat." (NET)

বহু নামে বহু অভিধায় অভিহিত এই সমস্ত জাতি বা জনগোষ্ঠীর মানুষেরাই ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী এবং এরাই ভারতের প্রাচীন কৃষি সভ্যতার স্রষ্টা এবং মূল ধারক বাহক। লুইস হেনরি মর্গানের তত্ত্ব অনুসারে এরাই প্রথমে মধ্য প্রাচ্য ও ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে পশুচারণের জীবন থেকে কৃষি সভ্যতার সূচনা করেছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে আনুমানিক ১০,০০০ বছরেরও অধিক কাল পূর্বে এই অর্থনৈতিক রুপান্তর শুরু হয়েছিল। এই অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী দ্রাবিড় পূর্ব জনগোষ্ঠীর মানুষেরাই। হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যকে মেনে আজও তারা 'দর' (জল, নদী) দেখেই 'বিড়' বা বিড়া (বসতি) স্থাপন করে রয়েছে। ভারতের কৃষি সভ্যতা সংস্কৃতি প্রাগার্য মানুষদেরই সৃষ্টি আর্যদের নয়। ঐতরেয় আরণ্যকে স্বীকার করা হয়েছে অনার্যরা পৃথিবীর সন্তান। এই পৃথিবীর সন্তান বলতে নিঃসন্দেহে মাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ভূমিপুত্রদেরই বলা হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে আর্যরা কৃষি কাজ জানত না। লাঙ্গল অশুদ্ধ তাই উচ্চবর্ণের লোকদের তা স্পর্শ করা উচিত নয় বলে মণুর নির্দেশ ছিল। এছাড়াও মণুর নির্দেশ ছিল, "দ্বিজ ধর্মে অচল প্রতিষ্ঠিত হও সদাচরণ অক্ষুন্ন রেখে বসতি বিস্তার করো সেই দেশে যেখানে শুদ্র কৃষি বৃত্তিতে নিয়োজিত।"

পৌরাণিক যুগে এরা শুদ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও ঋক্ বৈদিক যুগে এই পশুপালক ও কৃষিজীবি জনগোষ্ঠীগুলি অহি, ক্ষত্রগণ, ব্রীচিবান বা ব্রীহিবান, ক্রিবি (কুড়মি?) এবং বৈদিক যুগেরও পূর্বে সিন্ধু সভ্যতা বা মেলুহা দেশে 'মেলুহ', খারি বা খেরোয়াড়, হড়, হো, হারি বা হাড়ি নামেও পরিচিত ছিল। অনেকে বলে থাকেন কুড়মি জাতি একটি প্রাচীন জাতি বলে দাবী করলেও বেদ, পুরাণ আদি কোন প্রাচীন গ্রন্থে কুড়মি জাতির কোন উল্লেখ ও ইতিহাস পাওয়া যায় না। কথাটি সত্য নয়। আসলে কুড়মি বা কুর্মি জাতি বাচক অভিধাটি সমধিক প্রাচীন নয়। সম্ভবত চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের 'কুটুম্বিন' শব্দের পরবর্তীকালেই শব্দটি স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আজকের অহি, আহির বা আভির জনগোষ্ঠী বলতে কেবল যাদব বা গো-পালক গোয়ালারাই ছিল না পশুপালক বা গোপালক ও কৃষিকে কেন্দ্র করে থাকা সমস্ত জনগোষ্ঠীর মানুষদেরই তা বোঝাত। এরা সিন্ধুর যুগে নদীতে বাঁধ দিয়ে, সেচ ভিত্তিক

উন্নত কৃষিকাজ করত তা প্রকারান্তরে ঋক্ বেদেই স্বীকার করা হয়েছে। ঋক্‌বেদে বৃত্র ও অহি সম্বন্ধে বলা হয়েছে ইন্দ্র অতি বৃহৎ এক জলপূর্ণ মেঘের মস্তক বিদীর্ণ করলেন। অহি অর্থাৎ বৃত্রকে বধ করলেন, সপ্ত সিন্ধু বইয়ে দিলেন। (৬৭/১২) ঋগ্বেদ সংহিতা (২ খন্ড)- রমেশ চন্দ্র দত্ত। "ইন্দ্র যিনি অহিকে বিনাশ করে সপ্ত সংখ্যক নদীকে প্রবাহিত করেছিলেন।" বৃত্র অর্থে নদী বাঁধ এবং অহি অর্থে কৃষকদেরই বোঝায়। আজও কুড়মি জাতির মানুষ নিজেদের 'অহি' বা 'অহিরা' বলে সম্বোধন করে থাকে। অহিরা গীত অর্থে কৃষকদের গান, গীতে "অহিরে" বলে সম্বোধন বা আহ্বান এবং গীতের পদে "কতি ধুরে অহিরাকা ঘার" অর্থে কৃষক ও কুড়মি জাতির মানুষদেরই নির্দিষ্ট করেই বোঝানো হয়েছে। বেদে ইন্দ্রের শত্রুদের 'খত্রগণ" ও বলা হয়েছে। 'খত্র' শব্দের অর্থ কি 'ক্ষেত' অর্থাৎ খত্রগণ অর্থে ক্ষেত্রাধিপতি অর্থাৎ কুড়মিদের বোঝানো হয়েছে? অনুরূপ চন্দ্রভাগা ও সিন্ধু নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ক্রিবি জাতির বসতির পরিচয় পাওয়া যায়। 'ক্রিবি' কি কুড়মি শব্দেরই সংস্কৃত রুপ? ব্রীচিবান বা ব্রীহিবান শব্দটিও ধান চাষী অর্থাৎ কুড়মি জাতিকেই ইঙ্গিত করে। যথা ব্রীচি বা ব্রীহি শব্দের অর্থ ধান। অনেক পন্ডিতজনেই বেদে ধানের উল্লেখ নাই বলে দাবী করে থাকেন। সে কথা মোটেই ঠিক নয়। ব্রীচিবান শব্দটি ব্রীহিবানেরই বিকৃত রুপ। 'হ' বর্ণ 'চ' বর্ণে রুপান্তর হয়েচে মাত্র। 'ব্রীহি' শব্দের অর্থ যে ধান, কুড়মালি ভাষার, 'বেরহন' শব্দ, জাউআ গীতে 'বিরিন ফুল' শব্দের ব্যবহার ধানকেই বোঝায়। তাই ব্রীহিবান বা ধান বান অর্থে ধান চাষী কুড়মি জাতিকেই ইঙ্গিত করে। আবার সিন্ধু সভ্যতার যুগে মেলুহা দেশের নাগরিক হিসেবে এদের পরিচয় ছিল 'মেলুহা'। বিখ্যাত ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞানী D.D. Kossambi বলেছেন-"The Indus region seems tohave been called Meluha by the Mesopotamians."। উপরোক্ত মেলুক্ক বা মালঙ্কা, মালঙ্কা, মালঞ্চ, মালঙ্ক শব্দগুলি কুড়মালি জাউআ করম, অহিরা, বিহাগীতে বারবার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই দেশের নানা ঘটনা ও স্মৃতিই গীতগুলির প্রসঙ্গ। সেই দেশের কৃষিকাজ, নানা দৈব দুর্ঘটনা, জীবনযাত্রা, এবং আশ্চর্য ইতিহাস গীতগুলি আজও বহন করে চলেছে। অনুরুপ একটি গীতে রয়েছে সেই আশ্চর্য স্মৃতি—

<u>জাউআ গীত</u>

খিল না খেতে দেউরা বকলি না চরে
সেহ দেখি দেউরা চলল পারাএ।
তঁহি যে যাবে দেউরা মালঞ্চ দেশে
হামরিকে সে ত সঁগে লেলে যাবে।

মালঞ্চা দেশে ভউজি বহুত শিশির
ভিজি জাইত ভউজি শাড়ি সনদেশ।
ভিজে দিহিঁ ভিজে দিহিঁ শাড়ি সনদেশ
ঘারে আহি সে ত চকতল শাড়ি।
কিআ খাউঅবে ভউজি কিআ পিঁধবে
কিআ দেখি সে ত দিল বাঁধবে।
ভাত খাউঅব দেউরা লুগুআ পিঁধব
তকে দেখি সে ত দিল বাঁধব।

অর্থাৎ, খিল ক্ষেতে বক চরতে দেখে দেবর দেশ ছেড়ে মালঞ্চ বা মেলুহ দেশে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তা দেখে বউদি দেওরকে অনুনয় বিনয় করে বলছে সে যেন তাকে সঙ্গে নেই। দেওর মালঞ্চ বা মেলুহা দেশের বিবরণ দিয়ে বলছে, সে দেশ খুবই সেঁত সেঁতে এবং জলের আধিক্য তাই সেখানে তার সুন্দর শাড়ি ভিজে নষ্ট হয়ে যাবে। উত্তরে নাছোড় বউদি বলছে, তার অনেক ভাল ভাল শাড়ি রয়েছে তাই একটি নষ্ট হলেও কিছু যায় আসে না। দেওর তখন বউদিকে সতর্ক করে বলেছে সেখানে সে কি খাবে? কাকে দেখেই বা মনকে স্থির করে দিন কাটবে? বউদি উত্তরে বলেছে, সেখানে সে ভাত খাবে, লুগা বা কাপড় পরবে এবং দেওরকে দেখেই সে মনকে শান্ত করে দিন কাটাবে।

বাঁদনা গীতেও রয়েছে মালঞ্চ বা মেলুহ দেশের বিবরণ, অহি জাতির উল্লেখ এবং সে দেশের জীবনযাত্রা ও কৃষির কথা। যেমন-

<u>বাঁদনা গীত</u>

অহিরে- গেইআ বরদাঞ ভালা জুগতি করল রে বাবু হো
চালে জাউবউ মালঞ্চ দেশ
মালঞ্চা দেশে যাইএ ফুলা ফরা খাউঅব
অহ দেশেঁ হেবই পতিপাল।

অর্থাৎ, হে অহি জাতির মানুষ, গাই ও বলদ একবার যুক্তি করে সিদ্ধান্ত করল যে তারা মালঞ্চ দেশে চলে যাবে। কারণ সেই দেশে পর্যাপ্ত ফুল, ফল, লতা, পাতা, ঘাস তাই সেই দেশেই তারা যাবে এবং প্রতিপালিত হবে।

পন্ডিতগণ স্বীকার করেন সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চলে একটি অন্যতম জনপ্রিয় দানা শস্য ছিল মারুয়া, মাড়ুয়া বা রাগি। একটি অসাধারণ বাঁদনা গীতে এই মাড়ুয়া শস্যের বিশেষ উল্লেখ এবং এই মালঞ্চা বা মেলুহ দেশ যে কুড়মিরাই প্রতিষ্ঠা বা স্থাপন করেছিল তার পরিস্কার উল্লেখ ও বিবরণ রয়েছে।

বাঁদনা গীত

অহিরে- বারে জে বারে বাগাল বারুণ করইঁ রে বাবু হো
এহে ছেউরে না চালাইহা গাই
ধান খাউআউবে বাগাল মড়ুআ টুঁগাউবে রে
বহুত করবে অরান।
অহিরে- বারে জে বারে মালিন বারুন করইঁ রে বাবু হো
এহে ছেউরেঁ লেগবঁ গাই
ধান খাউআবঁ মালিন মড়ুআ টুঁগাউবঁ গে
জতেক লাগতি কেলেস।
অহিরে- বারে জে বারে বাগাল লাইগ না বাঢ়াইহা রে বাবু হো
মর হাঁথে গজড়া পিতর
ঝুঁটিহিঁ ধরবঁ মুঠিহিঁ মারবঁ
মারবঁ গজড়া পিতর।
অহিরে- বারে জে বারে মালিন লাইগ ত বাঢ়াউঅবঁ রে বাবু হো
মর গঠে আহে লিল সাঁড়
টেঁগেহি টারতউ সিঁঘেহিঁ মারতউ
লেইএ জাতউ তিরহুটু দেশ।
অহিরে- তিরুহুটু তিরিহুটু ঘঁখলে বাগাইলা রে বাবু হো
তিরুহুটু কেইসন দেশ?
কনে জে আহউ বাগাল সেহ না দেশে হো
কনে উহাঁ বাঁধলঅ দেশ?
অহিরে- তিরিহুটু তিরিহুটু ঘঁখলে মালিনিআরে বাবু হো
তিরিহুটু মালনচ দেশ
মাটিকর ঘরনা ঝাঁটিকর ঘড়না
বুঢ়াবাপে বাঁধলঅ দেশ
তহেঁ মহেঁ বাঁধলঅ দেশ।।

গীতটিকে বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায়- মেলুহা দেশের রমণী মালিন বা মালিনী এবং এক গরু বাগাল বা রাখালের বিবাদ ও বাদানুবাদ। রাখাল গ্রামের মূল রাস্তা বা ডহর ধরে তার গরুর পাল নিয়ে মাঠে চলেছে। মেলুহা রমনী বা কৃষকদের স্ত্রী তাকে সাবধান করে বলছে-তুমি এই পথে তোমার গরুর পাল নিয়ে যেও না। কারণ এই পথে গরু গেলে পথের ধারের ধান ও মাড়ুয়া শস্য তারা নষ্ট করবে এবং খেয়ে

ফেলবে। এর উত্তরে বাগাল বলে, তোমার কথা আমি শুনব না। এই পথেই আমার গরু ও গাভীর পাল যাবে। তারা ধান, মাড়ুয়া খেলে বা নষ্ট করলে তার কিছু যায় আসে না। মেলুহা রমণী এই কথার প্রতি উত্তরে বলে, "তুমি যদি না শুন তাহলে এই দেখ আমার হাতে রয়েছে খুবই শক্ত গজড়া পিতর অলঙ্কার। তোমার মাথার চুলের ঝুঁটি ধরে গজড়া পিতলের মুঠি মারব। তখন তার উত্তরে বাগাল বলে, "তাহলে তুমিও শুনে রেখো আমার এই গরুর পালে রয়েছে বলিষ্ঠ নীল ষাঁড় যে তার পা দিয়ে তোমাকে টেনে নিয়ে এসে সিং দিয়ে তোমাকে মেরে ফেলবে। এরপর মালিনী বাগালকে বলে তুমি যে এত তিরিহুটু দেশের গর্ব, গুনগান ও বড়াই করছো তোমার সে দেশ কেমন? সে দেশে তোমার কে আছে? এবং কারাই বা সে দেশ স্থাপন করেছে? উত্তরে বাগাল সগর্বে বলেছে- তিরিহুটু নামে যে দেশের কথা আমি বলছি সে দেশেই হলো মালঞ্চ বা মেলুহা দেশ। বুঢ়া বাপ শিব মহাদেব এবং তুমি আমিই তো সে দেশ স্থাপন করেছি।

গীতটিতে একটি বাস্তব ঘটনার বিবরণ থেকে সিন্ধু বা মেলুহা দেশের বহু বিবরণ ও ইতিহাস উঠে এসেছে। গীতটি যে মেলুহা দেশেরই কথা বলা হয়েছে তা 'মালঞ্চ' শব্দটি প্রমান করে। ঐ দেশের রমণী বা মালিনী, মাড়ুয়া বা রাগি চাষের উল্লেখ সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলিকেই বিবৃত করে। সিন্ধুর সীলমোহরে যে জেবুজাতীয় ষাঁড়ের ছবি পাওয়া যায় তা বাগালের নীল ষাঁড়ের সঙ্গেই মিলে যায়। এছাড়াও গীতটি যে সিন্ধুর তাম্র সভ্যতারই বিবরণ তা প্রমান করে মালিনীর গজড়া পিতর অলঙ্কার। তামা ও পিতলেই সে যুগের অন্যতম প্রধান ধাতু ছিল। গীতটির শেষ অংশ আমাদের এক জ্বলন্ত প্রশ্নেরও সমাধান এনে দেয়। এই তিরিহুটু বা নদীর তীরবর্তী উঁচু মালঞ্চ দেশের প্রতিষ্ঠাতা স্থাপক স্বয়ং মহাদেব শিব এবং তার সন্তান সন্ততি হিসেবে তুমি আমি। কুড়মি জাতিই তো শিবকে বুঢ়াবাপ বলে মনে করে। তাই কুড়মির এক অসাধারণ ইতিহাসও হলো এই প্রাচীন বাঁদনা গীতটি। গীতটি নিশ্চিতভাবেই আরও প্রমান করে কুড়মিদের বাঁদনা পরবও তার প্রাচীনত্ব। কুড়মি জাতির লোক পুরাণ কথা অনুসারে মহাদেও শিব গরু ও কাড়াকে অরণ্য ও পর্বত থেকে এনে পোষ মানিয়ে, জোয়াল, হার বা লাঙ্গল তৈরী করে মানুষকে চাষবাস শিখিয়েছিলেন। তাই তিনিই বুঢ়াবাপ এবং এই কৃষি সভ্যতার স্থাপক।

ঐতিহাসিক ও প্রত্ন বিজ্ঞানীগণ সিন্ধুর চেয়েও বেলুচিস্তানের মেহরগড়ের কৃষি নিদর্শনকেই প্রাচীনতম বলে স্বীকার করেছেন। ডঃ অতুল সুর বলেছেন, "ভূমি কর্ষণ যখন শুরু হয় তখন শিবের আবির্ভাব। অমিশ ত্রিপাঠী তাঁর বিখ্যাত "The Immortal of Meluha" গ্রন্থে ও সুনির্দিষ্ট করে সে কথায় বলেছেন, "He (Siva)

established his first camp at a place call Mehragarh deep in the western mountains of Present day Meluha."। কয়েকটি শব্দ আজও বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে। যেমন- বেলুচিস্তান স্থান নামটি। মূল বেলুচ ও স্তান বা স্থান দুটি শব্দ দিয়ে গঠিত। "বেলুচ" শব্দটি কি "মেলুহ" শব্দের বিকৃত রূপ? 'ব' বর্ণের স্থানে 'ম' এবং 'চ' বর্ণের স্থানে 'হ' বর্ণের রূপান্তর হওয়া ভাষাতত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়ম। তাই বেলুচিস্তান শব্দটি যদি অতীতে মেলুহিস্তান ছিল তাতে প্রশ্নের কিছু থাকতে পারে না। মেহরগড় শব্দটিও মেলুহগড় শব্দেরই বিকৃত রুপ হতে পারে। 'হ' ও 'ল' এর স্থান পরিবর্তন ও ভাষার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। এই সকল যুক্তিকেই সমর্থন ও পুষ্টি করে একটি জাউআ গিতে কুরুম নদীর উপকুলে কৃষির উল্লেখ ও বিবরণ রয়েছে। যেমন-

<u>জাউআ গীত</u>

কনেরে করম গুঁসাঞ আনল নেউতি
কুরুম নেদিক ধারিঞ করলে খেতি।
তহরি বেনাউঅল খেতে কুরুমেক পানি
ছউআ পুতা লেহি গুঁসাঞ করলে খেতি।

গীতটিতে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে কুরুম নদীর তীরেই করম গুঁসাঞ বা বুঢ়াবাপ শিব প্রথম খেতি তৈরী করেন এবং কৃষি করেন। কুরুম নদীর জলে কৃষিতে সেচের কথাও গীতটিতে উল্লিখিত হয়েছে। এই ক্রুমু বা কুরুম নদী বেলুচিস্তান মেহরগড় অঞ্চলেই অবস্থিত। গীতগুলিতে কুড়মির কৃষির ইতিহাস আজও ব্যক্ত ও অব্যক্ত রুপে বিরাজমান। শিবের বাহন ষাঁড় এ যেন প্রতীকি রুপ অর্থাৎ শিব যেন কৃষিরই প্রতীক পুরুষ। ষাঁড় শিবের বাহন তাই কৃষিরও বাহন। তাই সিন্ধুবাসীর মূল শক্তি ছিল বলিবর্দ আর্যদের ছিল ঘোড়া।

আসলে সিন্ধুলিপি আজও পঠিত না হওয়ায় এই সভ্যতার বিষয়ে সঠিক তথ্য ও ইতিহাস আজও আমাদের কাছে অজ্ঞাত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। পুরাতাত্ত্বিক বিভিন্ন নিদর্শন থেকে সে যুগের কৃষি, কৃষি সভ্যতা, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটটির বিষয়ে কিছু সহজ ধারণা করা যায় মাত্র। বিশেষ করে কৃষিভিত্তিক এই সভ্যতার কৃষিজ উপকরণ, ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি,. তথা সাংসারিক কৃষি সংশ্লিষ্ট উপকরণ প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির পরম্পরা এবং কুড়মি জাতির কৃষি আচার, অনুষ্ঠান, উৎসব প্রক্রিয়ার সম্মন্ধ ও এই বস্তুগুলির উপস্থিতি দুটি সভ্যতার গভীর সম্পর্কের দিকটিই আমাদের কাছে উন্মোচিত করে।

অমরেন্দ্র ভট্টাচার্য তার "সিন্ধুলিপির সন্ধানে" গ্রন্ধে বলছেন- "যে কোন

ভাষার চেয়ে বাংলা ভাষাতে সংস্কৃত শব্দ বেশী রয়েছে যা প্রায় ৬০ শতাংশ। কিন্তু বাংলা ভাষাতে এমন কিছু শব্দ রয়েছে যাদের উৎস স্থল অজ্ঞাত-এই শব্দাবলীর কয়েকটি হলো ঢেঁকি, ঢেউ, গাড়ি প্রভৃতি। ঢেঁকি, গাড়ি ও কমন্ডলু চিত্রের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হরপ্পীয় সংস্কৃতিতে পাওয়া যায়।" (পৃষ্ঠা-২৭)

বক্তব্যটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। উপরোক্ত বস্তু ও যন্ত্রগুলি বিশেষ করে ঢেঁকি ও গাড়ি কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতির অভিন্ন উপকরণ। দুটিই অত্যন্ত প্রাচীন কৃষি যন্ত্র। দুটি যন্ত্রই এদের নিজস্ব আবিষ্কার এই কথা বলাই যায়। কারণ দুটি শব্দই কুড়মালি ভাষার নিজস্ব শব্দ ভান্ডারের। শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করলেই তা পরিস্কার হয়ে যায়। দুটি যন্ত্রই সিন্ধুর যুগে উপস্থিতির প্রমান পাওয়া যায়। ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে শস্য ভানার প্রথাটিও সে যুগেরই। এটি একটি অসাধারণ কপিকল যা অভিকর্ষজ বলকে কাজে লাগিয়ে তৈরী করা হয়েছে। এর থেকে এও অনুমান করা যায় যে তারা পৃথিবীর অভিকর্ষজ বল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল। শব্দটির ধাতুরুপ বা ব্যুৎপত্তিতে রয়েছে "ঢেঁক" শব্দ যার অর্থ বাঁক বা বাঁকা। তাই ঢেঁকির প্রতিশব্দ বাংলা শব্দ হলো কপিকল। ভাষা বিজ্ঞানীদের মতানুসারেই আদিম ভাষার একটি মূল লক্ষন হলো শব্দানুকৃতি ও দৃশ্যানুকৃতি। ঢেঁকি শব্দটি তাই দৃশ্যানুকৃতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। অনুরুপ গাড়ী শব্দটিরও সৃষ্টি কুড়মালি 'গড়' শব্দ থেকে। যার অর্থ পা। একি 'গড়' ধাতু থেকে সৃষ্ট অনুরুপ সমার্থ ও ভাব বাচিক শব্দ হলো-গড়কা, গইড়ান, সগড়, গড়গইড়া, গড়কন, সগড়াট, গাড়ি ইত্যাদি। গড় বা পা হলো চলন বা গতির ক্রিয়া ও প্রতীক। বর্তমানের যে রুপটিকে গাড়ী বলা হয় তার প্রাচীন রুপটিই হল সগড়। সিন্ধুর সীলমোহরে তার প্রতিচ্ছবি পাওয়া গেছে। এই কিছুদিন পূর্বেও বৃহত্তর ঝাড়খন্ড অঞ্চলের কুড়মি কৃষকের পরিবহনের প্রধান উপকরণই ছিল এই সগড় গাড়ি।

বিমলেন্দু চক্রবর্তী বলেছেন, "এই কাঠের নিরেট চাকা বা সগড় মহেঞ্জদড়ো আর ঝাড়খন্ডেই দেখা যায়। অন্য কোথাও এর ব্যবহার নেই বললেই চলে। এটা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর চাষীর একটা প্রমান।" জাওয়া গীতে বলা হয়েছে—

<u>গীত</u>

চাল ভরতি ফরই লউআ ডিঁগলা গউ
ভইআ মর লেগত সগড় মানে।

সগড় শব্দটি গড় শব্দের সঙ্গে 'স' উপসর্গ যোগে সৃষ্টি। গাড়ি বা সগড়ের সম্পূর্ণ যন্ত্রাংশগুলির প্রতিটির নাম কুড়মালি ভাষার নিজস্ব শব্দ। বেদে রথচক্রের যে 'অর' শব্দটির প্রয়োগ পাওয়া যায় কুড়মালি ভাষাতে তাই "আরা"। তাই আর্যরা এর নাম ও প্রযুক্তি সিন্ধুর মূলবাসীদের কাছ থেকে পেয়েছিল বলেই অনুমান করা যায়।

অনুরুপ কৃষিকাজে ব্যবহৃত আদি ও মূল যন্ত্রগুলি হলো যথাক্রমে- হর, হার বা লাঙ্গল, ঈশ, জোয়াল, ফাল বা ফার। কৃষিতে যন্ত্র বা প্রযুক্তির ব্যবহার এবং এই সকল যন্ত্রপাতি সৃষ্টির চমকপ্রদ কাহিনী কুড়মালি লোক পুরাণ কথাতে পাওয়া যায়। লোকপুরাণ কথা থেকেই জানা যায় স্বয়ং মহাদেব শিব কৃষির জন্য গরু, গাভী, কাড়া, মহিষ, মানুষের সমাজে বিতরণ করেন। তৈরী করেন সমস্ত কৃষিজ উপকরণ। এই জন্যই তাঁর নাম থেকেই লাঙ্গলের প্রকৃত নাম হলো হর বা হার। ঈশ হলো হালের মূল দন্ড। যার থেকে ঈশ্বর শব্দটির সৃষ্টি। জোয়ালের মধ্যভাগকেও বলা হয় মহাদেব। সম্ভবত "লিঙ্গ" শব্দ থেকেই লাঙ্গল শব্দটিরও উৎপত্তি। লিঙ্গ ও শিবেরই প্রতীক রুপ। "বাঙালীর ইতিহাস" গ্রন্থে ডঃ নীহার রঞ্জন রায় তাই বলেছেন, "খুব প্রাচীনকালেই "লাঙ্গল" শব্দটি আর্য ভাষায় গৃহীত হয়েছিল। ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে আর্য চাষীরা চাষকার্য জানিতেন না। সেই হেতু যে যন্ত্র দ্বারা চাষ করা হয় সে যন্ত্রের সঙ্গেও তাঁহাদের পরিচয় ছিল না।" (পৃষ্ঠা-৪৮)

যে গরু দিয়ে লাঙ্গল চালানো হয় কুড়মিরা তাকে বলে বলদ। লক্ষ্যণীয় শিবেরও এক নাম "বরদ"। হর বা হার শব্দটির একটি বিশ্বজনীন রুপ লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এই শব্দের বহু বিচিত্র ও বিকৃত রুপ সেই যুক্তিকে প্রমান করে। এবং এর থেকে A.L.Basham এর সেই অভ্রান্ত উক্তিটিও নির্দ্বিধায় প্রমানিত হয় যে "প্রাক আর্য যুগে এদেশে কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল এবং এরজন্য সারা বিশ্ব ভারতের কাছে ঋণী।" কৃষি বিদ্যা ও কৃষি প্রযুক্তির সঙ্গে সারা বিশ্ব এই শব্দটিও ধার নিতে ও গ্রহন করতে বাধ্য হয়েছে। এই দাবির পিছনে Zenoide Regozine- এর বিখ্যাত উক্তিটি এখানে বিশেষভাবেই প্রণিধান যোগ্য। Vedic India গ্রন্থে তিনি বলেছেন, "Letus now take the Sanskrit root AR of which the general and original meaning is plough. We find it intact in Latin and Italian Arere, In Slavic arati-to "plough' in Greek atotran, Latin arctrm, Tehekh (so called) Bohemian a Slavic language Oradlo- a plough, in Greek aroura, Latin arvum- a ploughed field."

তবে "AR" হলো সংস্কৃত ধাতুরুপ এই কথার কোন যুক্তি নেই। কারণ সংস্কৃত ভাষার জন্মের বহু পূর্বেই হার বা লাঙ্গলের জন্ম। তাই নিঃসন্দেহেই বলা যায় এই যন্ত্র ও শব্দটি প্রাগার্য ভাষারই নিজস্ব শব্দ। অনুরুপ 'ফার' বা ফাল শব্দটির ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। কৃষিতে লোহার ফালের ব্যবহার খ্রীষ্টপূর্ব ৬-৫ শতকে শুরু হয়েছে বলে পন্ডিতগণ মনে করেন। তার পূর্বে লাঙ্গলে কাঠের ফাল ব্যবহার করা হতো।

"ভারত ইতিহাসের সন্ধানে" গ্রন্থে দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, "কালিবোঙায় হরপ্পা যুগের কৃষিক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। চাষের দাগগুলি আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি সমকোণে ছেদ করেছে। চাষের কাজে লাঙ্গল ব্যবহার হতো। কাঠের ফাল ব্যবহার হতো।" লোহার ফাল আবিষ্কারের পূর্বে কুড়মি কৃষক যে কাঠের ফাল ব্যবহার করতো তার কথা ও স্মৃতি রয়েছে কুড়মালি প্রবাদে। যেমন- "বেট হারকে কাঠেক ফার।" বেট চাষ প্রথা এখনও কুড়মি সমাজের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে দেখা যায়। এই কৃষি ব্যবস্থা ও পদ্ধতির মধ্যে সমবায়িক ব্যবস্থার ছায়া লক্ষ্য করা যায়। এবং এই চাষের সময় যে কাঠের ফাল ব্যবহার করা হতো সেই কথায় প্রবাদে পরিস্কারভাবে উল্লিখিত হয়েছে। কুড়মি কৃষকদের কাছে কাঠের ফালের স্মৃতি এইভাবেই আজও অম্লান।

এছাড়াও ঋগ্বেদে "দাত্র" ধারণের কথা অথবা যবের "কুশল" হতে যব বার করার কথা রমেশ চন্দ্র দত্ত তার ঋগ্বেদ সংহিতা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। দুটি শব্দই কৃষি উপকরণ ও যন্ত্র তাই শব্দ দুটি ঋগ্বেদ পূর্ববর্তী বলেই ধরে নেওয়া যায়। অন্যান্য কৃষি উপকরণের মতই এই শব্দ দুটিও কুড়মালি ভাষার নিজস্ব শব্দ যার উপস্থিতি ও ব্যবহার আজও কুড়মি সমাজে ও কুড়মালি ভাষার মধ্যে রয়েছে। 'দাত্র' শব্দটি কুড়মালি দা শব্দের সংস্কৃত রুপ। এটি হলো ফসল কাটার দাঁত যন্ত্র। এর অপর নাম হলো হঁসুয়া। "কুশল" হলো ধান সংরক্ষণের অভিনব প্রকৌশল যাকে কুড়মালি ভাষায় বলা হয় কুঁচড়ি বা পুড়া। প্রাচীনকালেই কুড়মি কৃষক শস্য সংরক্ষণের বিজ্ঞানসম্মত উপায় ও ব্যবস্থা আবিষ্কার করতে পেরেছিল তার বহু প্রমান রয়েছে। সিন্ধুর যুগের শস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রশংসা করে সাধন কমল চৌধুরী তার "প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ও গৌতম বুদ্ধ" গ্রন্থে বলেছেন, "শস্যের গোলা তৈরী করা হয়েছে। এই রকম শস্য মজুত রাখার ব্যবস্থা বৌদ্ধ যুগে এমন কি মৌর্য যুগেও ছিল না।" কৃষিতে ব্যবহৃত এই সকল নানা ব্যবস্থা, উপকরণ ও পদ্ধতিগুলি আজও কুড়মি কৃষকদের মধ্যেই পারম্পরিকভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। মাটি ও বাঁশের তৈরী কুম, হাঁড়া, ঝাঁপি, ডেলি, কুঠি, করই, মরই বা মরাই এর মতপাত্রগুলি সিন্ধুর সময়কাল থেকেই চলে আসছে এর প্রমান পাওয়া গেছে সিন্ধুর বহু প্রত্নস্থলে।

শস্য সংরক্ষণ ছাড়াও শস্য ঝাড়াই, আদানপ্রদান ও বহনের ব্যবহার্য জিনিস বা পাত্রগুলির উল্লেখ ও ব্যবহারের কথা রয়েছে প্রাচীন বাঁদনা ও করম গীতে। তাই এই পাত্র বা বাড়ীতে ব্যবহার্য গৃহ সামগ্রীগুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। এইগুলির আবিষ্কার ও ব্যবহার কৃষি সভ্যতার মানুষদেরই অবদান। জিনিসগুলির মধ্যে বাঁশের তৈরী সুপ বা কুলো, ডালি, টঁকি বা টুঁকি, টুপা, পাছা বা ঝুড়ি, চাঁগরি, পেড়া, ঝাঁপি অন্যতম। মাটির জিনিসের মধ্যে কুপ, চুকা, চুকরি, ঠিলিয়া, হাঁড়ি, হাঁড়া,

সরা,সানখি, কাঁড়ি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাঁদনা গীত

অহিরে- কনঅ পাহাড়েকেরি কঁচি কঁচি বাঁশ রে বাবু হো
কনঅ নগরেকর ডমিন
সরু সরু বেতিআঞ সুপ বুনতউ হো
সেহ সুপে গেইআনি চুমাই?
অহিরে- কুড়ুম পাহাড়েকেরি কঁচি কঁচি বাঁশ রে বাবু হো
হড়দিপি নগরেকর ডমিন
সরু সরু বেতিআঞ সুপ বুনতউ হো
সেহ সুপে গেইআনি চুমাই।।

অনুবাদ করলে অর্থ হয়- হে অহি! কোন পাহাড়ের কঁচি কঁচি বাঁশ এবং কোন নগরের ডোমিনী যে সরু সরু বাঁশের পাতি দিয়ে সুপ বা কুলো তৈরী করে? সেই সুপ দিয়ে বাঁদনা বা গো বন্দনা উৎসবে সিরমনি গাইকে চুমান করা হয়? উত্তরে বলা হয়েছে কুড়ুম পাহাড়ের কচি কচি বাঁশ সেই বাঁশ দিয়ে হড়দিপি নগরীর ডোমিনী সুপ বা কুলো তৈরী করে এবং সেই সুপ দিয়েই সিরমনি গাইকে চুমান করা হয়।

গীতটিতে এমন কয়েকটি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে যাতে করে বোঝা যায় কুড়মি জাতির মানুষ কুড়ুম পাহাড় (কারাকোরাম?) ও হড়দিপি (হরপ্পা) নগরে বসবাস করত। বাঁদনা উৎসবে গাভী গরুর পূজা আরাধনা করত যা আজও তারা করে চলেছে। সিন্ধু সভ্যতায় ষাঁড় বা গরুকে পূজা আরাধনা করা হতো তার প্রমান পাওয়া যায়। এই পশুকে পূজা আরাধনার রীতি ও ঐতিহ্যটি প্রাচীন কৃষি সভ্যতারই অবদান- যার মূল ধারক বাহক হলো এই কুড়মি জাতি।

সিন্ধু সভ্যতায় কৃষিজ ফসল ও অধিবাসীদের খাদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে জানা যায় যে এই সভ্যতার মানুষজন যব, গম, বার্লি, রাগি (মাড়ুয়া), জোয়ার, বাজরা আদি শস্যই ছিল প্রধান এবং তাদের খাদ্যাভ্যাসও ছিল অনুরুপ। ভারতীয় কৃষিতে ধান বা চালের আগমন তারও কিছু পরে বলেই অনুমান করা হয়। জাউআ উৎসবে জাউআ ডালিতে যে সকল দানাশস্য বীজ ফেলা হয় তাতেও এইগুলিরই প্রাধান্য এবং ধান অনুপস্থিত। রীতিটি এই ধারণা বা যুক্তিকেই সমর্থন করে। কুড়মালি প্রাচীন অহিরা গীতেও এর সমর্থন রয়েছে। সিন্ধুবাসীর খাদ্যাভাসে চাল বা চরুর চাইতে যব, গমের প্রাধান্য এবং তার থেকে তৈরী ছাতু জাতীয় খাদ্যেরই যে খাদ্য তালিকায় প্রাধান্য ছিল গীতে তারও প্রমান রয়েছে। যেমন-

অহিরা গীত

অহিরে- পুরুবা পছিমা সইঞে নাভল কুটুমা রে বাবু হো
বইসা কুটুম গড় অরমাই
ক্ষেতে যে আহি মর যউ, গহম হো
গেইআ ধনি আহি ত গাভিন।
অহিরে- কবেহিঁ রে অহিরা, পাকতউ যউ, গহম রে বাবু হো
কবে ত গেইআ ধেনুআই
কবেহিঁ রে অহিরা সতুআ কুটাউঅবে
কবে ত করবে বিদাই?
অহিরে- মধু মাসে রে অহিরা, পাকে যউ ডেম রে বাবু হো
আসাড় মাসে অহিরা   সতুআ কুটাউঅবঁ
বাঁদনাই ত করবঁ বিদাই।।

গীতটিতে বলা হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিমের পথে আত্মীয় কুটুম্বরা এসেছে বাড়ীতে। বাড়ীর মালিক তাদের পা মেলে স্থির হয়ে থাকার জন্য আবেদন করেছে। তাদের আরও জানিয়েছে যে, কুটুম্বের সেবা শুশ্রুষা সে এখন করতে পারছে না কারণ যব ও গম এখনও পাকেনি, তা এখনও ক্ষেতেই রয়েছে। এছাড়া গাভীও এখন গর্ভবতী, তাই দুধ বাড়ীতে নেই। আগত আত্মীয়গণ জানতে চেয়েছে কখন তার যব এবং গম পাকবে, কখনই বা গাভী দুধ দিবে? উত্তরে চাষী বলেছে মধুমাস বা বসন্তে তার যব পুষ্ট হবে, পাকবে এবং গাভী প্রসব করবে আষাঢ় মাসে। তাই সে কার্ত্তিক মাসে যবের ছাতু কুটে, গাভীর দুধ দিয়ে তাদের খাবার ও সেবা যত্ন করবে এবং বাঁদনায় তাদের বিদায় করবে।

গীতটিতে একটি ঘটনার বিবরণী থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া যায়। যথা- যব ও গমেই যে তাদের প্রধান কৃষিজ ফসল ছিল তার সুস্পষ্ট উল্লেখ এবং তাদের খাদ্য তালিকায় ছাতু ও দুগ্ধের যে স্থান ছিল সবার উপরে ও মহার্ঘ্য ছিল তা আত্মীয়দের পরিবেশন ও সেবায় প্রদান থেকেই বোঝা যায়। তাদের প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকাতেও যব ও গমের লাপসি, রটি বা রুটি বা পুরোডাস এবং ছাতুই যে ছিল প্রধান-কুড়মিদের আজকের খাদ্যাভাস থেকে তা অনুমান করা যায়। সেকালে রাগি বা মাড়ুআ চাষের গুরুত্বের ধারাটি কুড়মিদের মধ্যে আজও সমান বর্তমান এবং কুড়মিদের আজকের মাড়ুয়া লাপসি ও মাড়ুয়া ছিলকার খাদ্য তালিকাটিও যে সে যুগের তা ভাবা যেতেই পারে।

এছাড়াও কুড়মিদের খাদ্য তালিকায় বিভিন্ন ঘাস জাতীয় দানা শস্য

যথা-গুঁদলি, কদঅ, সাঁউআ, ছেড়ি-র মত সুনতুপুকু জাতীয় ঘাস বীজ যে তারা সিদ্ধ করে খেত তারও পরোক্ষ প্রমান পাওয়া যায়।

P.O. Bodding তাঁর "Traditions and Institutions of the Santhals" গ্রন্থে বলেছেন, "There in Hihiri Pipiri they grew up eating the grain of the Sumtubukuc grass and the ears of the Samagrass."। কিন্তু এই কথা কেবল সাঁওতালদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় সাঁওয়া ও সুমতুবুক বা সুনতুপুকু ঘাসের বীজ খাদ্য হিসেবে গ্রহণের রীতিও অভ্যাস এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত কুড়মিদের ছিল। হিহিড়ি-পিপিড়িতে সাঁওতালদের সঙ্গে কুড়মিরাও ছিল এবং তারাও সুমতুবুকুচ ঘাসের বীজ খাদ্য হিসেবে খেত তারও কথা রয়েছে জাউআ গীতে।

<u>গীত</u>

সুনতুপুকু সুনতুপুকু গইআ কানারি
দাদাক বহুঞ ভাত দেই নিহি ভাই ভাতারি।

অর্থাৎ, শুকনো, মৃতপ্রায় কানালি জমিতেও সুনতুপুকু হয়েছে। কিন্তু তার দাদার বউ সে সুনতুপুকুর ভাত তাকে খেতে দেয় না। হাজার হাজার বছর প্রাচীন অতীত জীবনের নানা টুকরো স্মৃতি যে কিভাবে একটি গীতে জাতির ইতিহাসকে বিবৃত করে তা ভাবলেও অবাক হতে হয়।

আজকের দিনে কুড়মি কৃষকের প্রধান ফসল হলো ধান। সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও এই কথা সত্য। ভারতীয় কৃষি ধান চাষের আগমন এই সকল ঘটনার অনেক পরে। যদিও পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে ধানই হয়ে উঠে প্রধান ফসল। সংস্কৃতে ধানকে বলা হয় ব্রীহি। ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত বলেছেন একসময় ভারতবর্ষের নাম ছিল ব্রীহিআ। পূর্বেই বলেছি ব্রীহি শব্দটি সংস্কৃতে গৃহীত হলেও এর আদি ও উৎস হলো কৃষকদের ভাষা আদি প্রাকৃত বা কুড়মালি। অনেক পন্ডিত মনে করেন ব্রীহি শব্দটি আরও পরবর্তীকালের এবং ঋকবেদে ব্রীহি শব্দের উপস্থিতি নাই। কিন্তু এই কথা যুক্তিযুক্ত নয়। ঋগ্বেদের ছয়ের মন্ডলে (৬/২৭/৫) উল্লিখিত হয়েছে, সৃঞ্জয় নামক আর্যগোষ্ঠী ইন্দ্রের সহায়তায় হরিযুপীয়ার (হরপ্পা?) পূর্ব ভাগে অবস্থিত বরশীখ বংশীয় যজ্ঞপাত্র ধ্বংসকারী বৃচিবৎগণকে নিধন করেছিল।" উক্ত ঋকের "বৃচিবৎ" শব্দটি "ব্রীহিবৎ" শব্দেরই সংস্কৃত রুপ বলেই মনে করা যায়। অর্থাৎ ব্রীহি বা ধানের সন্তানদের বোঝান হয়েছে। এরাই "বরশীখ" অর্থাৎ শিবের বংশধর এবং অবশ্যই যজ্ঞ বিরোধী বা ধ্বংসকারী হিসেবে ঋকটিতে কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষজনদেরই বোঝান হয়েছে। উক্ত ব্রীহি শব্দটি একটি দ্রাবিড় শব্দ। কুড়মালি ভাষাতেও শব্দটির নানা রুপে, নানা ভাবে উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অর্থ সংকোচন বা বিস্তারে কুড়মালি ভাষাতে এর

নানা শব্দ রুপগুলি হল- বিহিন (বীজ), বেরহন (ধান দিয়ে কর্মের বেতন), বিরহি (ডাল শস্য বিশেষ) ইত্যাদি। ধান অর্থে ব্রীহি শব্দের ব্যবহার রয়েছে বহু প্রাচীন গীতে। যেমন-

<u>জাউআ গীত</u>

এতিক এতিক জাউআ, কিআ কিআ জাউআ
জাউলম ভাই রে ধান বিরুআ।

অর্থাৎ, এত এত যে জাউআ তাতে কি কি শস্য দানা দেওয়া হয়েছে? উত্তরে বোন ভাইকে বলছে আমি ধান বীজ এতে বপন করেছি। এছাড়াও অন্য একটি গীতে রয়েছে—

<u>গীত</u>

কিআ সুতাঞ গাঁথবঁ অরই লতা, পরই লতা পিঁপড় পাতা না
কিআ সুতাঞ গাঁথবঁ বিরিন ফুলা না।

গীতটিতে বলা হচ্ছে কি সুতো দিয়ে গাঁথব অরইলত, পরইলত বা পিঁপড়পাতা। আবার কি সুতো দিয়ে গাঁথব বিরিন ফুল? এখানে "বিরিন" শব্দটি "ব্রীহি" শব্দেরই প্রাকৃত রুপ। যার অর্থ ধান। বিরিন ফুলের অর্থ ধান ফুল। ব্রীহি শব্দটি ভারতবর্ষের আদিম কৃষক সমাজের দান যা পরবর্তীকালে সংস্কৃতে গৃহীত হয়েছে মাত্র। কেবলমাত্র তাই নয় শব্দটি ব্রিহিআ বা ভারতবর্ষ থেকেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গিয়ে বিশ্বভাষায় স্থান লাভ করে বিশ্বজনীন রুপ লাভ করেছে। পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের প্রায় সবকটি ভাষায় ধান বা চাল অর্থে ব্রীহি শব্দটির নানা বিকৃত ও বিবর্তিত রুপ দেখা যায়। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর সুবিখ্যাত "ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি" গ্রন্থে বিশ্ব ভাষায় শব্দটির নানা রুপের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন-

"পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায়-Birinj, vrize, Brinj (পারসিক) প্রভৃতি রুপ লাভ করে।

গ্রীক- Aruza
ইংরেজী - Rice
ফরাসী - Riz
জার্মানী - Reis

এছাড়া নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মাওরি আদিবাসীরা চালকে বলে "আরি"। আজও কুড়মালি ভাষার চালের এক বিশেষ পর্যায় হলো আরুয়া। জানা যায় এই মাওরি আদিবাসীরা প্রায় ৩০ হাজার বৎসর পুর্বে এই ভারতবর্ষ থেকেই সমুদ্র যাত্রা করেছিল। আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় "মাওরি" শব্দটি মেলুহিবা মেলুহ শব্দেরও

খুব কাছাকাছি। ভাবা যেতেই পারে ভারতীয় কৃষির সঙ্গেই কৃষি সংস্কৃতির এই মৌলিক শব্দগুলি বিশ্বভাষা ও বিশ্ব সংস্কৃতিতে স্থান লাভ করেছে।

অনেকেই আক্ষেপ করে বলেন যে, ভারতের অন্যতম বৃহৎ জনগোষ্ঠী কুড়মি জাতি এবং অন্যান্য আদিম অধিবাসীদের বৈদিক যুগে এদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। কথাটি কিছুটা সত্যি হলেও সর্বৈব সত্য নয়। ঋকবেদে উল্লিখিত বৃত্র, অহি, বঙ্গৃদ, এবং দনু শব্দগুলি সবই ভারতের প্রাচীন কৃষি সভ্যতার মানুষজন বিশেষ করে কুড়মি কৃষক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত ভাবার বলিষ্ঠ যুক্তি রয়েছে। ইন্দ্র তার প্রতিপক্ষ বহু জনগোষ্ঠীর মানুষদের যুদ্ধে পরাস্ত করেন তার বিস্তৃত বিবরণ ঋকবেদে রয়েছে। প্রতিপক্ষ জাতিগুলি যেমন-বৃত্র, অহি, শুষ্ণ, নমুচি, শম্বর, উরণ, কুসব, বর্চী, অর্বুদ, বঙ্গৃদ, প্রভৃতি দনু পুত্রদিগের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ হয়েছিল। বিশেষ ভাবেই লক্ষ্যনীয় বিষয় এই সমস্ত জাতি বা জনগোষ্ঠীর মানুষদের দনুপুত্র বলা হয়েছে। এই অভিধা ও শব্দগুলির অর্থ ও তাৎপর্য বিশেষ ভাবেই আলোচনার দাবী রাখে। দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষায় "দানিউ" শব্দের অর্থ হলো ধান। তবে কি শব্দটি দানিউ → দনিউ → দনউ → দনু রূপ লাভ করেছে। হলে দনুপুত্র অর্থে ধানের সন্তান বা প্রতিপালিত মানুষদের বোঝানো হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় দনুপুত্র এই সকল জনগোষ্ঠীগুলি ছিল কৃষক বা কৃষিজীবি জনগোষ্ঠী। উক্ত জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে শম্বরদের সঙ্গে আমরা বিশেষ পরিচিত কারণ তারা আজও আমাদের প্রতিবেশী। বঙ্গৃদ কি বোঙা শব্দের সংস্কৃত রূপ? হলে আজকের সাঁওতাল, মুন্ডা, হো আদি হড় মানষদের তা ইঙ্গিত করে। বৃত্র ও অহি সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসা। ঋকবেদেই বৃত্র ও অহি সম্বন্ধে বলা হয়েছে- "ইন্দ্র যিনি অহিকে বিনাশ করে সপ্ত সংখ্যক নদীকে প্রবাহিত করেছিলেন। আবার বঙ্গৃদ নামক শত্রুর শত শত নগর ভেদ করেছিলেন। ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য ঋক্‌বেদের ১/১০৩/২ সুক্তের ব্যাখ্যায় বলছেন, "বজ্র দ্বারা বৃত্রকে হত করিয়া বৃষ্টি জল বাহির করিয়াছেন।" পরিস্কার বোঝা যায় বৃত্রাসুর বা বৃত্র অর্থে কোন অসুর নয়, নদী বাঁধগুলিকে বোঝানো হয়েছে। সপ্ত সিন্ধুর নদী বাঁধ বা সেচ বাঁধগুলিকে ইন্দ্র বজ্র দ্বারা ভেঙে দিয়েছিলেন। এই বাঁধগুলির নির্মাতা ছিল ঐ দনুপুত্ররাই বা ধানের চাষী অহি জনগোষ্ঠীর মানুষেরাই। যার অন্যতম ছিল কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষেরাও। ঋক্‌বেদে তাই বৃত্রকে বলা হয়েছে অহিস্ত। অহিগণ এই বৃত্র বা নদীর সেচসেবিত অববাহিকা অঞ্চলে বসবাস করত ও চাষ আবাদ করত। উপরোক্ত "রৌহিনকে বিদারিত করিয়াছেন" অর্থে সবুজায়ন বা কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার অর্থ বোঝায়। কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতির একটি বিশেষ পর্ব ও অনুষ্ঠান হলো "রহিন"। এই দিন থেকেই বীজ বপনের সূচনা করা হয়। তাই রহিন সবুজায়নেরই

পর্ব বা উৎসব। হর বা হারা অর্থেও সবুজ বোঝায়। সম্ভবত হরইন, হিরন এর বিপর্যয়িত রূপেই হলো রহিন। স্পষ্টতঃ বোঝা যায় ইন্দ্র এই বৃত্র বা সেচ বাঁধগুলিকে ধ্বংস করে সিন্ধুর কৃষি, কৃষিব্যবস্থা ও কৃষি অর্থনীতিকেও ধ্বংস করেছিলেন। আধুনিক গবেষণা অনুসারেও বৃত্র কোন অসুর নয় নদী বাঁধ বিশেষ। যেহেতু তা অসুর দের নির্মিত তাই বৃত্র অসুর। কুড়মালি ভাষার দৃষ্টিতেও বৃত্র শব্দটির ব্যুৎপত্তিতে "বিড় + দর" রূপটি পাওয়া যায়, যার অর্থ হয় জলের আশ্রয় বা জলাশয় বিশেষ। আর ইন্দ্র কর্তৃক নিহত অহি কারা তাই বিবেচ্য। অহি শব্দের বিকৃত রূপ আজকের অহির, বা আভির হতে পারে। বৈদিক যুগে গো-পালক ও কৃষক উভয়ই একই অহি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল বা অহি নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে কেবল গো-পালক যাদবেরাই আহির নামে পরিচিত হয় এবং কৃষিজীবি কুড়মিরা বেদ পরবর্তীকালে কুটুম্বিন ও পরে কেবলমাত্র কুড়মি নামে পরিচিত হয়ে উঠে। কিন্তু এককালে যে এরা অহি বা অহির নামে পরিচিত ছিল এমনকি আজও হয়ে থাকে এর প্রমান পাওয়া যায় কুড়মালি লোকগীতে। আবার অহি অর্থে নাগ বোঝালে তা কেবল সরাসরি কুড়মি জাতিকেই নির্দেশ করে। অহি সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য সূত্র যেমন- "According to the British historian Reginold Edward Enthovan Kurumbas are none other than the Ahirs of the South." (NET)

আজও কুড়মি জাতির মানুষ নিজেদের 'অহি' রূপে সম্বোধন করে ও পরিচয় দেয় তার নিদর্শন রয়েছে কুড়মালি গীতে। কুড়মালি কাব্যগীতি "মাহারাই"-এ বলা হয়েছে—

"আড়ে জে দিঘে গউরা সোল স বাজারা হো
তাঁহি রহে সোল স অহিরা।"

অর্থাৎ যে গৌরা বাজার আড়ে এবং দৈর্ঘ্যে ষোল শত ক্রোশ, সেখানেই বসবাস করে ষোলশত অহিরা জাতির মানুষ। অথবা—

<u>অহিরা গীত</u>

অহিরে- খজা খজইতে আউলঁ পঁছা পঁছইতে আউলঁ
কতি ধুরে অহিরাকা ঘার
অহিরাকা ঘারে ভালা তুলসি চঁউরা হো
উপরে ত ঘুরেই হাঁসা রাই।

এখানে অহিরে সম্বোধন অথবা "অহিরাকা ঘার" অর্থে গরুর পালক পোষক যে মানুষজন তাদের বলা হয়েছে। তাই ঋকবেদের অহি জাতির কৃষকদেরও বোঝাত। ভারতের প্রাগার্য কৃষক ও কৃষি সভ্যতার মানুষ কুড়মিরাও অহি এই সম্বন্ধে কোন

সন্দেহ থাকতে পারে না।

কেবলমাত্র বৃত্র এবং অহি নয় সমস্ত প্রতিপক্ষ জাতি গুলিকে ইন্দ্র পরাস্ত করেন ও তাদের নগর সমূহ ধ্বংস করেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত "প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাস" গ্রন্থে বলেছেন, "প্রাচীন পাঞ্জাবের আদিম নিবাসীদের বহিষ্কৃত করিয়াছিল ও তৎসন্নিহিত নদী সমূহের পার্শ্ববর্তী সমস্ত উর্বরভূমি অধিকার করিয়াছিল।"

ঋক্‌বৈদিক কালের এই সকল ঘটনা ও বিপর্যয়ের পরবর্তীকালে এই জাতি আত্মরক্ষার কারণেই ক্রমশঃই দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের দিকে সরে আসতে বাধ্য হয় এবং কৃষির উপযোগী সমতলভূমি ছেড়েও ঝাড়খন্ডের পাহাড় জঙ্গল অধ্যুষিত কঠিন মাটি তথা কৃষির অনুপযোগী ভূ-খন্ডেও বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয়।

আর্যদের আগমনের পূর্বে প্রাগার্য কৃষি সভ্যতা ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছিল তা আজ ঐতিহাসিক সত্য। এবং এই কথাও বলা যায় যে আর্যরা কৃষি জানত না, প্রাগার্য মানুষদের কাছেই তারা কৃষি শিক্ষা লাভ করেছিল। বৈদিক যুগেই এই সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়টি সংগঠিত হয়েছিল বেদে হল কর্ষণের সুন্দর বিবরণ থেকেই তা বোঝা যায়। বেদের বিবরণ থেকে জানা যায়-

"শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাঙ্গলম্।
শুনং বরত্রা বধ্যন্তাং শুন মস্ত্রামুদিঙ্গয়।।...
অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা।
যথা নঃ সুভগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি।।

অর্থাৎ, বাহক বলদগুলি, কর্ষক মানুষটি এবং লাঙ্গল সকল সুখে কর্ষণ কার্য করুক। বন্ধন রজ্জু সুখে বাঁধুক, আর হে পাঁচনি, তুমি সুখে চালাও। ...ওগো সুভগা সীতা, তুমি যেন সৌভাগ্য ও সুফল দায়িনী হয়ে আমাদের পক্ষে অনুকূলা হও। আমরা তোমাকে বন্দনা করি।"

পরবর্তীকালে চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে কুটুম্বি শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। গুপ্তযুগের শাসনে কুটুম্বি অর্থে চাষী গৃহস্থ বলা হয়েছে। মধ্যযুগের গ্রন্থাদিতে কৃষক ও কৃষিজীবি মানুষদের বলা হয়েছে শুদ্র। গুপ্তযুগের বৈগ্রাম ও দামোদর লিপিতে গ্রামের মহত্তর (মাতব্বর) এবং কুটুম্বি (কৃষিজীবি) উল্লেখ রয়েছে। আজকের গ্রামের মোড়ল বা মাতব্বর মাহাত বা মাহত শব্দটির উৎপত্তি উপরের মহত্তর শব্দ থেকে এবং কুড়মি শব্দটির আগম কুটুম্বি থেকে তা অনুমান করা যায়। বিশিষ্ট নৃ-বিজ্ঞানী পশুপতি প্রসাদ মাহাত এর সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি গ্রন্থে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ করেছেন- "খ্রিষ্টীয়

২য় শতকে সাতবাহন বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সিরি সাতকর্ণি গোমতি পুত্র। ইনি ক্ষত্রীয়দের অহংকার নষ্ট করেন দ্বিজ ও কুটুবাদের (কৃষিজীবি) স্বার্থোন্নতি সাধন করেন।" এক্ষেত্রেও কুটুবা কৃষিজীবি অর্থে কুটুম্বি বা কুড়মিদেরই যে বোঝান হয়েছে তা বলাইবাহুল্য। এত প্রসঙ্গের অবতারনা বেদের যুগেও তার পরবর্তীকালেও প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে একটি বিশিষ্ট কৃষিজীবি জনগোষ্ঠী হিসেবে এদের উপস্থিতি ও ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। হাজার হাজার বছর ধরে কৃষি কর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি থেকে এরা কখনই বিচ্যুত হয়নি। বোঝা যায় কৃষি কেবল তাদের কর্মই নয় ধর্ম এবং সংস্কৃতিও। যা কৃষি প্রধান দেশ ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতিরও মূল ভিত্তি।

পরাশরের "কৃষি সংগ্রহ"কে মধ্যযুগের শেষ ভাগের সংকলন বলে গণ্য করা হয়। এই গ্রন্থেও সেকালের কৃষি, কৃষক ও কৃষি সভ্যতা সংস্কৃতির যে বিবরণ পাওয়া যায় তা কুড়মি ও কুড়মালি ভাষাও সংস্কৃতির নির্মোহ ও নিরপেক্ষ বিবরণ বলেই প্রতিভাত হয়। এই গ্রন্থের সহজ অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার তার "সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রসঙ্গ" গ্রন্থে বলেছেন-

লাঙ্গলের বিবরণ—

"ঈশো যুগো হল স্থানুর্নির্যোলস্য পাশিকাঃ।
অড্ড চলশ্চ শৌলশ্চ পচ্চনী চ হলাস্টকম।।"

আটটি অঙ্গ: ঈশ বা ইস, যুগ বা জোয়াল, পাশিকা বা পাশি, শৌল শোল কাঠি এবং পচ্চনী বা পাঁচন। অড্ড চল্ল আড়চাল অর্থাৎ লাঙ্গলে মুড়ার মধ্যে ঈশ দিয়ে এঁটে দেওয়া খিল। হলস্থানু গোঁজ। পরাশর বলেন ঈশ পাঁচ হাত, হলস্থানু আড়াই হাত, নির্যোল দেড় হাত, যুগ বাহনের কর্ণ সমান, পাশিকা বা অড্ডচল্ল দ্বাদশাঙ্গুলি, শৌল মুষ্টি বদ্ধ হাত পরিমান এবং পাঁচনী সাড়ে বার অথবা নয় মুষ্ঠি পরিমিত প্রস্তুত করতে হবে। পাচনী বংশ নির্মিত, খুব শক্ত এবং লৌহাগ্র দেওয়া উচিত। এছাড়া মই নয় হাত, লাঙ্গল গোল ও ১৫ অঙ্গুলি দীর্ঘ হবে। যোত দড়ি ৪ হাত, দড়ি ৫ হাত এবং ফাল ১ হাত বা ১ হাত ৫ আঙ্গুলি পরিমিত হবে।"

অথবা বর্ষব্যাপী বিভিন্ন কৃষি আচার অনুষ্ঠানের বিবরণী থেকে জানা যায়—"কার্ত্তিক মাসে লগুড় প্রতিপদ তিথিতে গোরুর গলায় শ্যামলতা বেঁধে এবং গায়ে তৈল হরিদ্রা মেখে গো পূজা করবে। তারপর একটি উৎকৃষ্ট বলদের অঙ্গে কুঙ্কুম ও চন্দন লেপে ও বস্ত্রাদিতে ভূষিত করে রাখাল পাচনী হস্তে বাদ্য বাজিয়ে নাচতে নাচতে গ্রামের মধ্যে বৃষকে ভ্রমণ করাবে। এতে গো বিঘ্ন দুর হয়। কার্তিকের প্রথম দিনে গরুর গাত্রে তৈল হরিদ্রা ও কুঙ্কুম লেপন করবে তাদের গায়ে তপ্ত লৌহের দাগা দেবে এবং লেজ ও কর্ণের লোম কেটে দেবে। এতে এক বৎসর গরু

সুস্থ থাকে।” এছাড়াও মাঘ মাসে গোবর কাটার উল্লেখ রয়েছে। কৃষিতে কোন কোন বর্ণের বলদ প্রশস্ত এবং ক্ষেত্র চাষে প্রক্রিয়া ও বিধিরও উল্লেখ গ্রন্থটিতে রয়েছে।

কৃষি উপকরণের শব্দ ও নাম, গরুর গায়ে দাগ দেওয়ার রীতি, বাঁদনা পরবে গো পূজা বন্দনা আচার অনুষ্ঠানেরই যে এইগুলি বিবরণ তা কুড়মি কৃষককে বোঝানোর প্রয়োজন নেই। আনুপূর্বিক ইতিহাস থেকে আমরা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি ভারতবর্ষে কুড়মি জাতির মানুষেরা কৃষির আবিষ্কারক, কৃষি প্রযুক্তির আবিষ্কারক, ধারক, বাহক পালক অতীত কাল থেকে আজ অবধি। কৃষিই তাদের জীবনচর্যা, জীবন বৃত্ত, ধর্ম ও সংস্কৃতি। তাই সারা বিশ্ব তথা মানব সভ্যতা কুড়মি তথা ভারতের কৃষি সভ্যতা সংস্কৃতির কাছে ঋণী। ভারতবর্ষের কৃষির ইতিহাস ও কুড়মি জাতির ইতিহাস একই সূত্রে বাঁধা। সে ইতিহাস ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে ও ধারাবাহিক এবং ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

তথ্যসূত্র :-

১। বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) - নীহাররঞ্জন রায়
২। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ও গৌতম বুদ্ধ - সাধনকমল চৌধুরী
৩। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ - ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার
৪। এনসিয়েন্ট সোসাইটি - লুইস হেনরি মর্গান (বাংলা অনুবাদ)- অসিত চৌধুরী
৫। ভারত ইতিহাসের সন্ধানে- দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
৬। ঋগ্বেদ সংহিতা (২য় খন্ড) - রমেশ চন্দ্র দত্ত
৭। ইতিহাস অনুসন্ধান - পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ
৮। ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি - ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
৯। সিন্ধু সভ্যতার ভাষা ও কুড়মালি - কিরীটি মাহাত

মানভূমের কুড়মি ও কুড়মালি সংস্কৃতি

ড. ক্ষীরোদ চন্দ্র মাহাতো

সাবেক মানভূমের তথা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের বসবাসকারী কুড়মি জনজাতিদের উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস বিষয়ে সর্বপ্রথম আলোকপাত করেছিলেন বিদেশী পণ্ডিতেরা[১]। যদিও তাদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ ছিল, তবু তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, কুড়মিরা একটি প্রাচীন জনজাতি এবং বিশ্বের প্রাচীন জনজাতিগুলির মতো কুড়মিদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি আছে। আছে তাদের নিজস্ব ধর্ম- 'সারনা' ধর্ম। এছাড়াও লক্ষ্য করা যায় যে, অন্যান্য প্রাচীন জনদের মতো কুড়মিরাও- 'টোটেমিক' জনজাতি। কুড়মিদেরও "টোটেম" (কুলতিলক) হলো বিভিন্ন পশু-পক্ষী-বৃক্ষ- লতাপাতা ইত্যাদি। প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক ভেবে তারা আত্মীয়তা অনুভব করে এজাতীয় বিভিন্ন 'কুলতিলক' গ্রহন করে। স্বভাবতই, কুড়মিদের আচরিত নানাপ্রকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মেও প্রকৃতি-পরিবেশের প্রভাব বেশি। তাদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যেমন প্রকৃতি-পরিবেশের দান আছে, তেমনি কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত বারো মাসের তেরো পার্বনেও প্রকৃতি পরিবেশের প্রভাব আছে।

এতদ্ঞ্চলে সাঁওতাল, ভূমিজ মুন্ডা, কোল, কোড়া, কামার, কুমহার, লোধা, শবর, বাগাল ইত্যাদি বিভিন্ন জনজাতির সঙ্গে কুড়মিরাও বসবাস করে এবং বলতে গেলে কুড়মিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তারা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্গত [১ক]। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বসবাসরত কুড়মিদের সংখ্যার একটা লম্বা তালিকা রিজলে সাহেব দিয়েছেন। তাঁর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায়, ১৮৭২ ও ১৮৮১ সালে মানভূমে বসবাসকারি কুড়মি জনজাতির সংখ্যা যথাক্রমে ১৩৭৯৫৪ ও ১৬৮৩৮০ জন[২]। আর ১৯৪১ সালের তথ্য অনুসারে মানভূম জেলায় কুড়মিদের সংখ্যা ছিল ৩২৩০৬৮ জন[২ক]। এর থেকে কুড়মিদের সংখ্যাধিক্যের কথা স্পষ্টতই বোঝা যায়। অতীতের মতো সাম্প্রতিক কালের ভারত সরকারের জাতি ভিত্তিক জনগননার প্রতিবেদনও

সেই কথায় প্রমান করে। এমনকি এই অঞ্চলের সংস্কৃতি কুড়মি-মাহাতদের নিয়ন্ত্রিত সংস্কৃতি -'কুড়মালি সংস্কৃতি' তা পন্ডিতেরা স্বীকারও করেছেন। অর্থাৎ মানভূমের সংস্কৃতি মানেই কুড়মি জনজাতির আচরিত সংস্কৃতি, এ কথা বলা যেতেই পারে।

কুড়মিরা মুলতঃ কৃষিজীবী। রিজলে সাহেবের কথার "Kurmis are excellent cultivators."[৩ক]। চাষবাস হলো তাদের মূল জীবিকা। জল-জঙ্গল-জমিনকেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত কুড়মি জাতি 'হড় -মিতান' সমাজ ব্যবস্থায় অন্যান্য জনজাতি নিজেদের কৃষিকাজের সহায়ক করে তুলেছিল। খুব স্বাভাবিকভাবেই কুড়মিরা গ্রামের পর গ্রাম এক প্রকার সামাজিক দিক দিয়ে আধিপত্য কায়েম করেছিল। পাশাপাশি কৃষিকেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত কুড়মি জাতির আচরিত সংস্কৃতিও লোকসমাজের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল।

কুড়মি জাতির স্বভাব তথা চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলি, জনমানসে প্রচলিত এই জাতি সম্পর্কিত প্রবাদগুলোতে ধরা পড়ছে। যথাঃ[৪]-

ক) 'কুড়মি আজ্জে চিনি, খায় পানি।'
(পরিশ্রম করে উপার্জন করলেও, নিজেরা তা উপভোগ করে না।)
খ) 'কোল, কুড়মি, কড়া', 'বেদ-বিধি ছাড়া'।
(এই তিন জাতির আচার-আচরণ কোনও নীতি-নিয়মের দ্বারা চালিত হয় না।
গ) কুড়মির মাড়; ভূমিজের কাঁড়'।
(কুডমিদের প্রিয় খাদ্য ভাতের ফেন্ ও ভূমিজদের তীর চালানো বিখ্যাত)
ঘ) 'ঢঁড়্ কুড়মি লেটেপেটে; ঢঁড়্ সামাইল পেটেপেটে'।।
(ঢঁড়্- -পিছনে, ঢঁড়-নির্বিষ সাপ; দুর্বলতার জন্য প্রতিযোগিতায় পিছনে থাকা)
ঙ) 'বহুত্ কাঠে মহুল সিঝ্হে ; বহুত কথায় কুড়মি বুঝ্হে'।
(একগুঁয়ে মনোভাব, সহজ কথা সহজে বুঝতে চায় না।)
চ) 'ঢঁড় কুড়মি একাশি, শালুক নাড়্হার বেসাতি'।
(চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব)

মানভুঁইঞা প্রবাদে কুড়মিদের জীবনযাত্রা ও চারিত্রিক ধর্ম সম্পর্কে এইসব কথার উল্লেখ থাকলেও, তারা যে এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা ও দক্ষ কৃষক তা পন্ডিতমহলে বিবেচিত হয়ে থাকে। পন্ডিতেরা অনুমান করেন যে, 'পালযুগে সামন্তশ্রেণীর মধ্যে ক্ষত্রিয়ত্ব লিপ্সা যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল সেই সময়ে সমাজে কৃষি-নির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে 'কুটুম্ব' নামক কৃষিজীবী একটি সম্প্রদায়'[৫] তৈরি হয়েছিল। এই 'কুটুম্ব' সম্প্রদায়ই নাকি পরবর্তী কালে 'কুড়মি' নামে কৃষকগোষ্ঠীর উদ্ভব (কুটুম্বিন > কুনবি > কুডুম্বি > কুড়মি)। বস্তুতঃপক্ষে, 'গ্রামে যাহাদের বাস

করিতে হইত, তাহারা সাধারণতঃ কৃ-নির্ভর ভূম্যাধিকারী, মহত্তর, কুটুম্ব, কৃষক বা ক্ষেত্রকর, সমাজশ্রমিক, ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক এবং কিছু কিছু কৃষি ও গৃহস্থ কর্মসম্পৃক্ত শিল্পী"[৯] ছিল। পরবর্তীকালে তারাই 'কুড়মি' জাতি হিসাবে সমাজে এক কৃষক সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত হয়।

কৃষিকাজ 'কুড়মি' জাতির মূল জীবিকা হওয়ায়, কৃষি কেন্দ্র করেই কুড়মিরা একটি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল বা বাতাবরণে বছরভর বিভোর হয়ে থাকে। ফলে তাদের সংস্কৃতিও কৃষিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। তবে, 'হড়-মিতান' সমাজ ব্যবস্থায় পাশাপাশি সহাবস্থানে বসবাসের ফলে অন্যান্য জনজাতির মানুষজনও এই সাংস্কৃতিক পরিবেশকে আত্মীকরণ করে নিয়েছে। কুড়মিদের কৃষিবর্ষে ছয়টি মাস- 'মধুমাস' বা 'মহুলমাস', 'লিরনমাস', 'রপামাস', 'ভাদরমাস', 'কাটিনমাস' ও 'জাড়মাস'। তাদের কৃষিবর্ষ শুরু হয় ১লা মাঘ 'আখ্যাইন যাত্‌রা'-র দিন থেকে। সাবেক মানভূমের প্রতিটি কুড়মি পরিবারের গৃহকর্তা সকালবেলা উপবাস দিয়ে স্নান সেরে, এই পূণ্যদিনে নতুন হাল্-ফাল্-আঁদ্-বেইনি সহ কৃষি যন্ত্রপাতি দিয়ে গরু বা কাড়া (পুরুষ মোষ) জোড়াকে লাঙ্গল যুতে নিজের নিজের চাষযোগ্য জমিতে 'আড়াইপাক' লাঙ্গল চালিয়ে চলতি বছরের কৃষিকাজের সূচনা করে। একে তারা 'হালপুইন্যা' বলে। "হালপুইন্যা" করে ফিরে আসার পর তারা গরু জোড়ার শিং-এ তেল-সিন্দুর মাখিয়ে দেয় এবং কুলোয় করে খেতে দেয় ধান, খামারের এক কোনে অবস্থিত 'গবরকুড়ে' মারে কোদালের তিন কোপ। আর সবশেষে, লাঙ্গল চালক খায় দই-চিড়া-গুড় সমন্বিত এক জম্পেশ ফলার।

"আখ্যাইন যাত্‌রা"র এই পুণ্যদিনেই মানভূমের কৃষিজীবী 'হড়- মিতান' গোষ্ঠির মানুষজন নিজেদের মধ্যে বার্ষিক চুক্তিতে পরস্পর পরস্পরের কৃষিকাজে সহায়তা করবার জন্য আবদ্ধ হয়। বাগাল-রাখাল, কামিন-মুনিষ সকলেই নিজ নিজ 'গলাঘর' বা 'মুনিবঘর' বেছে নেয়, কামার-কুমহার-ধবা-লাপিত-হাড়ি-মুচি-ডম সহ বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির মানুষজনও বেছে নেয় নিজের মনমত 'গলাঘর'। বার্ষিক ধানের বিনিময়ে সেই চুক্তি সম্পন্ন হয়। এই চুক্তির সময়সীমা উভয়পক্ষের কাছে বলবৎ থাকে পৌষ-সংক্রান্তি অর্থাৎ মকর পরব পর্যন্ত। এইদিন চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মেয়াদ শেষ হয়। যেহেতু পরেরদিন থেকে মাঘ মাসের শুরু, তাই ঐদিন থেকে কৃষিকাজে সংযুক্ত সব বাগাল-রাখাল, কামিন-মুনিষদের নিজ নিজ 'গলাঘর'-র সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়। এইদিন থেকে তাদের ছুটি অর্থাৎ 'মাঘ মাস'। এই ১লা মাঘ দিন থেকে তারা ইচ্ছে করলে পুরানো 'গলাঘরে' ই নতুন করে চুক্তিবদ্ধ হয়ে থেকে যেতে পারে নতুবা নিজেদের পছন্দমত নতুন 'গলাঘর' চয়ন করে বার্ষিক ধানের

চুক্তিতে কৃষিকাজের সহায়তা করতে পারে। তেমনিভাবে, কৃষিজীবী কুড়মি জনজাতির কৃষিকাজের সহায়ক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য তৈজসপত্র সারাবছর সরবরাহের জন্য 'হড়-মিতান' সমাজ ব্যবস্থায় কামার-কুমহার-ধবা-লাপিত-হাড়ি-মুচি- ডম্‌ সহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির মানুষজনও নতুন করে বাকি ধানের বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ হয়।

এই "আখ্যাইন যাত্রা"-র দিন থেকেই শুরু হয় মানভূমের গ্রামে গ্রামে 'ভানসিং মেলা'[৭]। সারা মাঘ মাস জুড়েই, আজ এ গ্রাম ত কাল সে গ্রামে বসে এই মেলা। ভানুসিংহ অর্থাৎ সূর্যদেবের বন্দনা। এইদিন থেকেই সূর্যদেবের চলন উত্তরায়ন থেকে দক্ষিণায়নের অভিমুখে শুরু হয়। মানভূমের কৃষিজীবী মানুষজনের চেতনায় সূর্যদেবের এই প্রদক্ষিনে কৃষিকাজে প্রভাব ফেলে, তাই গ্রামের প্রান্তে উন্মুক্ত প্রান্তরে সকলে সমবেত হয়ে আনন্দ উদ্‌যাপন করা। মেলায় বসে নানান মনোহারী দ্রব্যের পসরা কেনাকাটা। গৃহস্থের টুকিটাকি জিনিসপত্র সহ বিভিন্ন কৃষিযন্ত্রপাতি হাল-জুয়াল, উদল, লিঘা-মই, গাড়ির চাকা, গাড়ির ঢাকা বাঁশের চাঁচড়া, বাঁশের ছাতা, মাছ ধরবার ঘুঘি-সিয়াড়া ইত্যাদি হরেক কিসিমের বেচাকেনা। কৃষিজীবী মানুষজন নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাংসারিক নিত্যপ্রয়োজনীয় তৈজসপত্র সহ চাষের কাজের জিনিসপত্র রকম মেলা থেকেই সম্বৎসরের জন্য সংগ্রহ করে নেয়।

অন্যদিকে, এদিনই কৃষিজীবী কুড়মি জাতির মানুষেরা পূজা করে বিভিন্ন গ্রামদেবতা বা লৌকিক দেবতার[৮]। "গরাম ঠাকুর", "গুঁসাই ঠাকুর", "দুয়ারসিনি", "কুদরাসিনি", "চড়কাসিনি" "রাঙাহাড়ি", 'পিটি-ঠাক্‌রান', 'বাঘুৎ', 'বিরহি-ঝাঁপড়ি'-র মতো গ্রামদেবতা বা লোকদেবতার ধানে পূজায় মেতে উঠে সাবেক মানভূমের কুড়মি সহ কৃষিজীবী বিভিন্ন জনজাতির লোকজন। তাদের স্থির বিশ্বাস, কৃষিবর্ষের শুরুতেই গ্রামদেবতার পূজা করে আশির্বাদ নিয়ে কৃষিকাজে নামলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। কারন, এইসব দেবতাগুলোই তো গ্রামের ভাল-মন্দ দেখভাল করেন। অতএব, তাদের সন্তুষ্ট রাখতে পারলেই 'গোয়াল ভরা গরু', গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ', সুখ- সমৃদ্ধি যেন উপচে পড়বে। এই সব বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার উপাচার, বলি ও বলির প্রসাদ ভক্ষণের নিয়ম-কানুনও আবার হরেক রকমের। কোনো দেবদেবীরই কোনো মূর্তি নেই, স্থায়ী মন্দিরও নেই। কোথাও কালো রঙের পাথর, কোথাও বা সাদা রঙের পাথর বিভিন্ন নামে গ্রামদেবতা হিসাবে পূজিত হয়। সেই পূজায় কোনো দেবতার থানে বলি হয় লাল মোরগ তো কোনো কোনো দেবতার থানে কালো। কোনো দেবতার থানে সাদা ছাগল পাঁঠা তো কোনো দেবতার থানে পাঁঠি ছাগল। আবার কোনো কোনো দেবতার থানে ভেড়া, হাঁস, পায়রা বলির প্রথাও আছে। মানবাজার-২নং ব্লকের নলকুড়ি গ্রামের এক পুকুরপাড়ে অবস্থিত সহিস

জনগোষ্ঠীর পূজিত 'বিরি-ঝাঁপড়ি'-র থানে বলি হয় কুমারী শুকর। বলির মাংস 'প্রসাদ' ভক্ষণেও নানান বিধি-নিষেধ। কোনো দেবতার প্রসাদ মেয়েদের খাওয়া নিষেধ তো কোনো দেবতার প্রসাদ বাড়ীর বাইরে রান্না করে খেতে হয়। আবার বিশেষ জনগোষ্ঠির 'প্রসাদ' মাংস অন্য জনগোষ্ঠীর মানুষজন ভক্ষণ করলে কোনো দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়বে না- এ বিশ্বাসও কৃষিজীবী লোকচেতনায় চালু আছে।

তারপর চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু হয় শিব-গাজন। শিব হল কৃষিজীবী কুড়মিদের কাছে তথা মানভূমের লোকচতনায় কৃষি দেবতা-কৃষিকাজের আদিগুরু। অতএব তাকে সন্তুষ্ট করলে কৃষিতে লাভ উঠবে। সে জন্য সারা 'লিরণমাস' জুড়ে চলে সাবেক মানভূমের গ্রামে গ্রামে শিবের গাজন। আজ এ গ্রামে তো কাল সে গ্রামে। ভগ্‌তা (ভক্ত)দের সমবেত জয়ধ্বনিতে শিব থানগুলি সারারাত থাকে মুখরিত। রাতভর চলে ছো-নাচের আসর। বুধপুরের 'বুদ্ধেশ্বর', আনাড়ার 'বানেশ্বর', চিড়কার 'গৌরীনাথ' সহ বেড়াদার শিব, কোশজুড়ির শিব-র মতো গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন নামে শিবের পূজা হয়। চলে 'অম্ববতী' (অম্বুবাচী) পর্যন্ত।[৯] আর, 'লিরণমাসে'র শিবের তান্ডব নৃত্যের মতো কালবৈশাখীর ঝড়ের পরেই নামে বর্ষা। এরই ফাঁকে জ্যৈষ্ঠের ১৩ দিনে "রোহিন" পরব। 'বারঅ দিনে বারঅনি, তেরঅ দিনে রোহিন'। সেদিন ভোরবেলা থেকে চলে প্রতিটি কুড়মি পরিবারের মেয়ে মহলের জোর কর্মতৎপরতা। ভোরবেলায় মুখ- হাত ধুয়ে না ধুয়েই প্রতিটি ঘরে গোবরের বেড়া দেওয়া ঘর-দোর গোবর জল দিয়ে নিকানো, বেলার দিকে স্নান সেরে 'রোহিনমাটি' সংগ্রহ করা, বীজ বার করা, পরিবারে প্রত্যেক সদস্যের 'রোহিনফল' খাওয়া, সর্বোপরি সাঁঝেরবেলায় হ্যারিকেনের আলোয় উঠোনে পরিবারের সকলে গোল হয়ে বসে কচড়া পিঠা খাওয়া।

আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল, 'রপামাস'। জোরকদমে চলে চাষের কাজ-'চাষে রুপ নাশে'। কৃষিজীবী মানুষজনদের বেলা যায় ক্ষেতের কাদা পায়ে। হাল বাঁহিহে, আইড়্ কদ্‌লাঁই পরিশ্রান্ত পুরুষেরা; আফর উপড়াঁই, ধান লাগাঁই ক্লান্ত মহিলারা। তবুও চাষবাস শেষ হলে আনন্দে মেতে উঠে মানভূমের কুড়মি সহ বিভিন্ন জাতির মানুষজন। দেখতে দেখতে চলে আসে ভাদ্রমাস। ভদ্রমাদের পার্শ্ব একাদশীর দিন 'করম পূজা'। তার এক সপ্তাহ আগে কোনো জলাশয়ের কাছে গিয়ে নতুন ডালায় বালি ভর্তি করে বিভিন্ন শষ্যবীজ বুনে কুমারী মেয়েদের 'জাওয়া পাতানো'। কুড়মি কুমারী মেয়েদের যা নিজস্ব সংস্কৃতি। প্রতি সন্ধ্যায় 'জাওয়া-ডালা'কে ঘিরে 'জাওয়া-গান' গাওয়া। কুড়মি কুমারী মেয়েদের গাওয়া 'জাওয়া গান'-এ মুখরিত হয়ে উঠে গ্রামের পর গ্রাম, কুলহির পর কুলহি। পরের দিন 'ইঁদ-পরব' বরাবাজারের ইঁদ, ঝাড়গ্রামের ইঁদ বিখ্যাত। তারপরই ভাদ্র সংক্রান্তি, 'ছাতা পরব', চাকলতোড়ের

'ছাতা পরব'- 'ছাতা দেখিতে লক চলে খাতা খাতা হে' (খাতা > দলবদ্ধভাবে)।

আবার, ভাদ্র সংক্রান্তির দিনই সমগ্র মানভূমে 'ভাদু-পূজা'র অবদান। এই দিনই একমাস ধরে চলা প্রাণের ধন 'ভাদু' নিয়ে বিভিন্ন আচার সংস্কারের ভাসান। জনশ্রুতি, ভাদু 'কাশীপুরের রাজার বিটি'। এ নিয়ে লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ মহলে ঐক্যমত নেই[১০]। 'তবে, রাজকন্যা হোক না হোক, মানভূমের জনজাতিগোষ্ঠীর চেতনায় "ভাদু" ঘরের মেয়ে-একান্তই আপনজন। আর এই প্রিয়জনই তো কখনো কখনো মনের অন্তঃস্থলে দেব-দেবীরূপে অধিষ্ঠিত হন এবং এই প্রিয়জনের প্রতি ভালোবাসা ঝরে পড়ে পূজা হয়ে।' তাই, 'পঞ্চকোট রাজকন্যা ভদ্রাবতী বা ভাদু'র পরিচয়জ্ঞাপক জনশ্রুতিটির যদিও কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, তবু ভাদু'র জনপ্রিয়তার নিরিখে এ কথা বলা চলে যে, আদরের দুলালী ভাদু'র অকালমৃত্যুকে চিরস্মরণীয় করে তুলতে নিম্নশ্রেণীর প্রজাসাধারণের মেয়েদের মধ্যে প্রথম ভাদু গান, ভাদু পূজা, ভাদু ভাসান উৎসবের সূচনা হয়েছিল। আর তখন বাগদী, বাউরি, ডোম, কুড়মি, কামার, কুমহার, বাগাল সমস্ত জাতিগোষ্ঠীই গ্রামে একই সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করত এবং সকলকেই নিম্নশ্রেণীর প্রজা হিসাবে ধরা হত। ফলে শুধু বাগদী-বাউরিদের মধ্যেই নয়, মাহাত, ভূমিজসহ অন্যান্য জনজাতিদের মধ্যেই ভাদু গানের ব্যাপক প্রচলন ছিল ও সকলেই ভাদু পরবে অংশগ্রহন করত'।[১১]

এরপর আশ্বিন মাসের 'জিতাষ্টমী' পালন। কুড়মি জাতির বিবাহিত মহিলাদের নিজস্ব পরব। পৌরাণিক ছোঁয়াচ বা আদল নেই, স্রেপ উৎপাদনশীলতা বা সৃজনশীলতার প্রতীক হল 'জিতা' ঠাকুরের পূজা। এর উদ্ভব নিয়ে জনমানসে প্রচলিত কিছু জনশ্রুতি ও পৌরাণিক 'জীমূতবাহন' দেবতার পূজার প্রতিরূপ হিসাবে 'জিতা ঠাকুর' পৌরাণিক 'জীমূতবাহন' নয়। "কিন্তু সাবেক মানভূমের কুড়মি সহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপাস্য "জিতাষ্টমী"-র 'জিতা ঠাকুর' পৌরাণিক 'জীমূতবাহন' নয়। এর উৎস সম্পূর্ণতই লৌকিক ধারণা থেকে। "জন্ম" থেকে 'জাত' অর্থাৎ সৃষ্টি বা বৃদ্ধি হওয়া। এই 'জাত' শব্দ থেকেই 'জিতা'-র উৎপত্তি। ...সংসারে নতুন জীবের জন্ম হলেই এই ব্রত পালনের অধিকার জন্মাবে আর কোন জীবের মৃত্যু ঘটলেই ব্রত ভ্রষ্ট হবে-এই বিশ্বাস ফলে 'জন্ম' থেকে 'জাত' থেকে 'জিতা' আসাই স্বাভাবিক। এই ব্রতে সধবাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি এই 'জাত' শব্দকেই প্রতিষ্ঠিত করে। অতএব, সৃষ্টির উদ্দ্যেশেই 'জিতা পূজা'।[১২] তাছাড়া, এর আচারের দিক থেকেও শিয়াল-শকুনের মুখে ছাই দিয়ে 'আড়াই কামড়' দেওয়া, কাঁকইড় (শশা)-কে বেটা (পুত্র) ভেবে যত্ন নেওয়া আর যাইহোক 'জীমূতবাহন' বোঝায় না। কাঁকইড় (শশা)-কে বেটা হিসাবে কল্পনা করা এই কুড়মি সংস্কৃতির পক্ষেই সম্ভব। তাই সুখ, সমৃদ্ধি ও সন্তান কামনায়

মানভূমের জনগোষ্ঠীর মহিলাদের দ্বারা মহা ধুমধাম করে পালিত হয় 'জিতা পরব'।

দেখতে দেখতে চলে আসে আশ্বিন মাসের শেষ দিন- সংক্রান্তি। সাবেক মানভূমের তামাম কৃষিজীবী কুড়মি জনগোষ্ঠী এই দিনটিকে পালন করে "জিহুড়" দিন হিসাবে। 'জিউ' শব্দের অর্থ হল 'বাঁচা' আর 'মানুষ' অর্থে 'হড়' শব্দটি গৃহীত। তাই, মানুষের বেঁচে থাকা বা দীর্ঘ জীবনলাভ অর্থে 'জিহুড়' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে বলা যেতেই পারে। জল-জঙ্গল-জমিন কেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় কৃষিজীবী কুড়মি সমাজে 'জিহুড়' দিনের তাৎপর্য অনেক। লোকবিশ্বাস, এই দিন থেকেই লক্ষ্মী তার আগমন বার্তা ঘোষণা করে চাষিদের উদ্দেশ্যে। আশ্বিনের শেষে স্বাভাবিক নিয়মেই ধানক্ষেতের প্রতিটি ধানগাছের থোড় এসেছে। পেটে ধানের শিস্। কিছুদিনের মধ্যেই এই ধানের শিস্ ধানগাছের পেট চিরে বের হবে। মাঠের পর মাঠ ভরে উঠবে পাকা ধানে। তারই আহ্বান যেন শুনতে পায় চাষিরা। এজন্য চাষিরা এই দিনটাকে ডাক দিন বলে মনে করে। এদিন ব্যস্ততা বেড়ে যায় চাষি পরিবারগুলিতে। চাষিরা নিজেদের খামার পরিষ্কার করে। সব জঞ্জাল পরিষ্কার করে, জল ঢেলে, লাঙল চালিয়ে কাদা করার পর হাত দিয়ে সুন্দর ভাবে সমতল করে 'খামার পইল্যায়', একে বলে 'খামার বাঁধা'। 'খামার পইল্যা' হয়ে গেলে গৃহকর্ত্রী স্নান করে ভিজে কাপড়েই এসে সদ্য কর্দমাক্ত খামারের মাঝখানে তেল- সিন্দুর-গুঁড়ি মাখা ছোট মাটির ভাঁড় বসিয়ে দেয়। তার সঙ্গে দেয়, একটি ভাঙ্গা কুলা, একটি ঠেঁটা ঝাঁটা, একটি ভেলা গাছের ডাল। কেউ আবার এর সঙ্গে দেয় গাঁজার পুঁটলি ও কল্কে। বিশ্বাস, এর ফলে দূর হবে যাবে অলক্ষ্মী-খামারে লক্ষ্মীর আসন পাকা হবে।[১৩]

আর আশ্বিন পেরিয়ে কার্তিক মাসের 'বাঁদনা' পরব তো কুড়মিদের 'রক্তের ভিতরে খেলা করে।' কৃষিকাজের সহায়ক গবাদি পশু গরু-কাড়া সহ কৃষি যন্ত্রপাতির বন্দনা" (Thank Giving) একমাত্র কুড়মিরাই ভাবতে পারে। যাদের শ্রমে ও কুশলতাই সবার মুখে অন্ন জোটে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো আবশ্যক। কৃষিজীবী কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষজন সেটাই করে। মূলতঃ তিন দিন হলেও, পাঁচ বা সাত অর্থাৎ বিজোড় দিন থেকেই গরু-কাড়ার শিং-এ তেল মাখিয়ে দেয়। ঐ ক'দিন হলুদ গোলা জলে প্রতিটি গবাদি পশুর পা ধুইয়ে ঘরে ঢোকায়। 'ঘাওয়া', 'অমাবস্যা', 'গরয়া', 'বুড়হি বাঁদনা' ও 'কাঁটাকাড়্হা'- এই নামে পাঁচদিন ধরে চলে, মানভূমের প্রতিটি কুড়মি পরিবারে নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান। গাওয়া হয় গো-বন্দনাসূচক 'অহিরা' গান। 'ঘাওয়া'-র দিনে সংসারের সমস্ত কাজকর্ম শেষ করবার দিন। মাটির ঘর গোবর দিয়ে পরিষ্কার করা, দেওয়ালে রং-বেরং-র ছবি আঁকা, পিঠে তৈরির জন্য চাল-গুঁড়ি ঢেঁকিতে কুটে রাখা ও তেল-গুড় যোগাড় করা, অমাবস্যার রাতে

গোয়ালঘরে 'জাগর হাঁড়ি' জ্বালাবার জন্য ঘি যোগাড় করা ইত্যাদি নানাবিধ কাজে সকলেই ব্যস্ত থাকে সারাদিন। 'অমাবস্যা'-র দিনে রাতের বেলা গোয়ালঘরে মাটির হাঁড়ি ফুটো করে তার ভিতরে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে শিকা দিয়ে ঝুলিয়ে দেয় 'জাগর হাঁড়ি'। মাটির হাঁড়ির ফুটোর ফাঁক বেরিয়ে আসা মায়াবি আলোয় সারারাত গোয়ালঘরে এক মায়াবী পরিবেশে ভরিয়ে তোলে। আর নিশুতি রাতে বের হয় 'ঝাঁঙ্গড়' বা 'ধাঁঙ্গড়'[১৪] দল। অহিরা গান গাইতে গাইতে ঐ নিশুতি রাতেই প্রতিটি গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকে কৃষিসহায়ক যন্ত্রপাতি ও গবাদি পশুদের জাগিয়ে তোলে-

অহিরে-
জাগ মা লক্ষ্মী, জাগ মা ভগবতী,
জাগে ত আমাবস্যার রাতি- বাবু হো
জাগে কা পতিফল দেবে মা লক্ষ্মী
পাঁচ-পুতায় দশ ধেনু গাই...

বিশ্বাস, অমাবস্যার এই নিশুতি রাতে লক্ষ্মী-ভগবতী (গোধন) বন্দনা করলে, তার প্রতিফল হিসাবে মা লক্ষ্মী পাঁচ সন্তান, দশ গো-মহিষ দান করে গৃহস্থের সুখ-সমৃদ্ধি দান করবেন। 'গরয়া' দিনে 'গরয়া পূজা'য় 'শিরিগাই'- 'শিরিবলদ'কে ধান-দূর্বা-সিঁদুর-কাজল পরিয়ে বরণ করে নেওয়া। এই উপলক্ষ্যে 'গরয়া-গুঁসাইরায়ে'র জন্য লাল মোরগ আর অপদেবতা 'কুদরা' ঠাকুরের কুদৃষ্টির প্রভাব থেকে সংসারকে বাঁচাতে কাল মোরগ বলি দেওয়া হয়।

'কাল-কুদ্‌রা' বাড়ির ভূত-
কাল খুক্‌ড়া দিলেই চাপচুপ।

দ্বিতীয়ার দিন পালিত হয় 'বুড়হি বাঁদনা'। সারা উঠোন, খামার 'পাইন্যা লতা'র জলে চাল-গুঁড়ি গুলে 'চোখ-পুরা'। বিকেলে 'কাড়া খুঁটা' বা 'গরু খুঁটা'। আর 'কাঁটা কাঢ়হা'র দিন হল পাঁচদিন ধরে চলা এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তির দিন তাই এদিন আর বিশেষ কিছু আচার মূলক অনুষ্ঠান থাকে না। বিকেলে আনন্দ-ফূর্তি সূচক শুধুই কুলহি কুলহি 'গরু খুঁটা বা 'কাড়া খুঁটার' জমজমাট আসর। আর পাঁচদিন ব্যাপী এই 'বাঁদনা' অনুষ্ঠানের অমাবস্যার রাত ও 'গরু খুঁটা' বা 'কাড়া খুঁটা'র মূল আকর্ষণ 'অহিরা গান'। কুড়মালি ভাষায় লোকসাহিত্য। উক্ত প্রত্যুক্তি মূলক এ গানেই ফুটে উঠেছে কুড়মি ও কুড়মালি জীবনদর্শন। মানভূম লোকসাহিত্যের অন্তর্গত মৌখিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু 'অহিরা গান' কি শুধুই সৌভাগ্য বা নিছকই ব্যক্তিগত দুখ ও সমৃদ্ধি কামনার গান? কোনো সুগভীর জীবন জিজ্ঞাসার বাণী বহন করে না? না এই গান নিতান্তই কতকগুলো অশিক্ষিত, গ্রাম্য, মূর্খ মানুষের ধামসা-মাদল নিয়ে অ রুচিহীন ক্রিয়াকলাপ।

বংশ পরম্পরায় আচরিত এই 'অহিরা গান'-এ বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর আধ্যাত্মিক জীবন-জিজ্ঞাসা 'এ জীবন লইয়া কি করিব?'-র সহজ-সরল উত্তর ফুটে উঠে। 'ঝাঙ্গড়্যা'দের 'অহিরা গান'-এ বঙ্কিমচন্দ্রের এই জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া যায়।

অহিরে-
কিসের লাগ্যে ভালা আঁচির -পাঁচির রে বাবু হো
কিসের লাগ্যে ধন-বিষয়...
আর কিসের লাগ্যে ভালা সনার অঙ্গ দেহ ভাই
কিসের লাগ্যে ভবের বাজার।

অর্থাৎ কি জন্য এইসব 'আঁচির-পাঁচির'- মাল্টি স্টোরেড বিল্ডিং? 'ধন-বিষয়' অর্থাৎ টাকা-পয়সা, ব্যাঙ্ক ব্যালান্সই বা কিসের জন্য? নানা ধরণের নামী-দামী প্রসাধন চর্চিত-সুরভিত এই মানবদেহই বা কার জন্য? ভব-সংসারে মানব রূপে জন্মলাভ কেন? বঙ্কিমচন্দ্র তা সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে যে সুগভীর জীবন-জিজ্ঞাসার সত্যানুসন্ধান করেছেন, এই সব গভীর আধ্যাত্মিক সদর্থক উত্তর 'অহিরা গান'-এ অন্বেষণ করা হয়েছে। যেমন-

অহিরে-
দেখনশভার লাগ্যে ভালা আঁচির পাঁচির রে বাবু হো
আর নামের লাগ্যে ধন-বিষয়।
কামের লাগ্যে ভালা সনার অঙ্গ দেহ ভাই
এহ নিয়ে ভবের বাজার।

নিছক শোভাবর্ধনের জন্যই গৃহের চারপাশে আচির-পাঁচির'- মাল্টিস্টোরেড বিল্ডিং। যার কোন অপার্থিব মূল্য নেই। আর আত্ম-অহমিকা, আত্মম্ভরিতা প্রকাশের জন্যই 'ধন-বিষয়'-ব্যাঙ্ক ব্যালান্স। কিন্তু এই 'সনার অঙ্গ'- মানব দেহ? ঈশ্বর মহৎ কাজের জন্য এই মানবজীবন সৃষ্টি করেছেন-মনব জন্ম দিয়েছেন। এই 'ভবের বাজার'-এ মানবরূপে জন্মগ্রহন করে আত্মকেন্দ্রিক হলে চলবে না, দশের ও দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করলেই জীবনের সার্থকতা। 'ঝাঁঙ্গড়্যা'রা 'অহিরা গান'-এর মধ্য দিয়েই অমাবস্যার নিশুতি রাতে গৃহস্থকে মানবজীবনের সার্থকতা বিষয়ে সচেতন করে।

"বাঁদনা"র পর 'টুসু' পরব। মানভূমের কৃষিবর্ষের সমাপ্তি। কৃষিদেবীর যেন প্রতীকি বিসর্জন। 'চাঁউড়ি-বাঁউড়ি'-র পর পৌষ সংক্রান্তিতে 'টুসু'দেবীর নিকটস্থ জলাশয়ে বিসর্জন। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে যার বোধন পৌষ সংক্রান্তি তার বিসর্জন। এক মাস জুড়ে গানে গানে যার আরাধনা এই দিন চোখের জলে বিদায়। সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজীবি কুড়মি তথা মানভূমের বিভিন্ন জনজাতিদের লোকচেতনায় কৃষিবর্ষের শেষ। পরের

দিন ১ লা মাঘ থেকে আবার নতুন উদ্যমে কৃষিকাজের জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়া। নতুন 'গলা-ঘর', নতুন 'গাঁ-ঘর' নির্বাচন। যার শুভ সূচনা প্রতিটি কৃষকের নিজ নিজ ক্ষেতে 'আড়াই পাক' করে লাঙ্গল চষা। বর্ষে বর্ষে এভাবেই কৃষিজীবী কুড়মি-দের দিনযাপন। কবির ভাষায় 'কি মন্ত্র কহিলা ভিক্ষুকের কানে, ভিখারি চলিলা পুনঃভিক্ষার সন্ধানে'। কুড়মিরা এ ভাবেই বছরের পর বছর চাষবাসে যুক্ত থাকে। এই কৃষিকে ঘিরেই তাদের নানান সংস্কৃতি, নানান আচার। এভাবেই কৃষিজীবী কুড়মি সমাজ মানভূমের সংস্কৃতির আঙিনাকে সমৃদ্ধ করে চলেছে।

সহায়ক পুস্তক:

১। Risley, Herbert Hope : "The Tribes and Castes of Bengal" (Vol-1), Low Price Publications, Delhi, 2017, P-528-537. এই মহামূল্যবান গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, Sir Henry Eliot, Mr. Sherring, Mr. Nesfield, Sir George Campbell, Colonel Dalton প্রমুখ সাহেব তাঁদের সঙ্গে কুড়মি জনজাতিদের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। কেউ বলেছেন- কুড়মিরা সাঁওতালদেরেই একটি উন্নত শাখা, কেউ বা বলেছেন- কুড়মিরা আর্যবংশ সম্ভূত ইত্যাদি। ১ক) তদেব। পৃঃ- ৫৩০। রিজলে সাহেব বলেছেন ...all Kurmis are derived from a Dravidian stock."

২। তদেব। পৃঃ- ৫৩৭।

ক) দ্রঃ মাহাত, ড.বিনয়- 'লোকায়ত ঝাড়খন্ড', নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ.-২৫

৩। দ্রঃ ভট্টাচার্য, আশুতোষ -'বাংলার লোকসাহিত্য', এ মুখার্জী অ্যান্ড কোঃ প্রাঃ লিঃ , কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-১৯৬৫, ৩য় খন্ড, পৃঃ-৯৯২

৩ক) Risley, Herbert Hope : "The Tribes and Castes of Bengal" (Vol-1), Low Price Publications, Delhi, 2017,P-537.

৪। দ্রঃ মাহাতো, ড. ক্ষীরোদ চন্দ্র - 'মানভূম সংস্কৃতি', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কল-০৯, ২০১৬, পৃঃ-৯৩-৯৪।

৫। দ্রঃ মাহাত, ড. বিনয়- 'লোকায়ত ঝাড়খন্ড', নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ- ৩৪-৩৫

৬। দ্রঃ রায়, ড. নীহাররঞ্জন- 'বাঙালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব), পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরম সমিতি, ১৯৮০, পৃঃ-

৭। কৌতূহলী পাঠকের বিষয়ে বিস্তারিত জানবার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ 'লোকশ্রুতি' ৪৯,

Vol-15, Issue-1, January 2017. লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প.ব. সরকার। প্রবন্ধঃ 'পুরুলিয়া-বাঁকুড়ার আদিম লৌকিক দেবতা- ভানসিং'- লেখকঃ শিবশঙ্কর সিং, পৃঃ- ২৯-৩৪

৮। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানবার জন্য দ্রষ্টব্যঃ মাহাতো, ড. ক্ষীরোদ চন্দ্র- 'মানভূমের আদিবাসী লোকদেবতা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কল-০৯, ২০১১, গ্রন্থটি।

৯। মানভূম সংস্কৃতি বিষয়ে বিস্তারিত জানবার জন্য দ্রষ্টব্যঃ মাহাতো, ড. ক্ষীরোদ চন্দ্র- 'মানভূম সংস্কৃতি', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কল-০৯, ২০১৬, গ্রন্থটি।

১০। 'ভাদু'র ঐতিহাসিকতা ও উপভোক্তা বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য-

ক) মাহাত, ড বঙ্কিমচন্দ্র - 'ঝাড়খন্ডের লোকসাহিত্য', বাণীশিল্প সংস্করণ, কলকাতা, ২০০০, পৃঃ-৭১

খ) করণ, ড. সুধীর কুমার - 'সীমান্ত বাংলার লোকযান', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ-১২৩

গ) মাহাত, ড. বিনয়- 'লোকায়ত ঝাড়খন্ড', নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ -১৫২-১৫৩

ঘ) মাজী, শ্রী যুধিষ্ঠির- 'ভাদুগীতির ইতিকথা', প্রকাশক- সত্যচরণ ঘোষ, সম্পাঃ- আসর পত্রিকা, কলি-০৫,১৯৮৫ , পৃঃ-০৩

১১। মাহাতো, ড. ক্ষীরোদ চন্দ্র - 'মানভূম সংস্কৃতি', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কল-০৯, ২০১৬, পৃঃ- ৬২-৬৩

১২। তদেব। পৃঃ- ৫৪

১৩। 'জিহুড়' দিনের তাৎপর্য বিস্তারিতভাবে জানতে হলে, দ্রঃ মাহাতো, ড. ক্ষীরোদ চন্দ্র- 'মানভূমের সংস্কৃতি', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কল-০৯, ২০১৬গ্রন্থের পৃঃ- ৭০-৭২

১৪। দ্রঃ মাহাত, বঙ্কিমচন্দ্র- 'ঝাড়খন্ডি বাংলা শব্দকোষ', পরিবেশক- বাণীশিল্প, ২০০৪, পৃষ্ঠা- ২২৬। মুন্ডারী শব্দ 'দঁগড়া' > ধাঁগড়। তিনি শব্দটির অর্থ করেছেন- 'ভাতুয়া বাগাল ইত্যাদি শ্রমিক শ্রেণীর লোক। নিম্নজাতি সম্প্রদায় বিশেষ। কার্তিক মাসে অমাবস্যার রাতে গো জাগরণকারীর দল।'

Honour—Mulnivasi, Demands

By Manatosh kumar Mahato
Mining Engineer

Many adivasi Samaj are struggling and fighting since before independence and continuing till date for their travel and identity and to be listed inthe scheduled tribe list of the constitution .They are also fighting for recognition of their cultures and languages. As for example Kurmis/ Kudmis of Jharkhand state West Bengal Odisha Chhattisgarh, Assam, Madhaya pradesh ,are continuing their democratic movement. for inclusion in scheduled tribe list of the constitution. There is no way , but one day the Nation has to recognise and it is to include KUDMI /Kurmis in the scheduled tribe list of the constitution as happened in case of movement of three tribal groups in Goa after independence of India.

TOTEMS PROVE TRIBAL IDENTITY

It is said that some authorities have fastened it as the most ancient and primitive form of religion. A totem is a species of plant religion of plant or more rarely a class of inanimate object to which a social group or class stands in an intimate and very special relation or friendship or Kinship Frequently it is thought as the ancestor of the clan and which provides that social group with its name The Totem is not exactly God but a cognition being and is to be respected.. It is an strong superstition though aboriginals in their early stage attributed any mishap or misfortune that had happened to a person or family to

(a) The hunting or killing of an insect or bird or animal

(b) To the cutting of plant or tree or (c) to the plucking of flowers or fruits etc….. should such an action had been done by that person for family early years to the happening of the mishap and with a view to paying homage and respect to the hurt or killed animal, Insect b) cutting of plant or trees and plucking of flowers were forbidden and probably this is totem Customs and its Origins.

The totemism is found among the tribes of India' means those who have totems are Tribes/Adivasi of India.

Totem is a fundamental criteria to identify Tribes in india.

TOTEMS OF KUDMI / KURMI

there are 1488 groups of kurmis among the adivasis in the whole of India, out of which kurmis/ Kudmis have 101 totems in the states of Jharkhand West Bengal Odisha Chhattisgarh and Madhya Pradesh Assam and to some extent Maharashtra Gujarat, Rajasthan. Bihar ,and Uttar Pradesh, Deccan India . These totems are ………………..—

1. Akhriar 2..Aadha chabar. 3. Puniar 4;Adhichipa punriar 5.Andhipar 6.Ahawdar 7. Bazaar 8. ..Baghoar 9 Bakasur 10...Bhakoar 11.Bansriar 12...Bagalariar .13...Baghsariar 14….Beheroar 15…Bendiar 16….Birhord 17…Bilariar 18. BaghBanoar !9..Barshahoar 20 BaghmaraJagan 21...Charharoar 22 ..Chiloar 23...Chilbimoar 24….Chilbindhar 25… Chila 26…..Dumriar 27…Dungriar 28..Dukipitar punariar 29...Chamutroar 30...ChhotagaSaughoar 31..Chilaban32…Chilabanoar…..32..Gaddasur 33...Gaisar 34. Guliar 35..Ghárariar 36 Garur 37 Goriar 38 Ghara Banwar 39,Gangwar.. 40 Hemoar 41 Hansda.. 42 Hansoar 44…..Hansdagiar

44..Halhibannar 45 ..Hemramiar 46'"Hastoar 47...Hindoar 48...Hantuar 49...Juroar 50....Jhantitakoar 51 Thapa Bansriar 52...Jalbanoar 53. Jamriar 54....Juntha sanghoar 55...kachiar 56...Kerear 57...Kudiar 57,,Katiyar 60...Keshriar 61...Kencha Kensriar 62..Kabinda Katiar 63..Karoar 64 Karakata karawar 65... Kachhimar 66...Kanbindar 67...Kadmiar 68;;;Ketrar 69....kharar 70...Kaybanoar 71...Kanchira Banwar 72....Latoar 73;;;...Mangriar 74....Masa sasiar 79....Nagbangsi 80 Noa akuri 81....Nangtoar 82...Nagbansiar 83 ....Punariar 84...Raheroar ..85 Rimrimiar 86...Rajmour 87...Sanchi Katiar... 88...Singoar 89...Shiar 90...Singhroar 91...Sanghoar ..92Sonariar 93.. SAnsoor 94.....Tidoar 95..Tatyar 96.....Tuduar 97 Tetyer 98....Tiruar 99...Hembrem 100 ...Jaiswar 101...kudmi Jaduar.

Whenever these groups had been living they observed the social taboos. protecting of each Clan have distinct markings Which is made on Akhyan Jatra (1st day of Magh), On the bodies of cattle wealth. But this domestic custom has been coming down since cattle wealth are decreasing in the village level . It is interesting to note that there are many common symbols between kurmis and other adivasis of Chota Nagpur area and other places which is also a big list and is not produced here only few examples are given those are common

Like Hansda...Bansriar.....Hindoar. Tiruar. Hembrem among kurmis and santhals as well as Bhumij and Ho

INCLUSION AND EXCLUSION IN SCHEDULED TRIBES LIST

The significance of the inability of the constitution to define ST or lay down the criteria for recognition of a STs for inclusion in the scheduled tribe list has been generally ignored. The original constitution neither defined nor laid down any criteria for Specifying ST' This task was entrusted to the state, Dr. B.R Ambedkar played an important role in defining different safeguards for STs in India. the safeguards were /are————

———— the right to representation in proper proportion to their population in the union and the state assemblies, Ministries and local bodies

———— the right to representation in proportion to their population in the various public services under the Union and the state and all other local authorities and these special responsibility of the state to provide funds for higher education and for educa tion in abroad for members of these communities and to appoint a special officer to keep a watch and record over the status of the safeguards enumerated above (Saxena 1981)

Actually the safeguards became the guiding principles of the tribal upliftment in post independence India . This also attracted other non listed Scheduled Tribes for inclusion their name in the scheduled tribe list who were once declared as tribes and there are movements. among different communities in India. Indian Constitution provides for the statutory recognition of inclusion in or exclusion from the category of Scheduled Tribes. Politically it is difficult for the exclusion of a tribe from the scheduled tribes list because it hampers and breaks the vote banks .

All the other backward communities whose population is about 55 % of the total population of India are basically tribal communities in the past .
For example ——— Kurmi/kunbi, Koeri, Ahir,(Goala , Yadavs),,Bauri,, Kaibarta ....—— Were all tribals in the account of British in the 1931 census but some changes were observed after 1931 and 1935. In fact the Tribes , SC and OBC Of the present classification may be called as Adivasi—or Mulnivasi and are not part of the caste system and usually constitute affirmative societies with their own ruling system. All the systems were destroyed by the colonial power and it is a matter of sorrow that after
independence no recognised political party came forward to revive all the tribal system rather the political parties started vote banks system to get votes in any election in the present political system'

Let us discuss in short Regarding the KURMI/KUDMI communities of Chota Nagpur and MANBHUM in different Census reports——— This community of Chota Nagpur was enumerated in the list of Tribes Of the census reports that Kudmi tribes have been mentioned aboriginal community (1901 ,and 1911) Animists (1921), primitive tribes (1931) But after that change is observed in census reports in case of kurmi tribes . The Colonial rule has done lot of damage in terms of Identity and culture of indigenous groups in India as per example Kudmi/ kurmi . this community mentioned as Hindu (which is a Persian term, not found in any language dictionary of India) in Mayurbhanj .In other areas (1941) Khurmi community is one indigenous group from Central India wrongly listed during British time as Kurmi caste and in some places as aboriginal tribes .

The totemic Kurmil tribes are highly concentrated in Ranchi Hazaribagh Santhal Pargana Singhbhum of Jharkhand. Odisha (Mayurbhanj Keonjhar Sundargarh Bonai) and in West Bengal (Purulia Bankura Midnapore Bardhaman Malda Murshidabad and West Dinajpur) a well defined territory bounded by the four rivers Damodar.Kangsabati subarnarekha and Baitarini , it has been a lower part of Jharkhand, . where the totemic tribes have coexisted with other travel comedies (P.P.Mahato, 2000 ,) But in due course of time , some of the totemic Kurmi migrated to Assam (Darrrang, , sonitpur Golaghat , Lakhimpu,r Dibrugarh and Jorhat) along with other tribes to other parts of West Bengal and Orissa.

From Manbhum totemic tribes started to migrate along with other coexisted tribes as contractual labour to Assam tea Gardens in 1882, They migrated to Mayurbhanj for their existence and survival due to terrible famines of 1770— 1772, 1866, 1872- 274 (Basu 1994)

The Identity crisis of Kudmi/Kurmi as a primitive tribe and out of the scheduled tribe list remained unseen and unheard in passage of time . As the Kurmis became aware of and educated the issue became crucial enough to draw the attention of sociologist , social scientist ,, anthropologists.. media and the government in general The totemic tribes are very particular to the totems (clan).TheThe list of totems of kurmis

Are mentioned earlier pages.

In volume 5 (ii) of the Linguistic Survey of India. George grierson—— it is written that the kurmis of chotanagpur “””” are aboriginal tribes of Dravidian stock who spell their name differently . this name instead of a hard “‘ r “ .

Most of these peoples speak in a language of their own commonly known as kurmali.

Although as sir George Grierson points out that in Manbhum this language is not confined to kurmis alone but is spoken by people of other tribes also. This language is not a corrupted form of Maghi because sir George Greerson pointed out that maghi language is not the language of any locality of these areas. And it is essentially a tribal language

Thus If the people of Kurmi communities of Jharkhand West Bengal and Odisha demand through agitation to recognise their mother tongue kurmali and for intrusion in the schedule of language in the constitution of India, the central government after discussion of the respective state governments should recognise the language kurmali which is spoken by more than one crore people in those areas mentioned. Government must have a linguistic survey through the country for justifying creation of states in the past on linguistic pattern, secondly the government can easily recognise farther the language of the people.to be recognised.

In the District Gazetteer of Manbhum !(1920) Mr Coupland ——said that Kurmi Mahato are included among the Tribes Exempted from the indian Succession Act but said that they are very closely resembling in features the Dravidian Tribes.around them

******* In the case of Ganesh Mahato vs Shiv Charan Mahato which was taken to High Court (A .I.R. 1931 Patna 305) both parties were kurmis of Chota Nagpur and And they both admitted that they were aboriginal, the dispute being easy regard to the Succession Law by which they were governed .*

Dalton,s in Descriptive Bengal 1872——— in the province of Chota Nagpur ancestors of the people now called Kurmis appeared to have obtained a footing among the aboriginal tribes at a remote period (about 52 generations)and In more than one part It is interesting to note that previous census reports of India Introduced different names of Indian natives/ aboriginal tribes forgetting their actual name dignity and designation

For instances take the census report of 1872 in case of MANBHUM only,,

CENSUS OF MANBHUM — 1872

It is interesting to note that previous census reports of India Introduced different names of Indian natives/ aboriginal tribes forgetting their actual name dignity and designation

For instances latest take the census report of 1872 in case of MANBHUM only,

Census report of Manbhum of the Year 1872 clearly indicates that the natives of India as aboriginals and father aboriginal are divided into semi Hinduised aboriginals, Pastoral caste Agricultural castes Personal service castes Weaver castes, Artisan caste Boating and fishing castes dancer magician beggar and Vagabond castes.

the purpose of divisions of the aboriginals into different castes means helping Brahminical culture and their classification of people The British government understood that to administrate and rule the people particularly In Central India and Chota Nagpur areas It is necessary to divide them according to the profession in different groups. These different names are introduced in the census report which was very easy to propagate the different names among the Literate and educated people of Bengal at the time ,Also the Different divisions people into different castes are kept in records to facilitate the administrators and judges of Courts. so that They can easily understand the behaviour of Administration

of the British government. Questions are automatically arise why the census was not done on the basis of aboriginal and non aboriginals? Why was such classification considered ? The answers are simple— when British entered India in the name of the East India Company, they started the study of peoples. Their Mannar, their behaviour, their food habits, their cultures, their songs and dances, their education level, their organisation capacity and the existing difference between different groups of people. By casteism and Religion. And To keep them in records census report is the the most helpful to them

1...Aboriginal tribes——— Asur, Agaria. Benkar Rajbhar Bhumij Dhangar Kheriar Munda., Nat ,Naik, Naiya , Paharia Sardar, Santhal"———

2... Aboriginals (Semi Hinduished) —————————— Bagdi , Bauri , Bhuiya, bediya' Bhind Chandal Chamar Dom dusadh Ghasi . ghatwal , Hardri Khaora Karanga,, khairo kherwar (bhogta, Ganju , Mahat Manji munchi mal Mahli Pasi Rajwar Rajbangsi Koch

Pstorial Castes ———————— Goala Ahir , Bagal

Agricultural Castes ———— Aguri ,Anguwar Barui.Tamboli Barak , Bangsi , Koibarta.

kurmi. Koeri . Malaka . Sadgop Artisan Castes .....————— Kamar (Blacksmith), kumbhar (potter) , Kanjari (brazier), lehari (lac workers) Shankhari (cell - Cutter) swarnakar (gold Smith) sutradhar carpenter) Sunri (distiller), Teli (oil man) kulhu (ditto)

Weaver castes ——————— Jog ,i.Patua ,Kapali , Sukli , Tanti Labouring castes —————Beldar Chunar Kora Maiti Nuniya ,,,

For other instances of different census

in 1891 the census report ———Adivasi are forest tribes according to their traditional occupation of forest areas

in 1901 ——— census report them as animists
in 1911———— census more specifically changed to tribal ~~animals~~ animists.
in 1921——— they are considered as hill and forest tribes
in 1931———— Categorically Aadivasi are mentioned as Primitive Tribes
1935———————— Adivasi are reported as Backward Tribes
In 1941 ———— Adivasi are Considered just man of Tribes and only in 1950 For the purpose of special treatment in the constitution of India adivasi are categorised as scheduled tribes (ST)

But there are many communities which are deleted from table list in 1931 census. As for example Kurmi/ kudmi , of Shaktimaan varsh that is in Jharkhand West Bengal all Odisha and Chhattisgarh similar is the case of Ahir Koeri ,, Bauri , Bagal. Kherwar Manji and many others

Many communities of census 1872 have been grouped into scheduled caste (SC) and other backward classes (OBC) in the present democratic India.

it is also observed that Number of Scheduled Tribes in Bihar han is gradually decreased by manipulation in census report
In 1941 census the total number of ST in Bihar 60

In 1951 census the number is reduced to 31
In 1961 census the number is reduced to 29 (New Republic 21st March 1981)

Moreover it is remarkable that a community first is recognised as a semi Hindu vised caste on the basis of their profession . If profession Is one of the criteria of classification of people then what are the castes of politicians administrator legal practitioners doctors engineers IPS anthropologist scientist farmers and other and other professions it is difficult

to answer for anybody what are there castes at the present Indian society.There are no other ways but to to forget your caste and disputes with other citizen of India

it is observed that in the present political scenario of India the citizen of of SC ST and OBC and converted minorities trying to be polarised In one name ——MULNIVASI,,

The new term in the political system of the country may change the corrupted political system in the country. It is not an anthropological term But a political forum that Indian needs today to serve the 90% of the population of India to live in peace and progress.

KURMI./- KUNBI ———— MULNIVASI

THE TERM -- KURMI,... (1) The term kurmi was in Vogue in old babylonian civilization, the world's most ancient civilization. This is an exquisite thirst quenching drink usually drunk at festivals by both male and female. The drink used to be prepared by aboriginal people of that civilization so it was named Kurmi . [Reader Digest, May,1974] (2) ********* IN RIGVEDA.. ——— It was found that Indra is described as being a KURMI

qualifying word, [Rig veda 3. 30. 3 The word has been borrowed from the active , wealthy and prosperous community Kurmi / kuram /kunbi in those days.

(3) *** Indra was also qualified as : Tubi Kurmitama which have been : Used in 8 Mantras of RigVeda ——————— 3/30/3 ,6/22/5, 8/16/8 ,, 8/68/11 .... 8/81/3 6/22/4 ——— Tubi kurmitama Means Doer of many great deeds(H.H. Wilson Rig veda 6//22/5)

and sole Doer of great deeds (Griffiths,,,,reg 8/2/23) and Powerful in Working (Monier William: Sanskrit—English dictionary 45/2)

(4) ** In Satapatha Brahmana,,,——Kurma means Prajapati, one who maintain the people and their social relation,,There are ample proofs that kurmis/ kunbis are

agriculturists as well as fighters to save their country and people from outer enemies

(5) KURU......In Sanskrit mans 'DO :

Kurmi in Sanskrit used in the Epic Ramayana literally translates as — I can or I am able, or without power to act. In other words those who are not Kurmi are not able, incompetent or without power to act.

Examples ...—— 1..Yat na kurmi, sadresam priyam .—— (Valmiki Ramayana book 6 sarga i) —— I am not able to do a present act.......... 2....Na kurmi :tvam bhasman ......(.......Book 5 sarga 22) ——— I am not making you into Ashes

(6) In Atharva veda...—— the word Koram is a kin or derivative from the word Kurmi and in that , veda he word Korum is used derived from kurma———kooram (khanda 20, sutra127 mantra 1)

In breaking the word Kuram———— Ku....means earth and ram means tilling for production. The name Kurmi is the Sanskrit word meaning cultivation. Some authors attempt to trace its origin as the direct descendants of the people of earliest civilization that is Mohenjo Daro

and Harappa Civilization (7) —- - The term Kurmi was borne as a title by the princes vivashan and Sharyati of the sun dynasty and by Lunar King Yadu and kuntibhoja [Skanda Purana Sahyadri khanda Addhya 3 37] 'It was the designation of a son of the solar King Sumitra and the son of Gritsamad, who is considered as a writer of several hymns of the Rig Veda [vansha Bhaskar p...103]

7. These are some of the hundred Kula (Clans) Of the Kurmi kshatriya according to the Mahabharata —— 1..Brahma Vanshi ... 2- Nidar 3 Bhargava 4 .Manwaha 5. Virat Vamshi 6 Marichi Vamshi 7 Dikshi Kurmi.... 8 ..Gaharvaliya kurmi 9... Gautamiy Kurmi 10.sukalanki kurmi 11 Udawadiya kurmi 12 Maharamiya kurmi 13 Meruiha kurmi 14. Gaunaha

kurmi 15.. Bhruwar 16..Pathari kurmi 17.. Chanderi kurm 18...Lohthamba kurmi 19...Gohalauta kurmi. 20. Baghela kurmi . 21. Nikumbha kurmi 22 .Sumitra Vamsi Kurmi 23. Paila kurmi 24..Rathaur kurmi 25..Awadhiya Kurmi 26...Sacha kurmi 27...Ramavamshi kurmi 28... kushvaha kurmi 29...Ikshavaku vamshi kurmi 30.. Kashyapia Kurmi.... 31..Vishen kurmi 32...Kachvaha Kurmi 33, Rana kurmi 34 Chauhan kurmi 35 Bhojaka kurmi 36. Goraka (Raghuvamshi) kurmi ...37.. Gauda kurmi 38.. Hajari kurmi 39..Shardulia kurmi. 40..hajari Kurmi 41..Adharana Kurmi .
.... And others
Nizam's dominions by. Syed Siraj ul hassa.
Sahyadri khand Adhyaya 33. Skanda puran ;;;jaga V Moda an Kalpdruma, Prithvi Raj rayasa.
Mandala VIII, Sukta 66 Hymn12... Mandalaiii Sukta30 Hymn ——— Rig veda

The castes and tribes of H. E., H The same thing is followed in mediaeval age that the famous Chaun king Prithviraj of Delhi and his descendants Jagatsingh and Jaisingh were also distinguished as Kurmi
Jay Singh Chauhan Raja Agni conquering the whole of Northern India performed a great yogya and adopted the respective title
Agreeably to this tradition the kurmis derive their name from the word KURMA. occurring in the Rig Veda [Mandala viii, Sukta 66 Hymn 12; and Mandalaiii Sukta30 Hymn 3] In satpaths Brahman,khanda vii addya 5 kurmi meaning Lord , master. Powerful etc Vide — The castes and tribes of ofH.E.,H Nizam's Dominions by S,S.Ul HassAn Vol 1 !920 . (8) —— Late Dr John Wilson Proposed to derive the term Kurmi (Kumbi,or Kunbi) from the Sanskrit root krs ———to plough and to take Kurmi for a modification of krsmi—— ,ploughman , but a word which

however so far as does not exists in sanskrit. This etymology is wrong as per Dr.Gustav Oppert .who said —— it is preferable to explain the term Kurmi, kumbi ,, as constructions of kurumi and kurumbi; we know the term kurma for Kuruma. The interchange between r and d modifies kurumba into kudumba and most particularly a part of the agricultural population Th name Kudumban Which is identical with kudumbi and from which ...in Maratha

Contraction Interchange of r and d

Kurumi——— Kurmi — kurumba —-— Kudumba

Kurumbi — Kunbi,,,, — kudumban

Identical with Maratha Kumbin or Kunbi

This expression kudumbi is occasionally used in this sense and in the Mysore territory Maratha, Kunbis are called Kutumbis.

(9) The existence of terms like kurumbi or kudumbi accounts also for the Gujarati kulambi.

The term kudumbi however is also mentioned in the Madras census report but it must be mistaken for the Sanskrit kutumbi means. householder etc etc

Kumbi was changed into Kunbi and again this into kunubi and these forms are found in modern Maharashtra.

Kumbi ——— Kunbi ——— Kunabi /kunubi

Kurmi , Kumbi , or kunbi denote agricultural Community have originated in the same manner as vellanmai has vellala

KURMI /KUNBI COMMUNITIES IN INDIA

It is not possible to give the exact date of Kurmi. settlement in India. The word Kurmi, one of the most ancient in the world,

is a derivative of the organised system of family life of the people living near the river KURAM.

The group of people living in remote age carried with them the word kurmu/ kurma / kurmi/kunbi to be identified from others during long period of their journey to various places' the ancient tribe derive their name from the river and passed through Kuram mountain identified themselves as kurmanies, kurmis kunbis during their scattered moment and settlement in different places

The river KURUN (nowadays) is the chief river of Iran. In remote past Kurun /kurum Was known as Kuram - the upper part and Kurun ——The lower part Like The River Ganga which is also known as Mandakini and Ganga and further down as Bhagirathi

In the early stage of formation of continents due to tectonic movement and other natural causes and Calamities, the upper of part of the river KURAM lost its existence' due to sinking of the greater part of Urmi lake, the other two Mighty rivers Euphrates and Tigris lost their capacity and their original forms. In the valleys of the Euphrates., Indus and yellow rivers peasants needed the rivers to rise in order to spread the fertile topsoil washed down from the highlands and to enable their vast irrigation system to fill with water . But floods that surged too high or came at the wrong time had destroy their fields as much as a draught,

The people living near the kuram river were mainly agriculturists , in the land of Kuruvarsh which is situated on the North West side of jambudvipa/ Bharatvarsh. Hence the land KURUVARSH The people were KURMI/ KUDMI/KUNBI/ KURMANI . Those people arrived at Mohenjo Daro, Harappa, the creator and developer of Harappan civilization. The. Indus valley is the Eastern part of Kuram desh.The civilization was mainly formed by Nigrates civilised mediterrean (kurmanis /

kurmis..........) who lived harmoniously along with proto australoid, The kur emani/ kurmi people lived in Indus valley till the arrival of, Armenoids Alpines and Aryans,and others,..................Dr J. H.Hutton(1933) mentioned that 8 racial groups entered into the Indian territory in ancient times and settled permanently in India. According to Mr Hutton, Kurmis was a civilized Mediterranean and placed them as one group of Dravidian. But this is not supportable because the Dravidian left Indus valley before the arrival of Kurmani/ kurmi people

Professor Anjali Mukherjee on the importance of indology had described from 7000 BC to present age in a particular manner But she was silent on periods i) 6000 BC — 4000 BC ii) 3000 BC—to 2500 BC

Different —Periods —

Pre -Harappan -Mohenjodaro — ——— 8000 BC — 6000 BC

— — 6000 BC — 4000 BC

Harappa—Mohenjodaro ———— —— 4000 BC—— 3000 BC

On being asked by the writer (Shri Radheshyam Mahato) for a nameless period Prof Anjali Mukherjee said' She did not know the people who lived during the periods of BC 6000-— 4000 BC and 3000 BC— 2500 BC . Mr. Mahata said that during 6000 BC— 4000 BC people may be termed as Kurmani/ Kurmi arrived at Harappa Mohenjo Daro. It might have happened that a part Dravidian the left Indus valley before the arrival of the Kurmani people and there were mixing between them and they also left the civilization due to natural calamities(Particularly a draught for long period that hampers agriculture and production of food of the people) and attacks from outsiders who destroyed their civilisation . She (prof Mukharjee) could not reject the idea and said this

claim had to be supported by the past information, by the documents or by reading the evidence found in the Indus valley in the form of stone writing "FALAK "or seal mohar. Which none had been able to read.

The Pan-Indian society for people of India consists of 1)..Kurmanis/or kurmis / kunbis (historical name -Gawda Dravidian ii) Dravidians and iii) Aryans

The readers should remember that due to the lack of knowledge of kurmali/ kurmani language available in the form of KARAM GEETI,S were not available to Dr,J.H.Hutton, and he could not write The name of Kurmani or kurmi as a separate group of Race which came from Karam Valley in Southwest Asia to the Indus valley and then spread throughout India mainly as agriculturist and Kings of different kingdoms formed by them.

This very hypothesis was absent. Therefore nobody had claimed that the Indus civilization was created and developed by Dravidians. Simultaneously it is also assumed that There was no war between the Dravidian and Aryans in the known historical periods In the the same scale and magnitude compared with the war and conflict between" Kurmani/ Kurmis and the Aryans.

We should also have a close look on the words HARAPPA - MOHEN-JODARO .The meaning of the sense of the words—— ————

Harappa ————MOHENJO DARO.- == Muhan - Ghar- Duar was the Gateway city to the Indus land. Note——MUHAN Means mouth of river,,,,,,GHAR means Home ;;and DUAR ....means DOOR

Hence Mohenjo Daro stands for the city at the Sangam (confluence) of the river Indus and Arabian Sea'

For the people of Indus valley. HARAPPA = HAR —APPA means city of HAR (Shiva)

From karam geet we can find the route through which Kurmi people Came to Shaktiman Varsh from Kuru varsh via Sindhudesh (KARAM GEET is given in APPENDIX)

THE PATH———After the destruction of the great great Indus Valley Civilization. whatever may be the cause.. the tribal peoples who are there started migrating to different parts of India. The part of migration can be traced or assumed Like this 1) from Sindhu Varsh ——> Awadh Varsh ————> From here in 3 direction

1)... To Magadh and Mithila ——to Pondra (earlier name of Bengal)

Ii).. To Vindhya Varsh——————> to Jharkhand and Chhattisgarh —> Odisha and Central province

Iii).To Malwa——> to Maharashtra —— > South India

The chief and the great agricultural class of India is known by various designation appearing of different localities of various places Northern and Central India Western and South India where it means a peasant or cultivators in general They are for the most part an industrious and respectable TRIBAL origin

They are known as one of the most extensive Tribes of KUMBHI otherwise called

KUMBI, ,KUNBI KURMI , KUDMI......less ..COONBY . .KANBI ,KALMI , KOORME KUNABI KUNBEE or KOON BEE KURUMBAS. KURUBAS KUDUMBA and There is no doubt that these terms are Synonymous.General report on the Census of India 1891 first of the caste that are here Included comes that of the Kunbi or kurmi. The former designation is that of the Deccan and West Of India and the later is used in the gangetic valley .Both mean no more than Tiller of the soil and are therefore minutely subdivided,'they are found in north-west princes and Bihar but they are found too in the central and south .

They are found in the large portions of India in the present day..— In Assam, Uttar Pradesh , Bihar , west Bengal ,Jharkhand Odisha Chhattisgarh Madhya Pradesh Maharashtra . Karnataka , Goa , Tamil Nadu , Kerala , Gujarat and Rajasthan

They are scattered in considerable numbers as a well known and very industrious class of cultivators and Warriors

They own villages of their own and are also more widely spread In detached families or groups of families . As tillers of the soil the kurmis are industrious and plodding.

It is one of the best communities of India Since it is one of the most generally diffused and numerous in India and has risen to great power in some parts of India Like the great king Chhatrapati Shivaji in Maharashtra and in Scindia ito the Government of Ujjain in Madhya Pradesh In the past historical time..

Today the question is whether kurma. Kurmi /Kunbi is a tribe ? It remained unanswered

Let us find the answer from the historical past and comments of different scholars in their writings which are available in our libraries. .

1...Dr,Gustav Oppert Professor of Sanskrit and comparative philosophy Presidency College 1894. He, Connects them with the Kurumba or Kudumba.—to Kunbi —-to Kurmi..

At an early date The Peoples of Bharatvarsh was divided into two great sections which were known in antiquity

1(Kuru ——panchalas) and (Kauravas —Pandavas) and afterwards as

ii) (Guardians ——and ——— Dravidians) After that as
III ( ) Kurumbas ---—and — Malawas,
The Dravidian branch ——= Mallas,Pallas , Pallavas,Ballas, Bhilas and others are one

The Guardian division—————— kolis, kois. Khonds, kodagas koravas, Kurumbas, Kurubasand many others ————
The position they still occupy among the people of the country is the most important of all tribes. The kurumbas are all even considered as the oldest existing remnant of the earliest stratum of population,
Kurumba must be regarded as very old inhabitants of this country who can claim the priority of occupation of the Indian soil before the Dravidian.

The kurumba represents a very numerous community who are subdivided into many classes. in the various provinces of India and in the different vernaculars of this country.Distinct names are given to the several subdivisions so that the class is called differently in Sundry districts.

The term kuruba and kurumba are originally identical and signifies the mountaineer In Tamil language and all the kurumba are called kurumbar The kurumbas embraced the occupation of herdsmen to such an extent that the Tribal designation became in course of time a professional one
In Tamilnadu this community is divided into four groups 1. Anda or Andai kurumbar 2. kamwali kurumbar 3. kurumba-Idaiyar 4. Cunnambu - kurumbar '

The agricultural kurlumbus are mentioned in Nilgiris census report and highly interesting for its applied link connecting them with a respectable and influential class of people in Mysore well known as okkalingar a farmer or cultivator groups.
Dr. Buchanan calls this caste as Kunabis which is very numerous in Mysore that is in Karnataka Hence Dr, Gustav eventually identify with the Kunbis (Kurmis) or Kudumbis The agricultural class to which SHIVAJI The Great Maratha chieftain belonged who with his Kudumisor Kudumba or

Kurumbas——Kunbis Brought a change in the polistical aspect of India. The sentence in the text of Buchanan Leaves it doubtful whether referred to the Kunabis as an anthological or professional distinction' Not no all purse not even the majority of the wokkalingas of Mysore are of Kurumba origin. The earliest religious worship however appears to have been rounded stone which somehow inspired them with a belief as presenting the great Superhuman powers

The stone worship has survived among the kurumbas to the present day. A.. stone. to which worship is paid Stands often in Caves or in the middle of the circle likewise formed of stones But it is not regarded as Linga

A branch of kurumbas is said to have hounded the kingdom of Vijayanagar as its first dynasty is traced to Kurumba descent.Horace H wIlson Says that These princess were of kuruma of Kuruva family

The title of ruler Tondamandalam was Tondaman, a designation which was borne by the Raja in the Trichinopoly district as chief of the KALLAS. who are the representatives of a portion of the the martial caste Kurumbas

References — 1)Rev. W Taylor in the catalogue Raisonne,,vol- iii p 385 ii)I.C.M 755, 3 of the Makenzie

Having been able to recognise in the kurmis or kunbis or kumbis, the well-known kurumbas or kudumbas There is one famous ancient dynasty known as Kadamba which connects its founder with Kadamba treeThis tree is available in most of the states of India. Itit is believed that the people and the dynasty which we call kadambas, actually a branch of of the Kurumbas, Who had azimed is slightly modified digination their name KURUMBA into KADAMBA, and that the stories about the Kadamba tree are inventor of later times in order to explain the coincidence

The term Kadamba is actually found in Tamilnadu as a synonym and identical expression for kurumba. In 1336 the

city of Vijayanagar was founded by the prince who is said to have derived their origin from kadambas. One tradition ascribes that k ing Madhava reigned Over it by himself, leaving it to the kurma or kuruba family

Other kurumbas invaded South India in about 1600- 1600 50 and founded the Maratha Kingdom of Tanjore and that event led to him (Dr,Gustav) to speak of kurmis, Kumbis or Kunbis,

The Maratha like the magnet Bengali , Telanga,Gujarati Punjabi Rajasthani.........etc and is the titular designation of a people embracing all classes of society In Maharashtra. But within the names of the people the name borne is KUNBI, as their special designation but the large fighting and land holding community, actually any guess them agricultural operations

Maratha is not a caste or race.

According to Bhandarkar Maharashtra is the the form of Maharatta, the country of the great tribe Rattis , mentioned by King Ashoka in the copy of his rock cut edicts (B.C.245) reserved at Girnar in which the Maurya Emperor states that he sent ministers of religion to the the Rattikas or Rattis, the people of Maharashtra. the suggestion that a branch of Rattas in very early times, the took the name of Maharattas or great Rattas Is supported by the practice of the Bhoja rulers of the Konkani and West Deccan, who are styled Bhojas in Ashoka.13th edict (B.C 240)And Maha bhojas in roc - cut inscription in the Bedsa Caves in in Pune about the first century after Christ',In Telugu andCanareseDistricts the Rattas seem to be now represented by the Reddies One of the leading classes of agriculturists.

In the 7th century A. D. Chinese Traveller noted the character of Maratha people —— the inhabitants are proud,- spirited and warlike, grateful for favours and revengeful for wrongs,

self-sacrificing towards suppliants in distress and sanguinary to death only who treated them insulting

1... The antiquated Indian caste system is so far right that it assigns Kurmis,Kumbis or Kunbis as non Aryan population obviously it indicates that this population entered India in the remote past and they are first inhabitants of India.

2''' The KUNBIS are quite primitive forest dwellers some years live-in scattering his seed on purchase of land burnt in clear vegetation , collecting microbalance and other fruits and snaring And trapping animals exactly like Gonds and Baigas Of Central province.

In Nashik it is stated that a large portion of KUNBIS are derived from the primitive tribes [R. V. Russel]

3.... As per GS Ghurye an anthropologist,——— Kurmi, Kunbi, kanbi perhap signify The occupation of group namely that of cultivation it is not improbable that the term or name may be of tribal origin

4.... On the right of theSarayu the Tribe is most commonly called kunbi, Kurmi............It is one of the most generally diffused and numerous in most of the states of India

5..... The koonbee/ kunbiElement was the foundation of Maratha power.The great king Shivaji and some of his chiefs were Kunbis. ....— I think that koonbees/ kunbis must be considered one of the most important as well were tribes —— [journal of Asiatic Society volume xxxvi part 2 special edition, as one of the most useful and most easily governed TRIBES in India .If we proceed south from the Lower Doab .towards Jabalpur and Sagar territories Kurmis became more numerous and there a good number of LODHAS a tribe apparently cognate to kurmis and in parts of Malwa that is in fact throughout the southern borders of India, KURMIS are very numerous In most of this country they are the thief cultivating class In In Rajputana there is cultivating class

called PITTULS Who was supposed to be kurmis under another name. In Gujarat Kurmis form the main body of the best cultivating class. They seem to be the main owners of the land and though quiet and unpretendingHan It is notoriousThat the great king Shivaji relied principally on his Mawallees (Kunbis) of the Western Ghats who were Tribes. [Justice Campell ....Ethnology of India]

It is noticeable that Shivaji relied and believed principally on his Mawallas (kunbis) .

In 1880 an English observer wrote of Maratha peasantry Kunbi caste —— they are hard working , temperate, Hospitable , fond of their children and kind to strangers. At the same time they are cruel in revenge and seldom is scruple to cheat either government or their creditors If they are going to seek revenge the first give their enemy a a warning (Beal) [Bombay gazetteers....xviii part 1 page 288]

The Kunbis however do not lay any. pretension to Kshatriya origin But the marathas,(originally Kunbis) claim the reverse as Kshatriya which is their mistake. The divisions of kurmis are Marathi Kunbis , Konkani Kunbis , Kale Kunbis , Telhari Kunbis and Khandesh Kunbis. All are regarded as of same caste with Social Organisation and DEVAKS tends to support this view and apparently totemistic nature of the Devak system Suggest that they are very largely of TRIBAL origin DEVAK is originally totem. Following are the chief Devaks Panch pallav or five leaf 1..Wadh (Fiscus Indica) 2..Pipal 3..Jambul 4. Kabamba 5..Lotus In Pune if you ask anybody what is the difference between a Maratha and kunbis Reply would be " Kunbia Majla Maratha jhala " Meaning that when a kunbi attainsto prosperity he became Maratha....[R.E. Enthoven ;;; the The tribes and castes of Bombay 1920]

The great agricultural community of Maharashtra belongs to Nagpur Chanda Bhandara Wardha district of Central

province. In 1911 census strength was one third of the total population in Berar.

In Buldhana district in some taluks nearly half the population belongs to the Kunbi community The name has various forms in this part

1..Kulwadi —— in South Konkan 2.—kanbi In Gujarat 3.. Kulbi — in Belgaum

**** It is stated that the Kunbis entered Khandesh from Gujarat in the 10— 11th century A.D and from Khandesh they spread to Nagpur Wardha and Berer. DESHMUKH were usually the leading kunbis and the tillers are still borne in Wardha and Nagpur*

Various names of the subdivision kunbis in those areas are Manwa kunbi , Khaire kunbi ,Dhanoje kunbi ,Tirole or Tilole ,Wadhekar . Mr kitts records large number of sub caste

*** Similarly Tailanges and manuwars appear to be an offshoot Of the great Kapu community in Telangana.*

Wanjari —— Ghatole. Bawan kunbi

*** Nimar —Is a group of Gujarati kunbis who are considered to have been originally Gujjar.*

Their local subdivisions are " Leve and karwa and many of them are known as DALIA

Because they used to prepare dal (Pulse) which has a great reputation under native rule.

[R. V. Russell — the tribes and castes of Central provinces of India ,Vol iv page 16 —49

7...The Deccan kurmis are all cultivators, study and hard working.........a very quiet,Easy tempered, singularly free from crime. They are strong, hardy, enduring and muscular (but in Konkan , smaller , darker and more slightly made) the kUnbi

A woman Like their husband are strong and Hardy............ widows are generally allowed to remarry. .

[Bombay gazetteer xxiv, 70, x —121,123. Xviii pt-1 p—285, 307]

8...... Modern research has revealed that Kunbis and Marathas have the same origin; moreover Bombay High Court ruled in 2003 in Jagannath Hole,s case that to accept marathas as belonging to the Kunbi community result in nothing sort of social absurd

[Menon 2009, The Marath]

9.....Irawati Karve and anthropologist University of Pune showed how theMaratha community generated from KUNBI

10 According to Stewart gordon——— the term kunbi was applied to those who tilled the land. The dividing line between Maratha and Kunbi was obscure. The two- groups later consolidated Due to social reforms as well as political and economic development during British rule.

11...Professor Cynthia Talbot from the University of Texas quotes a saying of Maharashtra. ———— when a Kunbi Prospers he became Maratha

...12 — Professor Dhan Manjiri Sathe from University of Pune States that the differential line between Kunbi and Maratha is very thin and sometimes difficult to ascertain

13... Most recently the KUNBI origin of Maratha has been explained by professor Richard Eaton from University of Arizona,who served the Muslim rulers , prospered and over time adopted different customs like different dressing styles started identifying as marathon in the past of Muslim rulers

...14.... The Maharashtra state backward Commission of nine members headed by retired justice M.G. Gaikwad had submitted its report on on November 2018

The report in short ——— the commission is of the considered and formed opinion that the Marathas and KUnbis. are not separate communityAnd they are one and the same community

From the directorate of Archives The report said — Maratha is not a caste In itself Bar Council of Maratha speaking people. The Caste of such people is .KUNBI

In Berer among them are some groups from Northern area like Pardesi Dholawar ,jaiswar.and singrore ———These are probably all kurmis who have settled in Berer and became amalgamated with the KUNBIS [Maharashtra backward class panel; Press Trust of India Mumbai;; latest update 29 January 2019]

The largest tribe of the Maratha people is that of the Kunbis, Corresponding with the Gujarati Kulambis or cultivators Kurmi (Hindi and Bengali) Kulambi (Gujrati), and Kunbi or kunabi (Marathi) They are called Marathas by way of distinction. [Dr, John Wilson]

15.. In chhota nagpur the ancestors of the people now called kurmis appear to have obtained a footing among the aboriginal tribes at a very remote period and is more than and one part of Manbhum. Kurmis villages established all sites which we know from the groups of rude stone pillars or cenotaphs still conspicuous were once occupied by Bhumij or Mundas and in other vestiges of ruined temples appertaining to other settlements both most likely belonging to successive generations of KURMIS

The Kurmis settled in the western part of Manbhum told me (Dalton)they had been there for 52 generations' On the basis of present mathematical calculation taking into consideration that ,1 generation= 40 years .then it is probable that Kurmis entered in this area about 3rd century B, C, As the family of Panchet Raja can not trace back its origin rationale out of the

District and there is no particular reason for supposing them to be Bhumij or Munda I (Dalton) think that they are more likely to be of KURMI extraction. Colonel Dalton regards the kurmis as some of the earliest of the Aryan colonists of Bengal.

H. H. Risley comments————— The Caste bearing the same name in chhota nagpur Manbhum and orissa belong an entirely different type and these kurmis closely resemble In future with the Dravidian tribes around them. In Manbhum And north of Orissa it is difficult to distinguish a kurmi from a Bhumij or a Santhal According to one tradition santhals regard kurmis as half brethren of their own from the same father who begot kurmis on the elder and the santhals on the younger of Two Sisters '. Grierson (1906), Coupland (1911) supported the statement made by Risley and GriersonThat kurmis belong to Dravidian stock However this may be the totemism of the kurmis of West Bengal stamps them as of Dravidian descent.. Santhals and kurmis have many similar totems. According to him their Totemistic usage appeared to have been unknown to colonel Dalton and might possibly have induced him to change his opinions. Most observers in this provinces will be inclined to to believe with Mr Risley that the sign of so called aryans origin in the kurmis are not so clear as Dalton found in the case

But with a tribe so widely spread and so exposed to variant influence as the kurmi Such a divergence in physical type is only to be expected.

On the whole perhaps it is safest for the present to regard kurmis as an occupational community from which has at various times diverged a series of kindred castes such as .KOERI, KACHHIA, SAINI and others Connected with the higher form of husbandry.

[—For more information please read descriptive Ethnology of Bengal-... the tribes and castes of Bengal..]

When Kurmi and Kunbis meet they sometimes amalgamate The kurmis. settled in Maharashtra. have become kunbis and Kunbis migrated to Northern India have become kurmis;If then the kurmis mix so readily with the kunbis ,the presumption Is that they are of a similar mixed origin.

Closely allied to the kulmi caste in fact in some parts of the country almost subdivisions of it are kacchia and kunjra; the Lodha and Mali cultivators. Mali is so found up with the Kunbi in the Deccan that the ordinary term for an agriculturist is a combination of the two Kunbi-. Mali We.find names of the same comprehensive character amongst the cultivators of the south, as for instance VELLALA , for the Kunbi class and the Wakkalingar which correspond to in Mysore.

The districts of Madhya Pradesh and Chhattisgarh in which They are most numerous In Sagar, Damoh , Jabalpur , sangbad Raipur Bilaspur and Drug ,The caste has large number of subdivisions

Havelia —— The name seems to have been signified a palace or headquarters of a ruler. Usrete kurmis and may be considered as highest subcaste

**The Chandnahes of Jabalpur or chandnahus of ChhattisgarhAre another large subdivision

In Bilaspur they are Prosperous and capable cultivators. Here they are divided Into Ekbahinyas and Dobahinyas .

The Chandraha kurmis of Raipur and probably a branch of Chandanahus

The Singrore kurmis derive their name from Singrore a place near Allahabad.

Singrore was once a famous town

The Desha Khurmi are a group of Bilaspur. Desh means One's native place but in this case the name probably refers to Bundelkhand.

The Manwa In Raipur maybe so called because they grow hemp and weaves sacking from fibres

Pataria In Bilaspur who once is to take food in leaf plates There are also numerous local or territorial sub castes as the Chaurasiya or those living in a Chaurasiya state of 84 villages.

.

Gabel kurmis— A small subcaste who now prefer to drop the to name kurmi and call themselves Simply Gabel there is no doubt that they belong to the Kurmi caste'

Some group have the names of saints as — sandil , Kausil Kashyap——— and many others call as Chauhan Rathore Panwar and Solanki

Other names are related with name of villages ——— Khairagarhi from Khairagarh .,

Pandariha from Bandariya ,, Bhandaria and Harkotia From harkoti

A large number of Totemistic group Named after plants animals or natural objects such aa Sandaphal a fruit .kathali from Kath or Catechu , Dhoria from Dhor . Sarang from peacock., Samudha From ocean, Sindia from Palm tree

THE GREAT KING -SHIVAJI
THE TRIBAL KUNBI /KURMI— KING

The Bhonsle (or Bhosale ,Bhosale, Bhosle) Are a prominent group within the Maharashtra clan system . Traditionally agriculture cum warrior clan. Some members served as the ruler of several parts/ States, the most prominent being the king Shivaji ", The founder of Maratha empire. His Successors ruled as Chhasatrapati Maharaj from their capital Satara

**...The Bhonsle originated among the population of deccan tiller Plainsman who were known by the name Kanbi or KUnbi . [Susan Bayly]

TheBirthplace of Shivaji was Shivneri Durg on 19th February 1630 in Pune most interesting thing is that in and around this forte there are many Buddhist Caves and there are also Buddhist Caves in surrounding Hills of Pune

Bhonsle is related to the Kurmi community of Maharashtra also called Kunbi.

There are no contemporary records of Shivaji's exact birthdate and boyhood. The birth dates of Shivaji given by various records but Friday 19 February 1630 is accepted by the the state government Shivaji life tenure is 19.2..1630 —— 3 .4. 1680 (Brindaban Singh posted in facebook on 3rd April 2020,)

Shivaji drew his military strength mainly from Mawallas meaning Kunbis of Mawal region .In the north particularly in the 18th century the term Maratha was used with reference to all people of Maharashtra irrespective of their caste distinction.

Shivaji was the first to appreciate the potentialities of Mawalas (kunbi) among whom he had spent his childhood. most of the Mavalse/ Mawalas serving in the Army of Maratha empire under Shivaji who came from this community .

According to Sabhasad contemporary Chronicles, Shivaji infantry contained 100000 men —— —— Mawals and Hashsans. The Mavale infantry was the backbone of his power.

The inhabitants of Maval region Along the Eastern side of the Sahyadri Range of ghats present Pune district have historically been called the Mawalas or Mavales.

During Shivaji's time the term was exclusively used for the people of the Kunbi community of the region. They were expert foot men and excellent in Mountain warfare. They came to prominence in the 17th century under the founder of the Swaraj by the great triball king Shivaji .Shivaji was a Kurmi

and the Raja of Gwalior. And the ex Raja of satara are said to be of the same race The historian Karniji's lines.Are given below to support the facts;;— Sindhiya of Gwalior The ex, Raja of Satara and the ex Bhosle of Nagpur were kurmisor of the class as a kin to them. Mr Campbell Has pointed out that Kurmi element was the foundation of the Maharashtra power and that Shivaji and many of his chiefs were kurmis.

Sahu IV (Also known Rajarshi Sahu 26th june 1874— 6th May 1922) was the first Maharaja of the Indian princely state of Kolhapur between 1884- and 1922. He was also known as Rajarshi Shahuji Chhatrapati and Chatrapati sahuji Maharaj. His father also defended the Deccan religion against the Mughals. His mother jijabai was the daughter of Lakhuji Rao Jadhav of Sindkhed .In the company of his Maval Comrades a young Shivaji wandered over the hills and forests of the Sahyadri range, hardening himself and acquiring first hand knowledge of the land. By 1639 he commanded the hardy and Loyal band of officers and soldiers.

****The claim that Shivaji and his and his ancestors as well as descenders were Rajput is incorrect and only made for political reasons ——— By Jadunath Sarkar*

4

AHIRS,, KURMIS AND KOYARIS—— ARE ALL TRIBES
From Linguistic Perspective

It is thanks to the novel historical perspective of Dr Rajendra Prasad Singh that it has been proved that Ahirs, Kurmis and Koeris are the original inhabitants of India. Dr Singh pointed out that the sound "bh' is not found in any language spoken outside North India, so how could Abhirs come from outside? The word ``Ahir" has its root in a word found in Austro-. Asiatic language. "" Ho""Is a language spoken in JharkhandAnd belongs to the proto australoid group of language.. In this language "'ayer (Aheer) means

shepherding the animals. This Ayer ""and its variant ahir,, are rooted in a proto australoid group of language.

Similarly and old folk language "Kurmali;; Spoken in Jharkhand West Bengal and in Odisha by kurmis (Kudmi) in Association with other caste people. The people belong to Dravidian Kurmi and they are of tribal origin... The speakers of Kuramvari are of Dravidian origin and Tribals...*

KOYARI Is also related to one of the Dravidian languages. In Telugu Koya means raw fruits.. Planting a fruit sapling,. those who cultivate Kaya"' (a raw fruit) are called KOYARI. Thus Like Khurmi, Koyari Is also a Dravidian word.. it can be concluded that the Kurmi Koyari and Ahirs Castes are of tribal origin.

One can recall folk song of the tribes inhabiting the Vindhyan Mountain Hill range,Depicting a woman of the Ahir caste. in Kaimur foot Hills, part of the vindhyas that are inhabited by Orang ,, Kharwars, Cheros, and Ahirs too.

Dr Singh pointed out that the hero of the Ahir caste ".... Krishna Is an ancient God. So why should he speak A classical language like Sanskri?

It is Corroborated by the fact that Shourseni and not Sanskrit is the language of Mathura.

Sanskrit is a language of the foreigners and Vedic civilization too .This is the reason why foreign rulers like shaka and Iranis were the first to get the inscription written in this language .

As a linguist Dr Rajendra Prasad Singh does not believe that Sanskrit was oriented before the birth of Jesus Christ.He considers Prakrit as older than Sanskrit while general perception is that Sanskrit is the oldest language and mother of many languages.

If Sanskrit is the oldest language of the country , its villages should have been named in that language.

In the works of Kalidasa the male characters speak Sanskrit while the female use Prakriti. This contradiction proves that Sanskrit is not the oldest language of the land

He emphasized the fact no Sanskrit inscription dating to the era before Christ has been found in India' It cannot be said that The art of writing was unknown at the time in the country'. The first Sanskrit inscription is of RUDRADAMAN . The inscription of Sanskrit began appearing only after the Junagarh inscription of 150 A.D

From the archaeological view also prakrit is the older language, Sanskrit came later.

Dr Singh says that language has a geographical spread'—— Sindhi is spoken in Sindh,— Punjabi in Punjab, - Similarly Haryani , Bengali , Gujarati Marathi have their own areas Particularly in Northern India.Butt why there is no geographical area where Sanskrit is spoken as their state language from village level to the urban areas as well as city areas ?

Adivasis have been living in the country from time immemorial and wherever they lived give the name of the place according to their language. The foreign invaders did change some of these names but the name of most of the villages especially in North India remained unchanged. This prove that Aadivasi once lived in the sites And established their villages in the name of the languages which were the oldest in the country

. According to him Buddhism is not the name of a religion but that of a civilization.The Buddhist culture is deformed and the history of the original inhabitants is patchy .Buddhist stream is older than any other system. The Indus Valley Civilization of the adivasis in the present language was also a Buddhist civilization

KUNBI/ KURMI ——— NAME OF VARIOUS SUBDIVISIONS / GROUPS WITH DIFFERENT SURNAMES/ TITLES /

Dr B. R.. Ambedkar While analysing the linguistic states in appendix 1 provided us statistics of chief caste in India. According to him Kunbi, Kanbi. Kurmi, Kshatriya , Kapu, ,Kapewar, Reddi , Vokalinga, Vella, Chowdhury, singh Mahato Katiar gangwar Kulambi Patel in 1931 census Census are one of the largest population and found in most provinces '

In 2006 The Government of India announced that Kurmi is considered synonymous with the Kunbi and Yellam Communities. in Maharashtra .All Patidar are descendants of kurmis/ Patels.

In India there are various subdivisions and surnames used by Kurmis/ Kunbis in families in different states of the present social system of India . These Groups / Subdivision of Kurmis / Kunbis are given below.——————————————

In Bihar —— The Maghi forming one half of the whole — Ghamela, Awadhiya , Samaswar, and Jaiswar. Kochesa, Gometa, and Chandani (Buchanan)

In Uttar Pradesh — TheSub Subdivisions of this community are Numerous. . In Benaras ——Athariya Ghorcharha , Jaiswar , Gujrati , Patarghicha Pateriya In Mirzapur ——Mahtans ,,Manwar Chanace, sandhauwa ' Sir H. Eliot has given additional information concerning this community. He speaks of Jhunaiya clan to the west of the Jamuna and of other divisions of The Tribe; as the Singraur and chhapariya of the lower DOAB;; The sainthwar , patanwar Atharya, and Akharwar Goyit. Bahmaniya . Jaruhar of Gorakhpur In Rohilkhand —Rawat, Jadon Bharti ,. Katiar ,Gangwar ., In Farrukhabad ——Kanaujia.sachan . Bota In Kanpur. —— Katwar . Umran . Bhandari In Kheri — kachhwar , Haridwar Manwa. ,Kori .. In Oudh...—Jaiswar trace their origin to Kannauj from where they were driven 500

years back. In Azamgarh ——Bhilwara DholpOra Sankata , Mal, In Maharashtra ——————— Kunbi , Kunubi , Kanabi .Jhare kunbis. Manwa Kunbis.of Nagpur from Manas a primitive tribe They do not employ Brahmans'

In West Bengal —— there are 3 groups of Kurmis i) Tribal Kurmis ii)Kshatriya kurmis who wear sacred thread like Brahmans iii)General kurmis(OBC)

In the 21st century the movement by all groups of Kumis for inclusion in the Schedule Tribe list indicates that they are all tribes and waiting for the moment and time and date when their ambition will be fulfilled. Bhosle Bhonsale . Chavan ,

, Charan , chandra, Chowdhury, chandrakar,Chandrabangsi , Deshmukh. Dhanuk Gangwar, Gawande Gowda Jichkar , jaiswar . ,kumar .Katiya kapu ,Kamma ,Kanaujia , .Kaliyar ,

,Mahato ,Mohanta Mehta ,Mahata Mene , Naidu, Pawar. Patel , Patil, Patidar Patanwar , Rau , Rathore Reddy , rajwade , Singh. Sinha ',Scindia ,sachan .Shinde

Verma , Yellan , Oakklingar , ,and there are many more.

MEDIEVAL HISTORY

(posted 16th June 2011 by Ajneesh Katiyar)

1...According to Todd, Raja Nainpal Obtained possession of Kannauj in 470 CE And his descendants were called Kamdhuj . His son Was Padartha kamdhuj. and his son was Punja Kamdhuj. Punj had 13 sons bearing the patronymic Kamdhuj. These were...—

1... Dharma Bambo — his- descendants styled Dhanesra Kamdhuj

..2..Bhanuda who fought the Afghan. at Kangra founded Abhaipur Hencethe Abhai
pura kam dhauj

3..Veera Chandra who married the daughter of Hamira Chauhan of Anhilpur Patan He had 14 sons who emigrated to the Deccan his descendants called Kapolia kamdhuj

4.Amrabijai read the daughter of the paramara prince of Koragarh (Fatehpur district) on the Ganges slew 1600 paramars and took the position of Kora whence kamdhuj

5..Sujan Vinod his descendants Jharkhera kamdhuj

6.. Padma who conquered Orissa and also Bogilana (baglan of Nashik district) In Maharashtra from Raja Tejman yadu

7.. Aihar Who took Bengal from the Yadus

8..Ugra Prabhu who made a pilgrimage to the shrine of Hinglaj

Like there are Chandela,Muktaman , Bharat. Alankar and Chand kamdhuj

Genealogy of kamdhuj Gahadavala kings of kannauj—————

Rao Dharma Bambo. The Sovereign of kanauj had a son Ajai Chand.

For 21 generations they bore the title Rao, afterwards that off Raja from Uday Chand
to Jai Chand who became the Naik of kanauj

Chand kingdom ———— Chand Kingdom was established by Som chand Who came here from Kannauj near AllahabadSome time in the 10th century and displaced the The Katyuri King Who had been ruling the area from the 7th centuryAD. He continued to call his state as KURMACHAL And established its capital in Champawat in Kali kumaon called so due to its vicinity two river Kali and Many temples built in the former capital city during the eleventh and twelfth century. exist today This include Baleshwar and Nagnath temples.

In 1563—— the Chand Kings took control of the region by overpowering small local chiefs and also the descendants of Katyuri kings.

Later their capital was shifted to Almora by Raja Kalyan Chand in 1563
1581 Rudra Chand (1565— 1597) son of Raja Kalyan Chand Was a contemporary of Akbar and even paid him a visit in Lahore in 1587 as a mark of his obeisance. Akbarnama is mentioned as one of the great landlords of India and further talks about his initial hesitation approaching the court of Akbar.
After the death of Rudra Chand in 1597 Lakshmi Chand continued attacks of Garhwal For many years though he too was repulsed He also constructed the Bagnath Temple in 1602. It is written in akbarnama that the Sarkar of Kumaon had 21 mahals.

Schindhya ——The Shinde dynasty was founded by Ranoji Shinde who was the son of jankoji Rao the Patil of Kanherkhed a Village a in Satara District. The Scindia family Ruled Gwalior until India's Independence When the Maharaja Jivajirao Sindhiya accepted India.
Gwalior was merged with a number of other princely States to become the new Indian George jivajirao served as the states rajpramukh or appointed Governor form 28 May 1948 to 31st October 1956 when Madhya Bharat was marched into Madhya Pradesh In 1962 Rajmata vijayaraje Sandhya the widow of Maharaja sayajirao was elected Loksabha And that was the beginning of the family And that is continued till date

GAIKWARDS HISTORY

It Gaikwad rule of Baroda Began when the Maratha general Pilajirao rao Gaekwad conquered the city from the Mughal Empire In 1721 . The Gaikward was granted the city By the peshwas In 1761 the Gaikward along with several powerful Clans established themselves as Virtually independent rulers of the further regions of the Empire While recognising the

nominal authority of the Peswas and suzerainty Of the the Bhosale Maharaja of Satara

Kamma origin ———————

Origin of KAMMAS is speculated as follows— Kurmis- from Ganga plains migrated to Krishna delta in large numbers to escape the persecution of Pushyamitra sunga(184 BC). Buddhism was already flourishing in Dharanikota ,Bhattiprolu Chandavolu etc, in this fertile area .Historians summarised that the word Kurmi/ kurma became kamma In later years. First records of the word Kammakaratham Appeared in the Jaggayyapeta Inscription of Ikshvaku king Matahari Putra purusha dutta rd (3rd A.D.). The Kammarashtram extended from Krishna river to kandukur.

The next record was that of Pallava king Kumar Vishnu II followed by that of eastern chalukya king Mangi Yuvaraja (627 -696 A.D).The Subsequent inscriptions of Telugu Chodas and Kakatiyas mentioned Kam manadu (e.g.Konidena inscription of Tribhuvana Malla —1146 A.D.) This region is also known as Pallavanadu/ Palnadu due to Pallava rule

FAMOUS KURMI / KUNBI PEOPLE

Saint Tukaram—17th Century poet and a petty grain Merchant and farmer born in Maharashtra region .

Rashtrasant Tukdoji Maharaj Author of gramgita, Dr.Rajendra Prasad bestowed him the title of Rashtra Sant. He has composed 3000 bhajans and was a great musician. The Indian department of post honoured the memory of this great Saint, patriot, musician and social worker in 1995 by issuing a special postage stamp

Sardar Vallabhbhai Patel——First Deputy Prime Minister and home minister of India' H.e is famous as Iron Man of India.

After the independence of India in 1947 he got selected for the first Prime Minister (PM) of India. Actually Pt.Nehru wanted to be the first prime minister of India but he was defeated by Sardar Patel. then M . Gandhi interfere In this matter and he was against Sardar Patel. due to the bad politics of M Gandhi and Nehru. Sardar Patel left the post .

Smt.Pratibha Patil. (First woman president of India. first woman governor of Rajasthan) She holds a MA in Arts and law degree. Besides her Political career she also managed her Educational Institute for the poor and industries.

Raja Jai Lal Singh——— one of the martyrs of the war of 1857 In whose memory a park is built opposite the DM residence in Lucknow

Babu Guptanath Singh —— Member of constituent assembly of India. Freedom fighter Editor and writer of Shivaji. Founder of Sardar Vallabh Bhai Patel College (31st October 1957)

Chaudhari Narendra Singh Famous Kisan leader from north India(Kanpur). He was three times Rajya Sabha MP one time MLC and cabinet minister in UP Government

Dr.Prabhu Narayan Singh Retired professor of Business Administration and business management from University of South California

Prof Dr Hukum Singh Rathor dean of science college BHU and head of Geophysics Department BHU

Dr,V.P,Singh ,M.D.. — Retired as director All India Institute of Medical Science

Dr, Kamta Prasad, Agronomist Principal scientist with ICAR New Delhi Worked on all front to improve upon the education level in kurmis of Central and western Uttar Pradesh

Dr CD Deshmukh first governor of RBI and chairman of UGC' finance minister of of India president of of the Indian statistical Institute Chairman of the Indian Institute of public administration New Delhi He was a student of University of Bombay in 1912 and University of Cambridge

S.B Chavan — Former Union Home minister and union Finance Minister of India. born on 14 July 1920.

Dr.Shrikant jichkar. MP, member of Rajya Sabha . Cabinet minister of Maharashtra. Holds 2o post Graduate.degrees . He has obtained 28 gold medals degrees He was also IPS officer and IAS officer he was the youngest MLA in India at 25 years he also leading Indian delegations on several forms including the UNO and UNESCO .Founder of India's first Sanskrit University. managing editor of Nagpur Times and Nagpur Patrika. founding Chairman of National Institute of amateo radio. (Guinness and Lima book of Records list him politicians with most qualifications and awarded Dixit title)

Jaswantrao Chavan —Ex chief minister of Maharashtra. Union Defence Minister during India - China war, Finance Minister of India

Sandeep Patil—— cricket player Holds the record of six boundaries in a cricket over

Lalita Pawar, Usha Chavan, Smita Patil..... ——— Bollywood actresses

Ashok Desai former Attorney General of India, writer of many books on law. former Chief Justice of Uttar Pradesh. awarded Padma Bhushan by government of India

Barrister SKS.K,Wankhede — former BCCI President and state minister

Dr. Atul Gawande — Harvard and doctor who is also a columnist in USA.

Shri Sharad Pawar, Union Minister of agriculture and former Chief Minister of Maharashtra Mumbai Cricket Association president and BCCI President. A native of Baramati

Beni Prasad Verma — founder of Samajwadi Kranti dal Nitish Kumar—— Chief Minister of Bihar

Vinay Katiyar famous BJP leader founder of Bajrang Dal

Other Politicians are Dr, RK kusmaria MP from Khajuraho, Ganesh Singh leader at Satna Indrajeet Patel former cabinet

minister Gangaram Patel. cabinet minister of government of Madhya Pradesh' Late chandulal Chandrakar leader from Chhattisgarh Ajay Chandrakar ex minister of Chhattisgarh Pratima Chandrakar MLA from Chhattisgarh. Keshubhai Patel Ex Chief Minister of Gujarat,

(KARAM GEETS)Appendix

1) KANRE KARAM GASHAIN ANLEY NEATI
KARAM NADIR DHARE
2) KANRE KARIE KHETI TAHRI BENAAL KHETI
SECHILA KURUMEK PANI
3.. BHIN_SAR _MAN HELEK ,DALA LEH BAHARAYN
CHALA SABHE KURUM_PAHARIYN
4,,,KURUM RAHARE KETI BONNE PHUR
KAN PHUR TARAB DALA BHATTI _RE_ GOSHAIN
5..BARISHE UTTAHAL_JAK PANCH NADIR MUHAIN_GA
DHEKHI MOR HIA JE DUKH _DUKAY GA
6..KEY.SE ALEE BHE_IYA SINDH PARE GA
DEKHI MAR GATT< DUR _DURAY_ GA
7..MAI TAR RAKHALAHI NAYA TONKA_DAK_YA
TAR BINU BAHIN KANDAY HARAPPAN BAKHLIYA
TAMANE DEYAT MAYIN PACHA GAMHA_YA
HARAPPAN _ATE PIYAS METAYAM BIPASHAYN
8...TAHI _JE JABE BETA BAHINI SHASHUR GHAR
KUL-HIK MURAYE BHARLE -JE YAMUNA.
AKKE -E- JHITUM MAI-GA DUYE JHITE MITAM
TEENE JHITE MAI-GA SUKHABA -YAMUNA
9..SETHE HETE GILA GAHAM SHANPA
CHARU CHARU,SHANPA UJJAINI GHATA
10 NADIK DHARE BAJNA BAJE -GA
KAISE JAM MAI DADAKERI BIHAI -GA
HEKLENEDA BIHA BESAKHUBE DALIYA

DAR BHANGI,TARB FUR SUBARNAKAR GHATE -GA
..11...KIYA BIN CHUTEY SHIRI BINDABAN AAKHARA
KAN DAHE PHEN-KAI MAHARAJ
SANGEEN BINA CHUTEY SHIRI BINDAN AAKHARA
KALI DAHE PEN-KAI MAHARAJ
.12... AAJ RE KARAM GASAIN GHARE DUARE
,,KAL RE KARAM GASAIN KASAI NADIL PARE

All These give evidence of the Jamuna river, subarnarekha river Kasai river along with the places like Dain , Kashi, Brindavan on the route. all the places named were inhabited by

The Kurmani/Kurmi People before arriving to Shaktiman Varsh

The Karam festival is one of most Famous festival of kurmis and other tribes in Jharkhand West Bengal, Assam , Odisha and Chhattisgarh ,

FolK If the fox songs and dances of Maharashtra Goa, Gujarat and South India are analysed, similar types of indications will be available.

Language of different Tribals also Prove some relations among themselves . .

BIBLIOGRAPHY——————REFERENCES

1....on the original inhabitants of Bharatvarsha or India — By Dr. Gustav Oppert professor of sanskrit and comparative philosophy. Presidency College madras , Telugu translator to government 1894 , page numbers 215 to 217,.220 to 263.

2.....The caste and tribes of H.E .H. Nizams Dominance........ By Syed Siraj ul Hassan One of the judges of the Nizam'"s Highcourt of judicature Lately. Director of public instruction ... 1920

3.... The tribes and castes of Central provinceOf India,,,,,,By...R.V.Russell. 1916 Vol iv page number 16 —49 heading kunbi page no.. 55 Heading ...Kurmi

4...... Journal of the Asiatic Society (supplementary number) of Bengal vol xxxv part ii1 1866

5.... Ethnology of India —— By justice comphell Heading... Koonbees or Koormis page number 92 to 95

6.. The tribes and castes of Bombay ...... BY R. E. Beethoven 1920 Vol 1 p x, xvii xviii vol 2 page 281 to315 .Vol 3 page 9, 18.

7.. SHiVAJI and HIS TiMES ..——by Jadunath Sarkar . Second Edition 1920

..8.. original Tribes of Bombay Presidency By Rev . John Wilson 1876

9...Caste and race in India By.. Dr. . G .S Ghurye. chapter 2 page number 5. 6 to 32

10... the tribes and castes of North Western provinces and Oudh,,, volume 3 By... w crook Bengal civil service 1896

11,,,Race and culture of India By Dr. D.N Majumdar

12..The Hindu tribes and castes By Rev, M; A, Sherring chapter X agricultural coste

13... first Anglo Maratha war 1774— 1783, a military study e off major battle By M.R.Kantak

14 ...Glossary of judicial and revenue terms and useful words occurring in official documents of British India By H.H,Wilson pa ge no.302 to 306

15...Race cast and tribe in Central India— the early origin of Indian anthropometry
By... crispin Bates Edinburg papers in South Asian Studies 3rd November 1995

16.,, Ethnography..Castes and tribes By...Athelstane Baines 1912 reprinted in 1976 page number 3 ,11, 12,,

17... This state and Society in mediaeval India By Kulkarni A,R , Grewal J.S Chattopadhyay D,P

. 18.. On the Columbus in the hill range of Southern India By..Dr,Shortt part 1 page 47 to 53

19.... account of the primitive tribes and monuments of the Nilgiris 46 to 48 By..Mr Wilkinson Breeks

20 ,,,Journey from Madras through the countries of Mysore , Canara . and Malabar By Dr. Francis buchanan..vol 1...pp 274— 276 312 379— 981 vol 2 pp 435— 436

21...History antiquities topography and statistics of Eastern India vol 1pp 166 283

By Dr.Buchanan

22 Descriptive ethnology of Bengal ..By E.T.Dalton, Calcutta 1872, 5 page 317 agricultural tribes Kurmis

23...Tribes and castes of Bengal,,,By H.H.Risley 1892 volume 1 page no xlvi

24.... tribes and tribal; origin use and future of the concept By J.Gregory

25... Tribal movements in India article shared by Mamta Agrawal

26... All India Kurmi Kshatriya Mahasabha (AIKKM) By Ashwani Kumar 2008

The aboriginal tribes of India and Pakistan

27.....The aboriginal tribes of India and Pakistan. Bhil and Kohli By Professor H. B. I. Mustafa Shah page no. 17 to 19

...28.... Kudmi of Chhotanagpur By Khudiram Mahato

..29..India's silent revolution the rise of lower caste in North India by Christophe Jaffrelot

30,,,, Craft society E and politics in India from the 18th century to the modern age bye by Bayly Susan 2001

31...Mighty kurmis of Bihar......By ..... Akshaya Mukul, Times of India 12th March 2004.

32,,Maratha, Kunbis , not separate castes By Maharashtra backward class panel (PT I Bombay updated 29 January 2019)

...33 Remapping of India's new states and their political origin By Louise Tilin..

34 ..Mysore and Coorg Vol — iii page — 98..By Lewis Rice and Language of the Bombay Presidency in the indian Antiquity vol iii By Dr. John Wilson.

Reference

1...Constitution of India..

ভাষা

কুড়মালি সর্বনাম পদ পরিক্রমা
(An Overwhelming Discussion On The Kudmali Pronouns)

প্রফে. অনাদিনাথ মাহাত 'কইড়অআর'

প্রথম পরিচ্ছেদ:

প্রসঙ্গক্রম (মুঁ-বাঁধান):

মূলতঃ কুড়মি জনগোষ্ঠীটির মাতৃভাষা রূপে উদ্ভুত তাঁদের গোষ্ঠী নামবাচক কুড়মালি ভাষাটি হল দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত একটি অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ, বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র ভাষা। এই দিক দিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক নিরীখে নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, এই ভাষাটির গোষ্ঠীবাচক নামকরণটিই যে হল ভাষাটির স্বাতন্ত্র্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ সে কথাটির ব্যাখ্যা করার আর কোন প্রশ্নই নেই। কথাটি হল 'স্বতঃসিদ্ধ' (Self-established) এবং 'স্বতঃব্যাখ্যত' (Self-expalined)।

প্রসঙ্গতঃ আরও বলতে পারি যে, কুড়মালি ভাষার মধ্যে প্রচলিত সর্বনাম পদগুলির মধ্যে বিশেষ করে পুরুষবাচক সর্বনাম পদের উত্তম পুরুষের একবচনের 'মঁ' (= 'আমি'), মধ্যম পুরুষের একবচনের 'তঁ' (= 'তুমি'/'আপনি') এবং প্রথম পুরুষের একবচনের 'অঁ' (= 'ও'/ 'সে'/'তিনি/)-এই তিনটি সর্বনাম পদও হল কুড়মালি ভাষাটির স্বাতন্ত্র্যের ও প্রাগৈতিহাসিককালে উদ্ভবের নীরব সাক্ষী (Silent-witness)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কুড়মালি ভাষাটির উদ্ভবের সঙ্গে কুড়মালি ভাষার উল্লিখিত সর্বনাম পদ- যথাক্রমে 'মঁ' 'তঁ' এবং 'অঁ'-এর যে ওতপ্রোত (Insperable) নাড়ীর সম্বন্ধ (Arterial Relation) রয়েছে সেকথাও বলতে কোন বাধা নেই। এই দিক দিয়ে 'নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞান', 'ভাষাবিজ্ঞান' 'প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞান' প্রভৃতি তথ্যাদির আধারে বলতে

পারা যায় যে, কুড়মালি ভাষাটির উদ্ভবের পূর্ববর্তী কালে পুরানো প্রস্তর যুগের আদি মানবদের মধ্যে কোন ভাষাই ছিল না। তারা কথাবার্তাও বলতে পারত না। কারণ তাদের মস্তিষ্কের মধ্যে তখনও পর্যন্ত মনের বিকাশ না ঘটার ফলে তারা কোনকিছু চিন্তাও করতে পারত না। আর এই অবস্থায় সেকালের আদি মানবেরা (Homo-Sapiens) বন্য পশুর মতই একা-একা জীবনযাপন করত। আর তখন বিশেযতঃ মাংসাশী হিংস্র পশুদের মুখরোচক ও উপাদেয় খাদ্য ছিল ঐসব আদি মানব। কারণ একা একা তারা ছিল একান্তভাবে দুর্বল। কিন্তু সে যাই হোক এই বিপর্যয়মূলক অবস্থাতেও তারা দিনের পর দিন লক্ষ্য করত (Frequently Observed) যে বনের নিরীহ পশু-পাখি, হরিণ-বানর, ছাগল-ভেড়া, গরু-মহিষ এমনকি কাক-শালিক, টিয়া-চড়াই প্রভৃতিও দল বেঁধে জীবনযাপন করছে। পশুপাখিরাও দল বেঁধে থাকে বলেই বিপদ আপদ থেকে তারা সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারা আত্মরক্ষাও করতে পারে। এইসব পশুপাখীদের মধ্যে কোন একটি জীব যখনই কোনরূপ বিপদের আভাস পেত তখন সঙ্গে সঙ্গে সেই জীবটি বিপদ সূচক বিশেষ ধরণের 'ধ্বনি' বা 'শব্দ' (Sound) মুখ দিয়ে সৃষ্টি করে অন্যান্য সঙ্গী-সাথীদের সাবধান করে দিত। ফলে এইভাবে তারা বিপদ থেকেও বেঁচে যেত। আর এইসব ঘটনা দিনের পর দিন দেখতে দেখতে আদি মানবদের মস্তিষ্কের মধ্যেও ধীরে ধীরে মনের বিকাশ ঘটতে থাকে এবং তারাও দল গঠন করে জীবন-যাপনের কথা ভাবতে শুরু করে। আর এইভাবে আদি মানবদের (Homo-Sapiens) মনহীন মস্তিষ্কে 'মন' এর বিকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তারা ভালোমন্দ চিন্তা-ভাবনা করতে সক্ষম হয়ে উঠার ফলে তারাও আদি মানবের স্তর অতিক্রম করে 'চিন্তাশীল মানব'-এর স্তরে (Coenojoic Man) পৌঁছে যায়। অর্থাৎ, 'মন'-ই হল 'মানব' জাতিটির সত্যিকার পরিচায়ক। পুরানো প্রস্তর যুগে আমাদের পূর্বপুরুষদের 'মন' ছিল না বলেই তারা ছিল মাত্র পশু পর্যায়ভুক্ত (Simply animal)। কিন্তু কালক্রমে দলবদ্ধ পশু-পাখিদের সামুহিক জীবনযাপনের প্রক্রিয়া দৈনন্দিন দেখতে দেখতে আদি মানবদের মস্তিষ্কের মধ্যে ধীরে ধীরে মনের বিকাশ ঘটতে শুরু হয়। আর এইভাবে মনশূন্য আদি মানবেরা যখন দল বাঁধার কথা ভাবতে শুরু করল তখন তারা জীব বিজ্ঞানের ভাষায় 'সিনো জো-ইক ম্যান' অর্থাৎ 'মননশীল মানব' হয়ে পড়ল এবং এইখান থেকেই নবপ্রস্তর যুগেরও সূত্রপাত হল। পরিশেষে বানর-হরিণ-কাক-শালিক প্রভৃতি পশুপাখীদের দলবদ্ধভাবে বিপদ-আপদ থেকে আত্মরক্ষা করে জীবনযাপনের প্রক্রিয়াটি দেখতে দেখতে মননশীল মানবদের

মনে দল গঠনের ইচ্ছাশক্তি (Will power) ধীরে ধীরে প্রবল হতে লাগল। তারা লক্ষ্য করে যে, আসন্ন বিপদের আভাস পাওয়া মাত্রই এইসব পশুপাখীরা বিপদের ভাবদ্যোতক 'ধ্বনি' বা 'শব্দ' (Sounds) মুখ দিয়ে বের করে সঙ্গী সাথীদের সাবধান করে দেয়, ফলে সবাই বিপদ এড়িয়ে যায়। এমনকি বিপদগ্রস্ত সঙ্গীসাথীকেও সাহায্য করার জন্য তারা দলবেঁধে থাকে। আর তারই ফলে পরিশেষে দল গঠনের তাগিদেই ভাষারও উদ্ভব ঘটে। কারণ দল গঠনের জন্যই তারা পারস্পরিক মনোভাবের আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে এক এক ধরনের মনোভাবের জন্য এক-এক ধরনের যে সব 'ধ্বনি' বা 'শব্দ' (Sound) মুখ দিয়ে উচ্চারণ করত সেই সব ধ্বনিগুলির ভাবানুসারী যথাযথ সমাবেশের দ্বারাই ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। প্রসঙ্গতঃ যথার্থই মন্তব্য করা হয়েছে—

"All human languages are made up to sounds arranged in such a way that they communicate meaning or express feelings or attitude, the sounds come first. Infact when writing had not been invented, the sounds of languages existed."
(Tariq Rahaman : A General Introduction to Linguistics: Re-print-2013, Page-8)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভাষাবিজ্ঞানে একমাত্র মানুষের মুখোচ্চারিত ধ্বনিকেই ভাষার উপাদান রূপে স্বীকার করা হয়েছে। আর তাই পশু পাখীর ধ্বনিকে ভাষা বলা যায় না। তাই গাই যখন 'হাম্‌বাআ' ধ্বনি করে তখন বাছুর ছুটে এলেও কিংবা মুরগী 'কুট্‌কুট্‌' ধ্বনি করলেই মুরগীর বাচ্চাগুলি ছুটে এলেও এগুলির কোন অর্থ থাকে না বলে এই জাতীয় ধ্বনিকে ভাষা বলা হয় না। অনুরূপভাবে শিশুর 'ওঁহাঁ'/'অঁহাঁ' ধ্বনি থেকেও ভাষার উদ্ভবের কথা স্বীকার করা যায় না। কারণ, শিশুর 'ওঁহাঁ'/'অঁহাঁ' ধ্বনিও হল অর্থহীন।

বলাবাহুল্য উপরোক্ত আলোচনার আলোকে পরিশেষে বলতে পারি যে, নব প্রস্তর যুগে দল বেঁধে সুখশান্তিময় জীবন-যাপনের তাগিদেই এক-একটি আদিম ভাষার উদ্ভবের খেই ধরে এক-একটি সংঘবদ্ধ সমাজেরও উদ্ভব ঘটেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এই কালটি যেহেতু ছিল দল গঠনের কাল তাই তখন মানুষে মানুষে উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়, ভাব-ধারণাজাত কোন প্রকারের সাম্মানিক (Honorific) ভেদাভেদ ছিলই না। দলের সবাই ছিল সমান এবং তারই ফলে সমাজও হয়ে উঠেছিল একান্তভাবে

মহা সাম্যবাদী।

যাইহোক, যে-কোন আদিম স্বতন্ত্র ভাষার উদ্ভব সম্পর্কিত তথ্যনির্ভর উপরোক্ত সুদীর্ঘ আলোচনাটির আধারে এরপর আলোচ্য কুড়মালি ভাষাটির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাষাটির বিচিত্র (Strange) পুরুষবাচক সর্বনাম পদগুলির (Personal Demonstrative Pronouns) সম্পর্কে আমার যে বিচিত্র (Strange) ধারণা জেগেছে তা সবার সামনে মনের মতো করে তুলে ধরতে পারব বলেই আমার বিশ্বাস।

কুড়মালি সর্বনাম পদ পরিক্রমা:

কুড়মালি ভাষার সর্বনাম পদগুলিকে প্রথমতঃ নিম্নলিখিত ৮টি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যায়। যথাঃ-

১) পুরুষ বাচক সর্বনাম পদ (Personal Pronouns)
২) নির্দেশক সর্বনাম পদ (Demonstrative Pronouns)
৩) অনির্দিষ্ট সর্বনাম পদ (Indifinite Demonstrative Pronouns)
৪) প্রশ্নবাচক সর্বনাম পদ (Interrogative Pronouns)
৫) সমষ্টিবাচক সর্বনাম পদ (Collective Pronouns)
৬) আত্মবাচক সর্বনাম পদ (Self-defining Pronouns))
৭) পরিমাণ বাচক সর্বনাম পদ (Measuremental Pronouns) এবং
৮) সীমানা নির্দেশক সর্বনাম পদ (Demarcational Demonstrative Pronouns)

১. পুরুষ বাচক সর্বনাম পদ (Personal Pronouns):

কুড়মালি পুরুষ বাচক সর্বনাম পদগুলি হল তিন ধরনের। যথা-

ক) উত্তম পুরুষ সর্বনাম পদ (First Personal Pronouns)
খ) মধ্যম পুরুষ সর্বনাম পদ (Second Personal Pronouns) এবং
গ) প্রথম পুরুষ সর্বনাম পদ (Third Personal Pronouns)।

১-ক) উত্তম পুরুষ সর্বনাম পদের উদ্ভবের প্রসঙ্গক্রম:

পূর্বোক্ত 'প্রসঙ্গক্রম'-এর আধারে বলতে বাধা নেই যে, কুড়মালি ভাষাটির জন্মলগ্নেই কুড়মালি পুরুষবাচক সর্বনাম পদগুলির অন্তর্গত উত্তম, মধ্যম এবং প্রথম পুরুষের একবচনের সর্বনাম পদ তিনটির উদ্ভব যে আলোচ্য কুড়মালি ভাষাটির সঙ্গে তদানীন্তনকালে সংশ্লিষ্ট আদি-মানবদের দ্বারা দল বেঁধে জীবন-যাপন করার

তাগিদ নিয়েই হয়েছিল সে কথা জোর করেই বলতে পারি। আর এইভাবে দল বেঁধে জীবনযাপন করার প্রক্রিয়াটি যে তারা বানর-হরিণ, কাক-শালিক প্রভৃতি নিরীহ পশু-পাখীদের দ্বারা বিপদ-আপদের আভাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গী-সাথীদের সাবধান করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মুখ দিয়ে বিপদ সূচক 'ধ্বনি' (Sounds) সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া থেকেই শিখে নিতে পেরেছিল সে কথাও হল অনস্বীকার্য। আর এই কারণেই বলা হয়ে থাকে 'প্রকৃতিই হল প্রাথমিক শিক্ষায়ন' (Nature is the Primary School of Learning)। আর এই অবস্থায় আদি মানবদের মধ্যে যখনই কোন এক প্রথম আদিমানব বিশেষ (First Person) দ্বিতীয় কোন আদিমানব বিশেষকে (Second Person) তার নিজের কাছে আসতে বলার কথা ভাবত তখন সে মুখ দিয়ে এক ধরনের গম্ভীর গর্জন জাতীয় 'ধ্বনি' বা 'শব্দ' (Sound) উচ্চারণ করে দ্বিতীয় ব্যক্তিটির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করত। ফলে যেমনি ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তিটি প্রথম ব্যক্তিটির দিকে নজর ফেরাত তেমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বক্তা ব্যক্তিটি দ্বিতীয় ব্যক্তিটির দিকে হাত বাড়িয়ে ঈশারা করে তাকে নিজের কাছে আসতে বলার মনোভাব প্রকাশ করত। দ্বিতীয় ব্যক্তিটিও তখন যেমনই প্রথম ব্যক্তিটির মনোভাব বুঝতে পারত অমনি সে প্রথম ব্যক্তিটির কাছে আসত। বলাবাহুল্য এইভাবে একজন থেকে দুজনের, দুজন থেকে বহুজনের সমাবেশে দলের লোক সংখ্যা বাড়তে বাড়তে যেমন এক একটি আদিম গোষ্ঠী বা দলের গঠন হত তেমনিভাবে এক-একটি গোষ্ঠীভিত্তিক মহাসাম্যবাদী সামাজিক সংস্থারও উদ্ভব ঘটত। আর এইভাবে সমাজের আকার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুজনবোধ্য, মনোভাবের আদান-প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের মনোভাব ব্যঞ্জক বিভিন্ন ধরনের মুখোচ্চারিত ধ্বনিগুলির (Sounds) ভাবানুসারী যথাযথ সমাবেশের দ্বারা একএকটি আদিম গোষ্ঠীর এক-একটি স্বতন্ত্র ভাষারও বিকাশ ঘটে। বলাবাহুল্য ঠিক এমনিভাবেই আমাদের কুড়মালি ভাষাটিরও উদ্ভব যে ঘটেছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

যাইহোক, এরপর বর্তমানে কুড়মালি ভাষাতে প্রচলিত উত্তম পুরুষের একবচনের সর্বনাম পদ - 'মঁ', 'মঁই', 'মুঁ', 'মুঁই', 'হঁম্', 'হাঁম্', 'হাঁমি', 'হাঁমেঁ, হাঁমুঁ, হাঁউঁ প্রভৃতি সবই হল আমাদের পূর্ব -পুরুষ আদিমানবদের আত্মনির্দেশক মূল ধ্বনিরূপ (Root Sound form)- 'হ্ঁম্-মঁই' (আমি) জাত তদ্ভব কুড়মালি সর্বনাম পদ। কথাটি একটু খুলেই বলছি—

দল বাঁধার তাগিদে আমাদের পূর্বপুরুষ আদি-মানবেরা যখন কোনো অন্য

আদি-মানবকে দুরে দেখতে পেত তখন প্রথম ব্যক্তিটি (First Person) ঐ দূরস্থিত দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে কাছে আসতে বলার জন্য যতটা জোরে সম্ভব চীৎকার করে অত্যন্ত গুরু গম্ভীর আওয়াজ বা ধ্বনি (Sound) মুখ দিয়ে উচ্চারণ করত। এই ক্ষেত্রে ব্যবহারিক দিক দিয়ে জোর করেই বলতে পারি যে ঐ অবস্থায় তারা নিশ্চয়ই আমাদের মত নাকি সুরে 'মঁ', 'মঁ' (অর্থাৎ আমি' 'আমি') করে হাল্‌কাভাবে দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে ডাকত না। তারা নিশ্চয়ই এই অল্পপ্রাণ (Undspirate) 'মঁ' ধ্বনিটিকে চীৎকার করে যেভাবে উচ্চারণ করত তখন সেটি নিশ্চিত রূপে হয়ে উচত- স্বতোনসিক্য মহাপ্রাণ ধ্বনি (Nasalised aspirated Sound) 'হ্‌ঁম্ঁ-মঁহ্‌' 'হ্‌ঁম্ঁ-মঁহ্‌' (অর্থাৎ- 'আমি' 'আমি' 'আমি')। আর এইটিই হল আমাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত উত্তম পুরুষের এক বচনের সর্বনাম পদগুলি মূল উৎস। আর এই ভাবে জোর করেই বলতে পারি দ্রাবিড়ীয় কুড়মালি ভাষাটির পুরুষ বাচক (উত্তম-মধ্যম-প্রথম পুরুষ) কোনটিরই আর অন্য কোন মূল নেই; সবই হল 'ভুঁইফোড়';দ্রাবিড় ভাষার সর্বনাম পুরুষ বাচক পদগুলি যে 'প্রাকৃত' বা আপনা-আপনিই জন্মেছে সে সম্পর্কেও জানতে পারা যায়—

"The personal Pronouns are primary and are not derived from other roots....Personal Pronouns pose interesting phonetical and morphological problems in Dravidian Languages."
(The Dravidian Languages : Bhadriraju Krishnamurti: Cambridge University Press, 6-4-pronouns, Page-243)

আর বলাবাহুল্য এইভাবে- মুল ধ্বনিরূপ - 'হ্‌ঁম্ঁ-মঁহঁ-টি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুড়মালি ভাষাটিরও উদ্ভবের সূত্রপাত ঘটে। এইভাবে এই আত্মনির্দেশক মূল ধ্বনিরূপটিকে (Self Demonstrative root sound form) কুড়মালি ভাষায় উদ্ভূত প্রথম শব্দ (Word) রূপে চিহ্নিত করতেও কোন বাধা নেই বলেই আমার বিশ্বাস।

প্রসঙ্গতঃ এই স্বতোদ্ভূত নাসিক্য মূল ধ্বনি রূপটির উচ্চারণ পদ্ধতিটির (Articulatory process) সম্পর্কে 'উচ্চারণ ধ্বনিবিজ্ঞান'-এর (Articulatory phonetics) অনুসারে বলতে পারি যে এই 'হ্‌ঁম্ঁ-মঁহঁ' ধ্বনিটির উচ্চারণের সময় ঠোঁট বন্ধ করে প্রথমে মুখভর্তি নিঃশ্বাস বায়ুর (Breating air) প্রায় অর্ধেকাংশ নাক দিয়ে এক ঝোঁখ জোরের সঙ্গে বের করে দিলেই প্রথমে ধ্বনিটির প্রথমার্ধ 'হ্‌ঁম্ঁ'-এর উচ্চারণ হয়ে যায়। আর এরপর তৎক্ষনাৎ ঠোঁট খুলে নাক ও মুখ দিয়ে

সজোরে এক ঝোঁকে মুখভর্তি নিঃশ্বাস বায়ুর শেষ টুকু বের করে দিলেই মূল ধ্বনিরুপটির শেষার্ধ- 'মঁহ' এর উচ্চারণ হয়ে যায় এবং এইভাবে উদ্ভব ঘটে 'হাঁম্ঁ-মঁহ্ঁ (= আমি) মুলধ্বনিটির।

প্রসঙ্গতঃ এই ধ্বনিটির গঠনগত (Structural) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও বলা যায় যে, 'হাঁম্ঁ' এবং 'মঁহঁ' এই দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনির সমন্বয়ে 'হাঁম্ঁ-মঁহ্ঁ' মুল ধ্বনি রুপটি গড়ে উঠেছে। এই দিক দিয়ে আবার ছন্দোময়তার (Rhythmical property) বিচারে বলা যায় যে, 'হাঁম্ঁ' ধ্বনিটি হল একটি দ্বিমাত্রিক স্বতন্ত্রধ্বনি। মাত্রা বিন্যাস হল 'হাঁম্ঁ = ২ মাত্রা। অনুরূপভাবে 'মঁহ্ঁ ধ্বনিটিও হল একটি দ্বিমাত্রিক স্বতন্ত্র ধ্বনি যেটির মাত্রা বিন্যাস হল 'মঁহঁ' = ২ মাত্রা। আর এইভাবে মূল ধ্বনিরূপটি একত্রে হল চারি মাত্রার ধ্বনি— 'হাঁম্ঁ + মঁ-হঁ = ২ + ২ = ৪ মাত্রা।

আর এইভাবে কুড়মালি ভাষাতে প্রচলিত উত্তম পুরুষের একবচনের সমার্থক রূপে প্রচলিত -মঁ', 'মুঁইঁ', মঁই, 'মুঁ', 'হঁম্', 'হাঁম্', 'হাঁমিঁ', 'হাঁমেঁ', 'হাঁমুঁ', 'হাঁড়ঁ' প্রভৃতি সর্বনাম পদগুলিকে উদ্ভবের মূলানুসারে মোট দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়। যথা-

*** 'হাঁম্ঁ'- ধ্বনিজাত উত্তম পুরুষ একবচন ও বহুবচনের সর্বনাম পদ:**

এগুলি মূলতঃ হল যথাক্রমে- 'হঁম্' 'হাঁম্', 'হাঁমিঁ,' 'হাঁমেঁ, 'হাঁমুঁ', 'হাঁউ' প্রভৃতি এই ৬টি পদ আবার এই 'হাঁম্ঁ' ধ্বনিজাত উত্তম পুরুষ বহুবচনের সর্বনাম পদগুলি হল যথাক্রমে- 'হঁমনি,' 'হাঁম্নি', 'হাঁম্রা', 'হাঁম্রানি', 'মঁরা', 'মঁরানি' এই ৬টি পদ।

উত্তম পুরুষ একবচনের সর্বনাম পদগুলির ব্যুৎপত্তি:

(১) 'হঁম্' < 'হাঁ মঁ- মঁ হঁ (আত্মনির্দেশক উত্তম পুরুষ এক বচনের মূলধ্বনিরূপ) > হাঁ। মঁ- অঁ অঁ > হাঁ মঁ > হঁম্ (= আমি), প্রাতিপাদিক বা প্রত্যয়-বিভক্তি শূন্য মুল রূপ।

(২)হাঁম্ < হাঁ মঁ মঁ হঁ > হাঁ মঁ - অঁ অঁ > হাঁমঁঅঁ > হাঁম্ (= আমি), প্রাতিপাদিক বা প্রত্যয় বিভক্তি শূন্য মূল রূপ।

(৩) হাঁমিঁ < হাঁ মঁ-মঁ হঁ > হাঁম্ + ই- (ব্যক্তি-নির্দিষ্টার্থক গুরুত্ব, বিস্ময় প্রভৃতি ভাববোধক প্রত্যয় > হাঁমি (আদ্য নাসিক্য ধ্বনি 'হাঁ'-এর প্রভাবে অন্ত্য -'মি' ধ্বনিটির নাসিক্যীভবন) > হাঁমিঁ।

(৪) হাঁমেঁ < হাঁ মঁ- মঁ হঁ > হাঁম্ + এ- (ব্যক্তি নির্দিষ্টার্থক গুরুত্ব , বিস্ময় প্রভৃতি ভাববোধক প্রত্যয় > হাঁমে (আদ্য-'হাঁ'- নাসিক্য ধ্বনিটির প্রভাবে অন্ত্য 'মে' -ধ্বনিটির নাসিক্যভবন > হাঁমেঁ।

(৫) <u>হাঁমুঁ</u> <হঁ্া ম্ঁ- মঁ হঁ > হাঁম্+ উ (উপরোক্ত 'এ' প্রত্যয়টির সমার্থক প্রত্যয় > হাঁমুঁ ('মুঁ' হল নাসিক্যভূত ধ্বনি)।

(৬) <u>হাঁউঁ</u> < হাঁ ম্ঁ-মঁ হঁ > হাঁমুঁ > হাঁউঁ (বর্তমানে অপ্রচলিত, কুড়মালি ভাষার আদি নিদর্শন 'চর্যাপদাবলী' গ্রন্থে প্রাপ্ত 'তু লো ডোম্বী <u>হাঁউঁ</u> কপালী।'

***'মঁহঁ'-ধ্বনিজাত উত্তম পুরুষ একবচনের সর্বনাম পদ:**

(১) <u>মঁ</u> < হাঁ মঁ্-মঁ হঁ > মঁ্ মঁ হঁ (আদ্যধ্বনি 'হাঁম্ঁ-এর 'হাঁ' লুপ্ত) > মঁ হঁ > মঁ অঁ > মঁ (= আমি; উত্তম পুরুষ একবচনের বিভক্তি শূন্য প্রাতিপাদিক সর্বনাম পদ)।

(২) <u>মঁইঁ</u> < হাঁ মঁ্- মঁ হঁ > মঁ + ই (গুরুত্ব, বিস্ময় প্রভৃতি ভাববোধক ব্যক্তি নির্দেশক প্রত্যয় > মঁইঁ ('ইঁ' হল নাসিক্যীভূত ধ্বনি)।

(৩) <u>মুঁ</u> < হাঁ মঁ্ - মঁ হঁ্ > মঁ + উ (প্রত্যয়) > মুঁ।

(৪) <u>মুঁইঁ</u> < হাঁম্ঁ-মঁহঁ > মুঁ + ই > মুঁ ইঁ (অর্থাৎ- আমি-ই)।

*** উত্তম পুরুষ বহুবচনের সর্বনাম পদগুলির উদ্ভবের প্রসঙ্গক্রম:**

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে উত্তম পুরুষের সর্বনাম পদের এক বচনের মূল ধ্বনিরূপ 'হাঁম্ঁ- মঁ হঁ' থেকেই কালক্রমে কুড়মালি ভাষাতে প্রচলিত উত্তম পুরুষের বহুবচনের সর্বনাম পদগুলিরও উদ্ভব ঘটে। এই সর্বনাম পদগুলি হল- 'হঁম্নি', 'হাঁম্নি', 'হাঁম্রা', 'হাঁম্রানি', 'মঁরা', 'মঁরানি' প্রভৃতি এবং এইগুলির উদ্ভব মূল ধ্বনিরূপটির আদ্য ধ্বনি- 'হাঁম্ঁ' থেকে নিম্নলিখিতভাবে ঘটেছে—

(১) <u>হঁম্নি</u> <হঁ্া ম্ঁ-মঁ হঁ > হঁম্ (উত্তম পুরুষ একবচনের প্রাতিপদিক সর্বনাম পদ) + নি (সমষ্টিবোধক বহুবচনের প্রত্যয়) > হঁ ম নি (= আমরা সবাই; all of us)।

(২) <u>হাঁম্নি</u> < হাঁ ম্ঁ- মঁ হঁ > হাঁ ম্ঁ-হঁ > হাঁম্ অঁ + নি (সমষ্টিবোধক বহু বচনের প্রত্যয় > হাঁ মঁ নি > হাঁমনি (= আমরা সবাই)।

(৩) <u>হাঁম্রা</u> < হাঁম্ঁ- মঁ হঁ > হাঁম্ঁ-হঁ > হাঁম্অঁ + রা (বহু বচনের সাধারণ প্রত্যয় > হাঁম্রা (> আমরা; we)।

(৪) <u>হাঁম্রানি</u> < হাঁম্ঁ-মঁ হঁ > হাঁম্রা + নি (বহুবচনাত্মক সমষ্টি বাচক প্রত্যয়) > হাঁম্রানি (= আমরা সবাই, all of us)।

(৫) <u>মঁরা</u> < হাঁম্ঁ-মঁ হঁ্ > মঁ (উত্তম পুরুষ একবচনের প্রাতিপদিক সর্বনাম পদ) + রা- (বহুবচনাত্মক সাধারণ প্রত্যয়) > মঁরা (= আমরা)।

(৬) <u>মঁরানি</u> < হাঁম্ঁ-মঁ হঁ > মঁরা + নি (সমষ্টিবাচক বহুবচনাত্মক প্রত্যয় মঁরানি (= আমরা সবাই; all of us)।

*** কুড়মালি উত্তম পুরুষ সর্বনাম পদগুলির কারক বিভক্তিগত বিভিন্ন রুপ:**

কুড়মালি শব্দরূপ			কুড়মালি শব্দরূপের বঙ্গানুবাদ	
কারক	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
কর্তৃকারক	হঁম্, হাঁম্, হাঁমিঁ, হাঁমেঁ, হাঁমু, হাউঁ, মঁ, মঁইঁ, মুঁ, মুঁইঁ	হঁম্নি, হঁম্রানি, হাঁম্রা, হাঁম্রানি মঁরা, মঁরানি	আমি	আমরা
কর্ম ও সম্প্রদান কারক	হঁম্কে, হাঁম্কেঁ, হাঁমে, মঁকেঁ	হঁম্নিকেঁ, হঁম্রানিকেঁ, হাম্নিকেঁ, হাঁম্রানিকেঁ, হাঁম্রাকেঁ, হাঁম্রানিকে, মঁরাকে, মঁরানিকে হঁমনিক(র) দারাজ	আমাকে আমারে আমায় মোরে	আমাদিগকে আমাদেরকে মোদেরকে
করণ কারক (করণ কারকে কোন নির্দিষ্ট বিভক্তি নেই। দারাজ, তাঁইঁ(এঁ), দেই(কে), বুত(া) লেঁ প্রযুক্ত হয়।)	হঁমর দারাজ, হাঁমঁর দারাজ মঁর দারাজ	হঁমঁরানিক(র) দারাজ, হাঁম্রাক(র) দারাজ, হাঁম্রানিক(র) দারাজ মঁরাক(র) দারাজ, মঁরানিক(র) দারাজ	আমার দ্বারা	আমাদের দ্বারা
	হঁমঁরতাঁই(এঁ) হাঁমঁরতাঁই(এঁ) মঁর তাঁইঁ(এঁ)	হঁম্নিক(র) তাঁইঁ(এঁ), হঁম্রানিক(র) তাঁই(এঁ) হাঁমরাক(র) তাঁইঁ(এঁ), হাঁম্রানিক(র) তাঁইঁ(এঁ) মঁরাক(র) তাঁইঁ(এঁ), মঁরানিক(র) তাঁইঁ(এঁ)	আমার সামর্থ্যে	আমাদের সামর্থ্যে
	হঁমঁর বুত(া)লেঁ হাঁমর বুত(া)লেঁ মঁর বুত(া) লেঁ	হঁম্নিক(র)বুত(া)লেঁ, হঁম্রানিক(র) বুত (া) লেঁ হাঁম্রাক(র) বুত(া) লেঁ, হাঁমরানিক(র) বুত(া) লেঁ মঁরাক(র) বুত(া)লেঁ, মঁরানিক(র) বুত(া) লেঁ	আমার ক্ষমতায়	আমাদের ক্ষমতায়
	হঁমঁর দেই (কে)	হঁম্রাক(র) দেই(কে), হঁম্রানিক(র) দেই(কে)	আমাকে দিয়ে	আমাদের দিয়ে

কুড়মালি শব্দরূপ			কুড়মালি শব্দরূপের বঙ্গানুবাদ	
কারক	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
	হাঁমঁর দেই(কে) মঁর দেই (কে)	হাঁম্‌রাক(র) দেই(কে), হাঁম্‌রানিক(র) দেই(কে) মঁরাক(র) দেই(কে), মঁরানিক(র) দেই (কে)	আমাকে দিয়ে	আমাদের দিয়ে
অপাদান কারক	হঁমর লেঁ হাঁমঁর লেঁ মঁর লেঁ	হঁম্‌নিক(র) লেঁ, হঁম্‌রানিক(র) লেঁ হাঁম্‌নিক(র) লেঁ, হাঁম্‌রানিক(র) লেঁ মঁরাক(র) লেঁ, মঁরানিক(র) লেঁ	আমা হতে, আমার থেকে	আমাদের হতে, আমাদের থেকে
সম্বন্ধ পদ	হঁমঁর হাঁমঁর মঁর	হঁম্‌নিক(র), হঁম্‌রানিক(র) হাঁম্‌রাক(র), হাঁম্‌রানিক(র) মঁরাক(র), মঁরানিক(র)	আমার	আমাদের
অধিকরণ কারক	হঁমঁর ভিত্‌রেঁ হাঁমঁর ভিত্‌রেঁ মঁর ভিত্‌রেঁ হঁমঁর মাঁঝেঁ হাঁমঁর মাঁঝেঁ মঁর মাঁঝেঁ	হঁম্‌নিক(র) ভিত্‌রেঁ, হঁম্‌রানিক(র) ভিত্‌রেঁ হাঁম্‌রাক(র) ভিত্‌রেঁ, হাঁম্‌রানিক(র) ভিত্‌রেঁ মঁরাক(র) ভিত্‌রেঁ, মরানিক(র) ভিত্‌রেঁ হঁম্‌নিক (র) মাঁঝেঁ, হঁম্‌রানিক (র) মাঁঝেঁ হাঁম্‌রাক(র) মাঁঝেঁ, হাঁম্‌রানিক(র) মাঁঝে মঁরাক(র) মাঁঝেঁ, মঁরানিক(র) মাঁঝে	আমার ভিতরে, আমাতে আমার মধ্যে	আমাদের ভিতরে আমাদের মধ্যে

১-খ) কুড়মালি মধ্যম পুরুষ সর্বনাম পদের উদ্ভবের প্রসঙ্গক্রম:

প্রসঙ্গতঃ উপরোক্ত ভাবে কুড়মালি ভাষাটির উত্তম পুরুষের একবচনের মূল সর্বনাম পদটির উদ্ভব সম্পর্কিত আলোচনার প্রাসঙ্গিক খেই ধরে নির্দ্ধিধায় বলতে পারি যে, কুড়মালি উত্তম পুরুষের স্রষ্ঠা আদি মানববিশেষ প্রথম বক্তা ব্যক্তিটি যেমনি দেখতে পেল যে তার মুখোচ্চারিত ধ্বনিটি শুনে দ্বিতীয় আদি মানব শ্রোতা ব্যক্তিটির দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তেমনি তৎক্ষনাৎ প্রথম ব্যক্তিটি দ্বিতীয় ব্যক্তিটির দিকে হাত বাড়িয়ে মুখ দিয়ে জোরালো গুরুগম্ভীর সম্বোধন সূচক — 'হ্ঁ তৃ- তঁ হ্ঁ', 'হ্ঁ তৃ- তঁ হ্' ....(= 'তুমি'...'তুমি') ধ্বনির উচ্চারণ করে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে তার নিজের কাছে আসার জন্য হাতের দ্বারা ঈশারা করে আহ্বান করত এবং ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তিটিও প্রথম ব্যক্তিটির মনোভাব বুঝতে পেরে প্রথম ব্যক্তিটির কাছে এসে দুজনে মিলিত হত। আর যেহেতু উত্তম পুরুষের প্রথম ব্যক্তিটির মুখোচ্চারিত 'হ্ঁ তৃ- তঁ হ্' ধ্বনিটি (Sound) শোনার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তিটিও বুঝে নিত যে ঐ ধ্বনিটির দ্বারা তাকেই নির্দেশিত (Demostrate) করা হচ্ছে তাই সেও সক্রিয় (active) হয়ে উঠত। আর তাই বাস্তব ও ব্যবহারিক (Real and practical)। দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসারে আমার মতে এই ধ্বনিটিই হল কুড়মালি ভাষার মধ্যম পুরুষ সর্বনাম পদের একবচনের মূল ধ্বনিরূপ এবং এইটি থেকেই যেমন কালান্তরে প্রথমে বিকশিত হয়েছে মধ্যমপুরুষের একবচনের সর্বনাম পদের সমার্থক পদগুলির এবং পরে তেমনিভাবেই বহুবচনের সর্বনাম পদগুলিরও বিকাশ ঘটেছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে উপরোক্ত পুরুষ বাচক সর্বনাম পদের উত্তম পুরুষের একবচনের স্রষ্টা আদি মানববিশেষ প্রথম ব্যক্তিটির দ্বারা দ্বিতীয় আদি মানববিশেষ শ্রোতা ব্যক্তিটিকে নির্দেশিত করার নিমিত্ত, মুখোচ্চারিত উচ্চারণ পদ্ধতির সম্পর্কে 'উচ্চারণ ধ্বনিবিজ্ঞান'-এর (Articulatory Phonetics) অনুসারে বলতে পারা যায় যে, স্বতোদ্ভূত নাসিক্য- 'হ্ঁ তৃ- তঁ হ্' -মুল ধ্বনি রূপটির উচ্চারণের সময় সর্বপ্রথম জিভের অগ্রভাগ দিয়ে উপরের চোয়ালোর দন্তমূলে জোরালো চাপ দিয়ে মুখ খোলা অবস্থায় ফুসফুস (Lungs) থেকে নিশ্বাস বায়ুকে একঝোঁকে জোর দিয়ে চীৎকার করে একই সঙ্গে নাক ও মুখ দিয়ে বের করে দিলেই ধ্বনিটি সজোরে উচ্চারিত হয়ে যায় এবং কিয়দ্দূরবর্তী যে কোন ব্যক্তি তা শুনতে পায়।

প্রসঙ্গতঃ এই ধ্বনিটির গঠনগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও বলতে পারা যায় যে, পূর্বোক্ত

উত্তম পুরুষ সর্বনামপদের একবচনের মূল ধ্বনিরূপটির মতই এই মধ্যম পুরুষ সর্বনাম পদের একবচনের মূল ধ্বনিরূপটিও দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এবং এই দুটির মধ্যে আদ্য ধ্বনিটি হল - 'হ্ঁ ত্ঁ'- এবং অন্ত্য ধ্বনিটি হল- 'তঁহ্ঁ'। আবার, এই মূল ধ্বনিটির ছন্দোময়তার (Rhythmical property) দিক দিয়েও বলতে পারা যায় যে, মূল ধ্বনিরূপটির প্রথমাংশ 'হ্ঁত্ঁ'- হল একটি দ্বিমাত্রিক ধ্বনি - 'হ্ঁ ত্ঁ' = ২ মাত্রা। অনুরূপভাবে মূল ধ্বনিরূপটির শেষাংশ - 'তঁ হ্ঁ' ধ্বনিটিও হল দ্বিমাত্রিক- 'তঁ হ্ঁ' = ২ মাত্রা বিশিষ্ট।

বলাবাহুল্য, উদ্ভবের দিক দিয়ে এই মধ্যম পুরুষ সর্বনাম পদের একবচনের ব্যক্তি নির্দেশক পদটিই হল মূলতঃ কুড়মালি ভাষার শব্দভান্ডারের দ্বিতীয় প্রাচীন শব্দ এবং এইটি থেকেই কালক্রমে বিকশিত হয়েছে বর্তমানে প্রচলিত কুড়মালি ভাষার মধ্যম পুরুষের সর্বনাম পদের একবচনের একাধিক পদের যেগুলি হল যথাক্রমে— তঁ, তেঁ, তঁহঁ, তঁহেঁ, তঁহিঁ, তঁহীঁ, তঁহুঁ, তুঁ, তুঁহঁ, তুঁহিঁ, তুঁহীঁ, তুঁহুঁ প্রভৃতি। অনুরূপভাবে বহুবচনের সর্বনাম পদগুলি হল— তঁহ্ঁনি, তঁহ্ঁরা, তঁহ্ঁরানি, তঁরা, তঁরানি প্রভৃতি।

প্রসঙ্গতঃ এই ক্ষেত্রে উল্লেখ্যে যে, উল্লিখিত, মধ্যম পুরুষের একবচনের সর্বনাম পদ- তেঁ (= তু মি, তুই) একদা প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে এই 'তেঁ' সর্বনাম পদটির প্রচলন দেখা যায় না। এই 'তেঁ' সর্বনাম পদটি সম্পর্কে আরও বলতে পারা যায় যে, এটির দ্বিত্ব-প্রয়োগের উল্লেখ কুড়মালি ভাষার আদি নিদর্শন 'চর্যাপদে' পাওয়া যায়। যথা- 'জেঁ-জেঁ আইলা তেঁ-তেঁ গেলা। অর্থাৎ 'যে-যে এল সে-সে গেল'। আর এই ক্ষেত্রে সবিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, মধ্যম পুরুষের এক বচনের 'তেঁ' (= তুমি, তুই) সর্বনাম পদটি মধ্যম পুরুষ থেকে স্থানান্তরিত (shift) হয়ে প্রথম পুরুষের একবচনের পদরূপে চর্যাপদে ব্যবহৃত হয়েছে এবং অর্থেরও পরিবর্তন হয়ে 'তেঁ'- এর অর্থ দাঁড়িয়েছে- 'সে', he/she।

*** মধ্যম পুরুষ একবচনের সর্বনাম পদগুলির ব্যুৎপত্তি:**

(১) তঁ < হ্ঁত্ঁ -তঁ হ্ঁ (ম. পু. একবচনের ব্যক্তি নির্দেশক মূল ধ্বনিরূপ) > তঁ হ্ঁ > তঁ অঁ > তঁ (তুমি, তুই)।

(২) তেঁ < তঁ + এ = (গুরুত্বারোপক ব্যক্তি নির্দেশক প্রত্যয়) > তঁ এ > তেঁ (= সে-ই)।

(৩) তঁ হঁ < হ্ঁ ত্ঁ - তঁ হ্ঁ > তঁ হ্ঁ > তঁ হঁ (তুমি)।

(৪) তঁহেঁ <হঁ্তুঁ্ - তঁহঁ্> তঁহঁ + এ (গুরুত্বারোপক ব্যক্তি নির্দেশক প্রত্যয় > তঁ হেঁ (= তুমি-ই)

(৫) তঁহিঁ <হঁ্তুঁ্- তঁহঁ্> তঁহঁ + ই (গুরুত্ব, বিস্ময় প্রভৃতি ভাবার্থক ব্যক্তি-নির্দেশক প্রত্যয় > তঁ হিঁ।

(৬) তঁইঁ <হঁ্তুঁ্ -তঁহঁ্> তঁ হিঁ > তঁ ইঁ (> তুমি; তুমি-ই)।

(৭) তঁহুঁ <হঁ্তুঁ্ - তঁহঁ্> তঁহঁ্ + উ (গুরুত্ব, বিস্ময়, সাধারণ ভাবব্যঞ্জক ব্যক্তি-নির্দেশক প্রত্যয়) > তঁ হুঁ (= তুমি, তুমিও)

(৮) তুঁ <হঁ্তুঁ্ - তঁহঁ্> তঁ + উ > তুঁ (= তুমি)।

(৯) তুঁহঁ > হঁ্তুঁ্ - তঁহঁ্ > তঁহঁ্ > (= তুমি)। এই ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, উল্লিখিত 'তুঁ' (= তুমি) সর্বনাম পদটির ধ্বনি সাদৃশ্যে 'তঁহঁ' হয়ে পড়েছে 'তুঁহ'। বলাবাহুল্য অনরূপ 'তুঁ' সর্বনাম পদটির ধ্বনি প্রভাবিত অপর তিনটি সমার্থক সর্বনাম পদ হল যথাক্রমে—'তুঁহিঁ', 'তুঁইঁ' এবং 'তঁহুঁ'।

(১০) তুঁহিঁ <হঁ্তুঁ্ - তঁহঁ্> তুঁ হঁ + ই (গুরুত্ব ভাববোধক ব্যক্তি-নির্দেশকপ্রত্যয়) > তুঁহিঁ (= তুমি-ই)।

(১১) তুঁইঁ <হঁ্তুঁ্ - তঁহঁ্> তুঁ হিঁ > তুঁ ইঁ ('হ'-ধ্বনি লোপ)।

(১২) তুঁ হুঁ <হঁ্তুঁ্ - তঁহঁ্> তুঁ হঁ্ + উ > তুঁ হুঁ (= তুমি)।

*** মধ্যম পুরুষ সর্বনাম পদের বহুবচনের বিভিন্ন পদগুলির ব্যুৎপত্তি হল নিম্নরূপ:**

(১) তঁহ্নি <হঁ্তুঁ্ - তঁহঁ্> তঁ হঁ্ + নি (সমষ্টিবাচক বহুবচনের প্রত্যয়) > তঁ হঁ্ নি। (= তোমরা সবাই; all of you)।

(২) তঁ হঁ্ রা <হঁ্তুঁ্ - তঁহঁ্> তঁ হঁ + রা (বহুবচনের সাধারণ প্রত্যয়) > তঁ হঁ্রা (=তোমরা)।

(৩) তঁহঁ্রানি <হঁ্তুঁ্ - তঁহঁ্> তঁ হঁ রা + নি (সমষ্টিবাচক বহুবচনের প্রত্যয়) > তঁহঁ্রানি (= তোমরা সবাই)।

(৪) তঁরা <হঁ্তুঁ্ - তঁহঁ্> হঁ্তুঁ্ - তঁহঁ্ > তঁ + রা (বহুবচনের সাধারণ প্রত্যয়) > তঁরা (তোমরা)।

(৫) তঁরানি <হঁ্তুঁ্ - তঁহঁ্> তঁরা + নি (সমষ্টিবাচক বহুবচনের প্রত্যয়)> তঁরানি (=তোমরা সবাই)।

*** মধ্যম পুরুষের সর্বনাম পদের কারক-বিভক্তিগত বিভিন্ন রূপ:**

কুড়মালি শব্দরূপ			কুড়মালি শব্দরূপের বঙ্গানুবাদ	
কারক	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
কর্তৃকারক	তঁ, তঁহঁ, তঁহিঁ, তঁহঁ তঁহ্ঁ, তুঁ, তুঁহঁ, তুঁহিঁ, তুঁহঁ তুঁহ্ঁ	তঁহ্নি, তঁহ্রা, তঁহ্রানি, তঁরা, তঁরানি	তুমি, আপনি	তোমরা, আপনারা
কর্ম ও সম্প্রদান কারক	তঁহেঁ তঁকেঁ	তঁহ্নিকেঁ, তঁহ্রাকে, তঁহ্রানিকেঁ তঁরাকেঁ, তঁরানিকেঁ	তোকে, তোমাকে আপনাকে	তোমরাকে তোমাদেরকে, আপনাদেরকে
করণ কারক	তঁহঁর দারাজ তঁর দারাজ	তঁহ্নিক(র) দারাজ, তঁহ্রাক(র)দারাজ, তঁহ্রানিক(র) দারাজ তঁরাক(র), তঁরানিক(র) দারাজ	তোমার দ্বারা, তোর দ্বারা, আপনার দ্বারা	তোমাদের দ্বারা, আপনাদের দ্বারা
	তঁহঁর তাঁইঁ(এঁ) তঁর তাঁইঁ(এঁ) তঁহঁর বুত(া) লেঁ তঁর বুতা(া) লেঁ	তঁহ্নিক(র) তাঁইঁ(এঁ), তঁহ্রাক(র) তাঁইঁ(এঁ) তঁরাক(র) তাঁইঁ(এঁ), তঁরানিক(র) তাঁইঁ(এঁ) তঁহ্নিক(র) বুত(া) লেঁ, তঁহ্রাক(র) বুত(া) লেঁ, তঁহ্রানিক(র) বুত(া) লেঁ তঁরাক(র) বুত(া) লেঁ, তঁরানিক(র) বুত(া) লেঁ	তোমার সামর্থ্যে, আপনার সামর্থ্যে	তোমাদের সামর্থ্যে, আপনাদের সামর্থ্যে

কুড়মালি শব্দরূপ			কুড়মালি শব্দরূপের বঙ্গানুবাদ	
কারক	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
	তঁহঁর দেই(কে)	তঁহ্ঁনিক(র) দেই(কে), তঁহ্ঁরাক(র) দেই(কে), তঁহ্ঁরানিক(র) দেই (কে)	তোমাকে দিয়ে, আপনাকে দিয়ে	তোমাদের দিয়ে, আপনাদের দিয়ে
অপাদান কারক	তঁহঁর লেঁ তঁর লেঁ	তঁহঁনিক(র)লেঁ, তঁহ্ঁরাক(র) লেঁ, তঁহ্ঁরানিক(র)লেঁ	তোমাদের থেকে, আপনার থেকে	তোমাদের থেকে, আপনাদের থেকে
সম্বন্ধ	তঁহঁর তঁর	তঁরাক(র) লেঁ, তঁরানিক(র) লেঁ তঁহ্ঁনিক(র), তঁহ্ঁরাক(র), তঁহ্ঁরানিক(র)	তোমার, আপনার	তোমাদের, আপনাদের
অধিকরণ কারক	তঁহঁর ভিত্‌রে, তঁর ভিত্‌রেঁ	তঁহ্ঁরানিক(র) ভিত্‌রেঁ, তঁহ্ঁরাক(র) ভিত্‌রেঁ তঁরাক(র), তঁরানিক(র)	তোমার ভিতরে, আপনার ভিতরে	তোমাদের ভিতরে, আপনাদের ভিতরে
	তঁহঁর মাঁঝেঁ তঁর মাঁঝেঁ	তঁরাক(র) ভিত্‌রেঁ, তঁরানিক(র) ভিত্‌রেঁ তঁহ্ঁনিক(র) মাঁঝেঁ, তঁহ্ঁরাক(র) মাঁঝেঁ, তঁহ্ঁরানিক(র) মাঁঝেঁ তঁরাক(র) মাঁঝে, তঁরানিক(র) মাঁঝেঁ	তোমার মাঝে, আপনার মাঝে	তোমাদের মাঝে, আপনাদের মাঝে

১-গ) কুড়মালি প্রথম পুরুষ সর্বনাম পদের উদ্ভবের প্রসঙ্গক্রম:

উপরোক্ত কুড়মালি ভাষার পুরুষ বাচক সর্বনাম পদের উত্তম পুরুষ এবং 'মধ্যম পুরুষ' দুটির উদ্ভবের খেই ধরে আলোচ্য প্রথম পুরুষ সর্বনাম পদের (Third personal demonstrative pronouns) উদ্ভবের প্রসঙ্গে তদানীন্তন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির আধারে অনুমান যে, প্রথম আদি মানববিশেষ বক্তা ব্যক্তিটির দ্বারা দল বাঁধার তাগিদে কিয়দ্দূরস্থিত দ্বিতীয় আদি মানববিশেষ শ্রোতা ব্যক্তিটিকে কাছে ডাকার পর প্রথমে তারা দুজন একসঙ্গে মিলিত হল। ফলে একজন থেকে দুজনের দল বাঁধা হল। আর এই অবস্থায় হয়তো প্রথম ব্যক্তিটি দেখতে পেল যে, বেশ কিছু দুরে তৃতীয় অন্য এক আদি-মানব রয়েছে এবং তখন প্রথম বক্তা ব্যক্তিটি তাকেও কাছে ডেকে দুজন থেকে তিনজনের একটি দল বাঁধার কথা চিন্তা করে ঐ তৃতীয় ব্যক্তিটির দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্যই হোক, অথবা সবেমাত্র সম্মিলিত বন্ধু দ্বিতীয় ব্যক্তিটির দৃষ্টিও ঐ দূরস্থিত তৃতীয় ব্যক্তিটির প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যই হোক প্রথম বক্তা ব্যক্তিটি তার ডান হাতটি সোজাসুজিভাবে ঐ তৃতীয় ব্যক্তিটির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে যতটা জোরে মুখোচ্চারিত ধ্বনি বের করা সম্ভব (যৎপরোনাস্তি জোরে) তার দ্বারা চীৎকার করে তৃতীয় ব্যক্তিটিকে নির্দেশিত করার জন্য বলেছিল— 'হ্যঁউঁ - অঁহ্ক্'... 'হ্যঁউঁ-অঁহ্ক্' (অর্থাৎ 'ঐ- ঐ'/'ও'...'ও')। আর এই ধ্বনিটি (Sound) শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঐ তৃতীয় ব্যক্তিটি যেমনি প্রথম বক্তা ব্যক্তিটির দিকে চাইতে লাগল অমনি প্রথম ব্যক্তিটিও হাতের ইশারা করে তাকেও তাদের কাছে আসার জন্য ইঙ্গিত করেছিল এবং তারই ফলে ঐ তৃতীয় ব্যক্তিটিও কাছে এসেছিল। আর এইভাবে দুজন থেকে তিনজনের একটি ছোট দল বা গোষ্ঠী বাঁধা হয়ে গেল।

বলাবাহুল্য কুড়মালি ভাষাটির উদ্ভবকালীন বাস্তব ও ব্যবহারিক পরিস্থিতির যথাসম্ভব অনুমানের অনুসারে আমার মতে ঐ তৃতীয় ব্যক্তিটিকে নির্দেশিত করার উদ্দেশ্যে প্রথম ব্যক্তি বিশেষ আদি-মানবের দ্বারা চীৎকার করে উচ্চারিত- 'হ্যঁউঁ — অঁহ্ক্' ধ্বনিটিই হল কুড়মালি ভাষার পুরুষ বাচক সর্বনাম পদের প্রথম পুরুষের একবচনের ব্যক্তি-নির্দেশক মূল ধ্বনিরূপ।

প্রসঙ্গতঃ কুড়মালি ভাষাটির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে কুড়মালি মৌলিক শব্দ ভান্ডারের গঠনের সম্পর্কেও ভাষা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে বলতে প ারা যায় যে উল্লিখিত 'হ্যঁ উঁ - অঁ হ্ ক্' ধ্বনিটি একাধারে হল কুড়মালি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে কুড়মালি প্রাকৃত শব্দভান্ডারটিরও তৃতীয় সংখ্যক স্বতোদ্ভূত আদিম শব্দ।

বলাবাহুল্য কালান্তরে এই ধ্বনিটি থেকেই বিকশিত হয়েছে প্রথম পুরুষের একবচনের সমার্থক বিভিন্ন সর্বনাম পদ। যথা- উ, অঁ, অঁক্, অঁ হঁ, অঁ হিঁ, অঁ ইঁ, অঁহেঁ, অঁ হুঁ প্রভৃতি তথা বহুবচনের অঁরা, অঁরানি, অঁখ্‌রা, অঁখ্‌রানি, উনিখা, উনিখান প্রভৃতি।

যাইহোক উল্লিখিত পুরুষ বাচক প্রথম পুরুষের একবচনের ব্যক্তি-নির্দেশক মূলধ্বনিরূপটির উচ্চারণ পদ্ধতির সম্পর্কেও বলতে পারা যায় যে, এই স্বতোদ্ভূত নাসিক্য মূল ধ্বনিরূপ- 'হ্যঁ উঁ - অঁ হ্ ক্'-টির উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে নির্গত নিশ্বাস বায়ুকে এক ঝোঁকে যতটা জোরে সম্ভব একই সঙ্গে নাক ও মুখ দিয়ে বের

করে দেওয়া মাত্রই মূল ধ্বনিরূপটির প্রথমাংশ - 'হাঁ উঁ'-এর উচ্চারণ হয়ে পড়ে এবং ঠিক তেমনিভাবে অবিরল ধারায় নিশ্বাস বায়ুর নির্গমনের ফলে মূল ধ্বনিরূপটির শেষাংশের কণ্ঠে ধ্বনি- 'অঁ হঁ ক্'-টিরও উচ্চারণ স্বাভাবিকভাবেই হয়ে পড়ে।

প্রসঙ্গতঃ এই ধ্বনিটির গঠনগত বৈশিষ্ট্যের সম্পর্কেও বলতে পারা যায় যে, 'হাঁ উঁ' এবং 'অঁ হঁ ক্' এই দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনির সমন্বয়ে আলোচ্য 'হাঁ উঁ - অঁ হঁ ক্' মূল ধ্বনিরূপটি গড়ে উঠেছে। আবার ছন্দোময়তার দিক দিয়ে বলতে পারা যায় যে, মূল ধ্বনি রূপটির প্রথমাংশ- 'হাঁ উঁ' ধ্বনিটি হল দ্বিমাত্রিক- 'হাঁ উঁ = ২ মাত্রা। অনুরূপভাবে মূল ধ্বনিরূপটির শেষাংশটিও হল দ্বিমাত্রিক- 'অঁ হঁ ক্' = ২ মাত্রা।

*** কুড়মালি প্রথম পুরুষ সর্বনাম পদগুলির উদ্ভবের প্রসঙ্গক্রম:**

কুড়মালি ভাষায় বর্তমানে প্রচলিত প্রথম পুরুষের সর্বনাম পদগুলি যথাক্রমে হল— উ, অঁ, অঁক্, অঁ হঁ, অঁ হিঁ, অঁ ইঁ, অঁ হেঁ, অঁ হুঁ প্রভৃতি। অবশ্য প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, 'অঁক্' (=সে) সর্বনাম পদটির প্রচলন একদা যে ছিল, অধুনা বিলুপ্ত হয়েছে সে কথা জোর করেই বলতে পারা যায়। কারণ, বর্তমানে এই 'অঁক্'-সর্বনাম পদটির প্রচলন না থাকলেও 'অঁক্' পদজাত বিভিন্ন সর্বনাম পদের প্রচলন কুড়মালি ভাষাতে আজও বহুলভাবে দেখতে পাওয়া যায়। যথা- অঁকে/ অঁক্রা / অঁখ্রা, অঁক্রাকেঁ / অঁখ্রাকেঁ, অঁক্রাক (র) / অঁখ্রাক (র), অঁকর / অঁখর প্রভৃতি। আর এইভাবে নিশ্চিন্তভাবে প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য এই 'অঁক্' (= সে) সর্বনাম পদটির প্রচলন একদা প্রথম পুরুষের একবচনের ব্যক্তি নির্দেশক রূপে ছিল। কারণ, এই অঁক্রা / অঁখ্রা, অঁক্রাকেঁ/ অঁখ্রাকেঁ প্রভৃতি পদগুলির প্রত্যয়-বিভক্তিগুলিকে বাদ দিয়ে দিলে যে প্রাতিপাদিক মূল সর্বনাম পদটি পাওয়া যায় সেটি হল প্রথম পুরুষ একবচনের সর্বনাম মূল পদ- 'অঁক্' (= সে)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কুড়মালি ভাষাটি উদ্ভবের কাল থেকে আজও অলিখিত অবস্থায় লোকভাষা রূপে জনসাধারণের শ্রুতি-স্মৃতির মাধ্যমেই প্রচলিত থাকার কারণেই কুড়মালি শব্দভাণ্ডারের অবক্ষয় ঘটাই স্বাভাবিক। অবশ্য একথাও ঠিক যে ভাষাবিজ্ঞানের বহুল প্রচলিত 'বিলুপ্ত শব্দের পুনর্গঠনের পদ্ধতি' অনুসারে কুড়মালি ভাষাটির বিলুপ্ত শব্দাবলীর যেমন পুনর্গঠন মোটামুটি ভাবে করতে পারা সম্ভব তেমনিভাবে এইসব পুনর্গঠিত শব্দের যথাযথ সন্নিবেশের দ্বারা কুড়মালি ভাষাটির প্রাচীন অলিখিত স্বরূপকেও মোটামুটি পুনর্গঠিত করতে পারাও সম্ভব।

কিন্তু, সে যাই হোক এক্ষণে প্রথম পুরুষের সর্বনাম পদগুলির উদ্ভবের প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলা যায় যে, এইগুলির বিকাশ প্রথম পুরুষের একবচনের মূল ধ্বনিরূপ- "হাঁউঁ-অঁহঁক্' -টির আদ্য ধ্বনি- 'হাঁউঁ' এবং অন্ত্য ধ্বনি- 'অঁহঁক্'- এই দুটি থেকেই কালান্তরে ঘটেছে।

*** প্রথম পুরুষের সর্বনাম পদগুলির ব্যুৎপত্তি:**

-আদ্যধ্বনি 'হাঁউঁ'- জাত প্রথম পুরুষ একবচনের সর্বনাম পদ:

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, প্রথম পুরুষ সর্বনাম পদটির একবচনের মূল ধ্বনিরূপ- 'হাঁউঁ-অঁহ্ ক্'- এর আদ্যধ্বনি - 'হাঁউঁ'- থেকে প্রথম পুরুষের একবচনে মাত্র একটি

সর্বনাম পদ 'উ' (= সে, ও, তিনি) বিকশিত হয়েছে এবং এই 'উ' সর্বনাম পদটির ব্যুৎপত্তি হল-

(১) উ < হাঁ উ্ - অঁ হ্ঁ ক্ (প্রথম পুরুষ এক বচনের ব্যক্তি-নির্দেশক মূল ধ্বনিরূপ >হাঁ উঁ - অঁ অঁ > হাঁ উ্ > হাঁ উ > উ (= সে, ও, তিনি)।

*** 'হাঁ উ্'- ধ্বনিজাত প্রথম পুরুষ বহুবচনের সর্বনাম পদ:**

মাত্র দুটি - উনিখা ও উনিখান যেগুলির ব্যুৎপত্তি হল—

(১) <u>উনিখা</u> < উ + নিখা (প্রথম পুরুষ বহুবচনের প্রত্যয়) > উনিখা (ওরা/তারা-they)।

(২) <u>উনিখান</u> > উ + নিখা + নি (সমষ্টিবাচক প্রত্যয়) > উনিখানি > উনিখান (ওরা সবাই; all of them)।

**** অন্ত্যধ্বনি 'অঁ হ্ঁ ক্'-জাত প্রথম পুরুষ একবচনের সর্বনাম পদগুলির ব্যুৎপত্তি হল নিম্নরূপ:**

(১) অঁ < অঁ হ্ঁ ক্ > অঁ হ্ঁ > অঁ অ্ঁ > অঁ (= ও, সে)।

(২) অঁক্ (বিলুপ্ত) < -অঁ হ্ঁ ক্ > অঁ ক্ (= ও, সে)।

(৩) অঁকে < অঁক্ + এ (ব্যক্তি নির্দেশক গুরুত্বারোপক প্রত্যয়) > অঁকে * অঁকেঁ (নাসিক্যভবন) (= ওকে, তাকে)।

(৪) অঁ হঁ (বিলুপ্ত) < -অঁ হ্ঁ ক্ > অঁ হঁ (= ও, সে)

(৫) অঁহিঁ <-অঁ হ্ঁক্ > অঁ হঁ + ই (গুরুত্বারোপক ব্যক্তি-নির্দেশক প্রত্যয় > অঁ হিঁ (= ও-ই)।

(৬) অঁ ইঁ <-অঁ হ্ঁ ক > অঁ হিঁ > অঁ ইঁ (= ও-ই)।

(৭) অঁ হেঁ <-অঁ হ্ঁ ক্ > অঁ হঁ + এ (গুরুত্বরোপক ব্যক্তি-নির্দেশক প্রত্যয় > অঁ হেঁ (=ও-ই)।

(৮) অঁ হুঁ <-অ হ্ঁ ক্ > অঁ হঁ + উ (গুরুত্বারোপক ব্যক্তি নির্দেশক প্রত্যয় > অঁ হুঁ (উ = ও, he also)।

*** 'অঁ হঁ ক' ধ্বনিজাত প্রথম পুরুষ বহুবচনের পদগুলির ব্যুৎপত্তি:**

প্রচলিত প্রথম পুরুষের বহুবচনের সর্বনাম পদগুলি হল— অঁরা, অঁরানি, অঁক্‌রা/অঁখ্‌রা, অঁক্‌রানি/অঁখ্‌রানি, এবং এইগুলির ব্যুৎপত্তি হল নিম্নরূপঃ-

(১) <u>অঁরা</u> <-অঁ হ্ঁ ক্ > অঁ অঁ > অঁ + রা (বহুবচনাত্মক সাধারণ প্রত্যয়) > অঁরা (= ওরা, তারা)।

(২) <u>অঁরানি</u> <-অঁ হ্ঁ ক্ > অঁরা + নি (সমষ্টিবাচক বহুবচনের বিশিষ্ট প্রত্যয়) > অঁরানি (= ওরা সবাই, তারা সবাই; all of them)।

(৩) <u>অঁক্‌রা/অঁখ্‌রা</u> <- অঁ হ্ঁ ক্ > অঁ ক্ + রা/ অঁখ্ (মহাপ্রাণ 'হ্'-এর আগমের ফলে 'ক্' + 'হ' = খ্) অঁক্‌রা / অঁখ্‌রা (= ওরা, তারা)।

(৪) <u>অঁক্‌রানি / অঁখ্‌রানি</u> <-অঁ হ্ঁ ক্ > অঁ ক্ + রা / অঁ খ্ + রা) অঁক্‌রা + নি (সমূহবাচক বাহুবচনের বিশেষ প্রত্যয়) অঁক্‌রানি / অঁখ্‌রানি (= ওরা সবাই, তারা সবাই; all of them)।

*** প্রথম পুরুষ সর্বনাম পদের কারক-বিভক্তিগত বিভিন্ন রূপ:**

	কুড়মালি শব্দরূপ		কুড়মালি শব্দরূপের বঙ্গানুবাদ	
কারক	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
কর্তৃকারক	উ, অঁ, অঁহঁ, অঁহিঁ অঁহঁ, অঁহেঁ, অঁহুঁ	উনিখা, উনিখান, অঁরা, অঁরানি, অঁক্‌রা/অঁখ্‌রা, অঁক্‌রানি/অঁখ্‌রানি	ও, সে, তিনি উনি	ওরা তারা ওনারা
কর্ম ও সম্প্রদান কারক	উকেঁ (বিলুপ্ত), অঁকেঁ	উনিখাকে, উনিখানকে, অঁক্‌রাকেঁ / অঁখ্‌রাকেঁ, অঁক্‌রানিকেঁ / অঁখ্‌রানিকে, অঁরাকে, অঁরানিকেঁ	ওকে, তাকে, ওনাকে	ওদেরকে তাদেরকে ওনাদেরকে
করণ কারক	অঁর দারাজ অঁকর/অঁখর দারাজ 'উর' (বিলুপ্ত) দারাজ	অঁরাক(র) দারাজ, অঁরানিক(র) দারাজ অঁক্‌রাক(র) দারাজ/অঁখ্‌রাক(র) দারাজ অঁক্‌রানিক(র) দারাজ/অঁখ্‌রানিক(র) দারাজ উনিখাক(র) দারাজ, উনিখানক(র) দারাজ	ওর দ্বারা, তার দ্বারা ওনার দ্বারা	ওদের দ্বারা, তাদের দ্বারা, ওনাদের দ্বারা
	অঁর (বিলুপ্ত)তাঁই (এঁ) অঁকর তাঁই(এঁ) 'উর' (বিলুপ্ত), তাইএঁ অঁর (বিলুপ্ত) বুত(া) লেঁ	অঁরাক(র) অঁই(এঁ), অঁরানিক(র) তাঁইঁ(এঁ) অঁক্‌রাক(র) তাঁইঁ(এঁ)/অঁখ্‌রাক(র) তাঁইঁ (এঁ) অক্‌রানিক(র) তাঁই(এঁ)/অঁখ্‌রানিক(র) তাঁই(এঁ), উনিখাক(র) তাঁইঁ(এঁ) উনিখানিক(র) তাঁইঁ (এঁ) অঁরাক(র) বুত(া) লেঁ, অঁরানিক(র) বুত(া) লেঁ	ওর সামর্থ্যে তার সামর্থ্যে ওনার সামর্থ্যে	ওদের সামর্থ্যে তাদের সামর্থ্যে ওনাদের সামর্থ্যে

কারক	কুড়মালি শব্দরূপ: একবচন	কুড়মালি শব্দরূপ: বহুবচন	কুড়মালি শব্দরূপের বঙ্গানুবাদ: একবচন	কুড়মালি শব্দরূপের বঙ্গানুবাদ: বহুবচন
করণ কারক	অঁকর বুত(া) লেঁ 'উর' (বিলুপ্ত) বুতা (া) লেঁ (বিলুপ্ত)	অঁক্রাক(র) বুত(া) লেঁ/ অঁখ্রাক(র) বুত(া) লেঁ, অঁক্রানিক(র) বুত(া) লেঁ/ অঁখ্রানিক(র) বুত(া) লেঁ উনিখাক(র) বুত(া) লেঁ উনিখানিক(র) বুত(া) লেঁ	ওর সামর্থ্যে তার সামর্থ্যে ওনার সামর্থ্যে	ওদের সামর্থ্যে তাদের সামর্থ্যে ওনাদের সামর্থ্যে
	অঁর দেই(কে) অঁকর দেই(কে) 'উর' (বিলুপ্ত) দেইকে	অঁরাক(র) দেই(কে), অঁরানিক(র) দেই(কে) অঁক্রা(র) দেই (কে) /অঁখ্রাক(র) দেই(কে), অঁক্রানিক(র) দেই(কে)/অঁখ্রানিক(র) দেই(কে)	ওকে দিয়ে তাকে দিয়ে ওনাকে দিয়ে	ওদের দিয়ে, তাদের দিয়ে, ওনাদের দিয়ে
অপাদান কারক	অঁর (বিলুপ্ত) লেঁ অঁকর লেঁ 'উর' (বিলুপ্ত) লেঁ	উনিখাক(র) দেই(কে), উনিখানিক(র) দেই(কে) অঁরাক(র) লেঁ, অঁরানিক(র) লেঁ অঁক্রাক(র) লেঁ /অঁখ্রাক(র) লেঁ অঁক্রানিক(র) লেঁ/অঁখ্রানিক(র) লেঁ উনিখাক(র) লেঁ, উনিখানিক(র) লেঁ	ওর থেকে তার থেকে ওনার থেকে	ওদের থেকে, তাদের থেকে, ওনাদের থেকে
সম্বন্ধ	অঁর (বিলুপ্ত) অঁকর 'উর' (বিলুপ্ত)	অঁরাক(র), অঁরানিক(র) অঁক্রাক(র)/অঁখরাক(র) অঁক্রানিক(র)/অঁখ্রানিক(র) উনিখাক(র), উনিখানিক(র)	ওর, তার ওনার	ওদের, তাদের, ওনাদের

কারক	কুড়মালি শব্দরূপ		কুড়মালি শব্দরূপের বঙ্গানুবাদ	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
অধিকরণ কারক	অঁর (বিলুপ্ত) ভিতরেঁ	অঁরাক(র) ভিত্‌রেঁ, অঁরানিক(র) ভিত্‌রেঁ,	ওর ভিতরে, তার ভিতরে, ওনার ভিতরে	ওদের ভিতরে, তাদের ভিতরে, ওনাদের ভিতরে
	অঁকর ভিত্‌রেঁ	অঁক্‌রাক(র) ভিত্‌রেঁ/ অঁখ্‌রাক(র) ভিত্‌রেঁ, অঁক্‌রানিক(র) ভিত্‌রেঁ/ অঁখ্‌রানিক(র) ভিত্‌রেঁ		
	'উর'(বিলুপ্ত) ভিতরেঁ	উনিখাক(র) ভিত্‌রেঁ, উনিখানিক(র) ভিত্‌রেঁ		
	অঁর (বিলুপ্ত) মাঁঝেঁ অঁকর মাঁঝেঁ	অঁরাক(র) মাঝেঁ, অঁরানিক(র) মাঁঝেঁ, অঁক্‌রাক(র) মাঁঝেঁ/অঁখ্‌রাক(র) মাঁঝেঁ, অঁক্‌রানিকর(র) মাঁঝেঁ / অঁখ্‌রানিক(র) মাঁঝেঁ	ওর মাঝে তার মাঝে ওনার মাঝে	ওদের মাঝে তাদের মাঝে ওনাদের মাঝে
	'উর' (বিলুপ্ত) মাঁঝেঁ	উনিখাক (র) মাঁঝেঁ, উনিখানিক (র) মাঁঝেঁ		

২। কুড়মালি নির্দেশক সর্বনাম:(Kurdmali Demonstrative Pronouns)

কুড়মালি ভাষার নির্দেশক সর্বনাম পদগুলির সম্পর্কে কুড়মালি পুরুষবাচক সর্বনাম পদগুলির উদ্ভবের প্রাসঙ্গিক আলোচনার খেই ধরে সংক্ষেপে বলতে পারা যায় যে, বর্তমানে প্রচলিত কুড়মালি পুরুষবাচক সর্বনাম পদের উত্তম পুরুষের একবচনের পদ 'মঁ' / 'মঁই' (অর্থাৎ-'আমি') প্রভৃতি বিভিন্ন সমার্থক রূপের 'প্রাচীন মূলধ্বনিরূপ' (The Primary root sound form) হল- 'হ্ঁ। ম্ঁ - মঁ হ্ঁ' (আদি-মানব বক্তা ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা আত্ম-নির্দেশক মুখোচ্চারিত হাঁকা-ডাকা মূলক ধ্বনি)। অনুরূপভাবে বর্তমানে প্রচলিত মধ্যম পুরুষবাচক ও সর্বনাম পদের একবচনের পদ 'তঁ' / 'তঁই' অর্থাৎ- 'তুমি') প্রভৃতি বিভিন্ন সমার্থক রূপের প্রাচীন মূলধ্বনির রূপটি হল— 'হ্ঁ ত্ঁ- তঁ হ্ঁ' (আদি-মানব বক্তা ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা দ্বিতীয় আদি-মানববিশেষকে দল বাঁধার তাগিদে কাছে আসতে বলার জন্য ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি-নির্দেশক প্রথম বক্তা-ব্যক্তিটির দ্বারা মুখোচ্চারিত হাঁকা-ডাকামূলক ধ্বনি)। আর ঠিক এমনিভাবেই বর্তমানে প্রচলিত পুরুষবাচক সর্বনাম পদের একবচনের প্রথম পুরুষকে অর্থাৎ তৃতীয় আদি-মানববিশেষকেও দল বাঁধার নিমিত্ত কাছে আসতে বলার উদ্দেশ্যে প্রথম বক্তা আদি মানবের দ্বারা ঐ তৃতীয় আদি মানববিশেষকে নির্দেশিত করার জন্য তার মুখোচ্চারিত ডাকা-হাঁকার মূলধ্বনি রূপ- 'হাঁউঁ-অঁহ্ঁক্' থেকে বিকশিত হয়েছে প্রথম পুরুষের একবচনের- 'অঁ'/'অঁই' প্রভৃতি সমার্থক বিভিন্ন পদের।

বলাবাহুল্য এইভাবে একজন থেকে দুজনের এবং দুজন থেকে তিনজনের তথা তিনজন থেকে আরও অনেক জনের যখন একটি ছোট গোষ্ঠী বা দলের গঠন আদি মানবেরা করে তুলল তখন তারা একক একক পশুবৎ জীবনযাপনের স্তর অতিক্রম করে দলবদ্ধভাবে গোষ্ঠী জীবনযাপনের স্তরে পৌঁছে গেল। এই অবস্থায় তারা আত্মরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের কাজও দলবদ্ধ প্রচেষ্টায় করতে শুরু করল। বলাবাহুল্য এইভাবে পুরানো প্রস্তর যুগের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নব প্রস্তর যুগের সূত্রপাত ঘটল। অবশ্য এই অবস্থায় সে যুগের মানুষ যাযাবরের জীবন যাপন করত এবং ছোট ছোট গোষ্ঠীতে খাদ্য সংগ্রহের জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাদের যেতে হত বলে তৎকালীন আরণ্যক পরিবেশ, খাদ্যোপযোগী পশুপাখী, ফলমূল, গাছ-পালা-ঝোপঝাড়, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি সম্বন্ধেও তারা অনেক কিছু জানতে পারল। পশু-পাখীর নাম, এই সবের আকার প্রকার, রং-ঢং, স্বভাব, মুখের আওয়াজ প্রভৃতির অনুকরণে যেমন ঐগুলির নামকরণ হতে লাগল তেমনিভাবে গাছ-পালা, ফল-মূল প্রভৃতির নামকরণ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক সম্পর্কিত এদিক-ওদিক-সেদিক এটা-ওটা-সেটা প্রভৃতি নানান জিনিসকে নির্দেশিত করার জন্য

(for demonstrating everything) ধীরে ধীরে বিকাশ ঘটল নানান ধরণের কুড়মালি নির্দেশক সর্বনাম পদগুলির। আর এইভাবে বলতে পারা যায় যে কুড়মালি শব্দভান্ডারটিও প্রাকৃত (প্রকৃতি জাত) মৌলিক শব্দাবলীতে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল। কুড়মালি ভাষাটিই মূলতঃ হল 'প্রাকৃত ভাষা'। এই কুড়মালি প্রাকৃত ভাষাটিই একদা ব্রাত্যদেশীয় মগধ সাম্রাজ্যের রাজভাষা রূপে প্রচলিত থাকার কারণেই যে এটিকে 'মগধ প্রাকৃত' বলা হত সেকথাটিও তথ্যনির্ভর ও যুক্তিসঙ্গত। (প্রাসঙ্গিক আলোচনা যথাস্থানে করা হয়েছে)।

যাইহোক, কুড়মালি নির্দেশক সর্বনাম পদগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে প্রধানতঃ চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়। যথাঃ-

(ক) সাধারণ নির্দেশক সর্বনাম পদ (General demonstrative pronouns)

(খ) নিকট-নির্দেশক সর্বনাম পদ (Near demonstrative pronouns)

(গ) দূর-নির্দেশক সর্বনাম পদ (Far demonstrative pronouns) এবং

(ঘ) সম্বন্ধ নির্দেশক সর্বনাম পদ (Relative demonstrative pronouns)।

২.ক) কুড়মালি সাধারণ নির্দেশক সর্বনাম পদ:

কুড়মালি সাধারণ নির্দেশক সর্বনাম পদগুলির মধ্যে বহুলভাবে প্রচলিত পদগুলি হল প্রধানতঃ- এঁহিঁ / ই, এঁকর, অঁহিঁ, উ, অঁকর/অঁখর, জেঁ, জেঁ-জেঁ, জেঁহিঁ, জেঁহিঁ-জেঁহিঁ, জাঁকর, জাঁকর-জাঁকর, জাঁখর, জাঁখর-জাঁখর, তেঁ, তেঁ-তেঁ, তেঁহিঁ, তেঁহিঁ-তেঁহিঁ, তাঁকর, তাঁকর-তাঁকর, এঁহিঁ, এঁহেঁ, এহেঁগিলান, এঁহেঁগিলি (ন), অঁহেঁগিলি (ন) প্রভৃতি।

উপরোক্ত সাধারণ নির্দেশক সর্বনাম পদগুলির ব্যুৎপত্তি হল নিম্নরূপঃ-

(১) <u>এঁহিঁ</u> /ই < এঁ হিঁ > এঁ ইঁ / ইঁ > এঁহিঁ / ই (= এ, এই, ইনি)।

(২) <u>এঁকর</u> < এঁ হিঁ > এঁ ইঁ > এঁ ই > এঁ + কর (ব্যক্তি সম্বন্ধার্থক প্রত্যয় > এঁকর (= এর, এঁর, এঁনার)।

(৩) <u>অঁহিঁ</u> < অঁ হঁ (প্রথম পুরুষ একবচনের সর্বনামপদ) অর্থ- ও, ঐ, উনি।

(৪) <u>উ</u> < হাঁ উঁ্ - অঁ হ্ঁ ক্ (প্রথম পুরুষ একবচনের সর্বনাম পদের মূল ধ্বনিরূপ) > হ্াঁ উঁ্ - অঁ অঁ > হাঁ উ্ অঁ > হাঁউঁ > উঁ > উ (নাসিক্য ধ্বনিহীনতা) অর্থ- ও, সে, তিনি।

(৫) <u>অঁকর/অঁখর</u> < হ্াঁড়্ঁ - অঁ হ্ঁ ক্ > অঁ ক্ + র (সম্বন্ধ নির্দেশক বিভক্তি) > অঁকর > অঁখর(মহাপ্রাণ ধ্বনি- 'হ'- এর আগমের ফলে 'ক্' + 'হ' = খ)।

(৬) <u>জেঁ</u> < জঁন্ (ব্যক্তি, বস্তু আদি নির্দেশক সাধারণ সর্বনাম পদ) > জঁ + এ প্রত্যয় > জেঁ (= যে, যাহা)।

(৭) <u>জেঁ-জেঁ</u> ('জেঁ' ব্যক্তি, বস্তু নির্দেশক সর্বনাম পদটির দ্বিত্ব প্রয়োগ)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে দ্বিত্ব শব্দের ব্যবহার হল কুড়মালি ভাষার একটি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য।

(৮) জেঁইঁ > জেঁ (= যে, যিনি) + ই- প্রত্যয় (ব্যক্তি-নির্দেশক গুরুত্বারোপক প্রত্যয়) > জেঁইঁ ('ই' ধ্বনির নাসিক্যভবন)।
(৯) জেঁই-জেঁই (জেঁই সর্বনাম পদটির দ্বিত্ব প্রয়োগ)।
(১০) জাঁকর < জঁন্ (যে, যিনি/whomsoever) + কর (সম্বন্ধবাচক বিভক্তি) > জঁন্‌কর > জঁ কর > জাঁকর (যাহার)।
(১১) জাঁকর-জাঁকর (জাঁকর-সর্বনাম পদের দ্বিত্ব প্রয়োগ)।
(১২) জাঁখর < জাঁকর- সর্বনাম পদটির মহাপ্রাণতা)
(১৩) জাঁখর-জাঁখর (জাঁখর- সর্বনাম পদটির দ্বিত্ব প্রয়োগ)।
(১৪) তেঁ (একদা প্রচলিত, বর্তমানে বিলুপ্ত)।
কুড়মালি ভাষার প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদে পাওয়া যায়- 'জেঁ-জেঁ আইলা তেঁ-তেঁ গেলা'। অর্থাৎ,- 'যে যে এল, সে সে গেল'।
(১৫) তেঁ-তেঁ (অধুনা বিলুপ্ত দিত্ব শব্দ; অর্থ- যে যে, সে সে)
(১৬) তেঁই-তেঁই (বিলুপ্ত দ্বিত্ব সর্বনাম পদ; অর্থ- যে যে, সে সে।
(১৭) তাঁকর < তঁ -(প্র. পু. সর্বনাম একবচনের পদ) + কর (সম্বন্ধ ভাবার্থক কুড়মালি ভাষার বিশিষ্ট বিভক্তি) > তঁকর > তাঁকর (অর্থ- ওর, তার)।
(১৮) তাঁকর-তাঁকর (শব্দদ্বিত্ব, অর্থ- ওর ওর, তার তার)।
(১৯) এঁহঁ < এঁহ্ঁ (ব্যক্তি, বস্তু প্রভৃতি নির্দেশক সর্বনাম পদ। অর্থ- এ, এই, ইনি)।
(২০) এঁহেঁ < এঁহঁ + এ প্রত্যয় (ব্যক্তি নির্দেশক গুরুত্বারোপক প্রত্যয়) > এঁহেঁ (= এই-ই, ইনি-ই)।
(২১) এঁহেঁগিলা(ন) < এঁহেঁ + গিলা (ন)- বহুবচনাত্মক পুংলিঙ্গের প্রত্যয় > এঁহেঁগিলা (ন) (= এইগুলি)।
(২২) এঁহেঁগিলি(ন) > এঁহেঁ + গিলি (ন)- বহুবচনাত্মক স্ত্রী লিঙ্গের প্রত্যয় > এঁহেঁগিলি (ন) =এইগুলি।
(২৩) অঁহেঁগিলা(ন) < অঁহ্ঁ- (প্র. পু.এক বচনের সর্বনাম পদ) + গিলা (ন)।
(২৪) অঁহেঁগিলি (ন) : অহেঁগিলা (ন)-এর স্ত্রীলিঙ্গের রূপ * ঐগুলি।
(বহুবচনের পুংলিঙ্গের প্রত্যয়) > অঁহেঁগিলা (ন) - ঐগুলি প্রভৃতি।

২.খ) নিকট নির্দেশক সর্বনাম পদ:

বহুল প্রচলিত নিকট নির্দেশক কুড়মালি সর্বনাম পদগুলি হল- এঁইঁ, ই, এঁহেঁ, এঁহিঁ, হি, হিঁআঁ এঁহেঁগিলা (ন), এঁহেঁগিলি (ন), এঁকর, এঁকরাক (র), এঁখর, এঁখ্‌রাক (র), হিঁদেঁ, এঁহেঁঠিন, এঁথিঁ, এঁথাঁ, ইধির, এঁহেটো, এঁহেঁটি প্রভৃতি যেগুলির ব্যুৎপত্তি হল নিম্নরূপ-
(১) এঁইঁ < এঁ (ব্যক্তি-নির্দেশক সর্বনাম) + ই (গুরুত্ব, বিস্ময় আরোপক প্রত্যয়) >

এঁই > এঁইঁ ('ই' ধ্বনির নাসিক্যভবন) অর্থ- এই লোকটি।

(২) ইঁ < এঁ ইঁ > ইঁ > ই (> এই লোকটি); নাসিক্য ধ্বনিহীনতা।

(৩) এঁহেঁ < এঁ ইঁ + এ- প্রত্যয় (ব্যক্তি, বস্তু সম্পর্কিত গুরুত্বারোপক প্রত্যয়) > এঁহেঁ (=এই,ইনি-ই) সম্পর্কিত গুরুত্বারোপক প্রত্যয়) এঁহিঁ (এই-ই লোকটি, এই জিনিসটিই, এই স্থানেই)।

(৪) এঁহিঁ * এঁইঁ * ই -প্রত্যয় (ব্যক্তি, বস্তু, স্থান আদি সম্পর্কিত গুরুত্বারোপক প্রত্যয়) * এঁহিঁ (* এই লোকটিই, এই জিনিসটিই, এই স্থানেই)।

(৫) হিঁ < এঁ হিঁ > হিঁ > হি (= এই যে, এই তো)।

(৬) হিঁআঁ < এঁ হিঁ > হিঁ + আ (স্থান নির্দেশক প্রত্যয়) > হিঁআ > হিঁআঁ (নাসিক্যীভবন)।

(৭) এঁহেঁগিলা (ন) < এঁহেঁ + গিলা (ন)-বহুবচনের পুংলিঙ্গের প্রত্যয় > এঁহেঁগিলা (ন)। অর্থ: এগুলি, এইসব।

(৮) এঁহেঁগিলি (ন) < এঁহেঁ+ গিলি (ন)- স্ত্রী লিঙ্গের বহুবচনের সাধারণ প্রত্যয় > এঁহেঁগিলি (ন)। অর্থ: এগুলি, এইসব।

(৯) এঁকর < এঁ (= এই লোকটি) + কর সম্বন্ধার্থক বিভক্তি > এঁকর (অর্থ- এর, এই লোকটির)।

(১০) এঁক্‌রাক (র) < এঁকর + আ (নির্দিষ্টার্থক প্রত্যয়) > এঁক্‌রা + ক (র)-সম্বন্ধার্থক বিভক্তি > এঁক্‌রাক (র) - (অর্থ- এঁদের)।

(১১) এঁখর < এঁকর > এঁখর (মহাপ্রাণতা) অর্থ-এর।

(১২) এঁখ্‌রাক (র) < এঁকর + আ (নির্দিষ্টার্থক প্রত্যয়) > এঁকরা + ক (র) সম্বন্ধবোধক বিভক্তি > এক্‌রাক (র) > এঁখর্‌াক (র) (মহাপ্রাণতা), অর্থ- এঁদের।

(১৩) হিঁদে < এঁহেঁ (= এই) + দিগেঁ (= দিকে) > হিঁদেঁ (= এইদিকে)।

(১৪) এঁহেঁঠিন < এঁহেঁ (এই) + ঠিন্‌ (স্থান নির্দেশক বিশিষ্ট প্রত্যয় > এঁহেঁঠিন। অর্থ- এখানে।

(১৫) এঁথিঁ (এখানে) < এঁহেঁ + ঠিন > এঁহেঁঠিন > এঁঠিন > এঁথিন > এঁথিঁ (= এখানে)।

(১৬) এঁথাঁ < এঁথিন > এঁথ্‌ + আ (নির্দিষ্টার্থক প্রত্যয় > এঁথাঁ (নাসিক্যীভবন) = এখানে)।

(১৭) ইধির < এঁহিঁ + ধার (দিক) > হিঁধার > ইধার > ইধির (এইদিকে)।

(১৮) এঁহেঁটা < এঁহেঁ + টা (বড় আকারের জিনিস নির্দেশক পুংলিঙ্গের প্রত্যয় > এঁহেঁটা (এইটা, এটা)।

(১৯) এঁহেঁটি < এঁহেঁ + টি (ছোট জিনিস নির্দেশক (= স্ত্রী প্রত্যয় > এঁহেটি (=

এইটি, এটি)।

২.গ) দুর নির্দেশক সর্বনাম পদঃ

বর্তমানে কুড়মালিতে বহুল প্রচলিত দুর নির্দেশক সর্বনাম পদগুলি হল- অঁ, অঁরা, অঁরানি, অঁখ্‌রা, অঁখ্‌রানি, অঁহিঁ, অঁইঁ, অঁহঁ, অঁহেঁ, অঁহরা, অঁহঁটা, অঁহঁটি, অঁহেঁটা, অঁহেঁটি, অঁহঁগিলা (ন), অঁহঁগিলি (ন), হু, হুঁআঁ, উঁহাঁ, উধির, উধাইর, উ, উনিখা, উনিখান, হউটা, হাউটা, হউটি, হউঠিন, হাউঠিন, অঁহঁবাটেঁ, অঁহেঁবাটেঁ ইত্যাদি। দুর নির্দেশক উল্লিখিত সর্বনাম পদগুলির ব্যুৎপত্তি হল নিম্নরূপ:-

(১) অঁ (প্রথম পুরুষ একবচনের ব্যক্তি নির্দেশক সর্বনাম পদ) অর্থ- ঐ লোকটি।

(২) অঁরা < অঁ+রা (বহুত্ববোধক প্রত্যয়) > অঁরা (ওরা, তারা)।

(৩) অঁরানি < অঁরা + নি-প্রত্যয় (সমূহবোধক বিশিষ্ট প্রত্যয় > অঁরানি (ওরা সবাই; all of them)।

(৪) অঁখ্‌রা (প্রথম পুরুষ সর্বনাম পদের বহুবচনাত্মক রূপ); অর্থ- ওরা, তারা।

(৫) অঁখ্‌রানি (প্রথম পুরুষ সর্বনাম পদের সমূহবাচক বিশেষ প্রত্যয়); অর্থ- ওরা সবাই, all of them)।

(৬) অঁহিঁ < অঁহঁ + ই প্রত্যয় (স্থান, ব্যক্তি প্রভৃতি সম্পর্কিত গুরুত্ববোধক প্রত্যয় > অঁহিঁ। অর্থ- ও-ই লোকটি, ঐখানেই।

(৭) অঁইঁ < অঁ (প্রথম পুরুষ সর্বনাম পদের একবচনের ব্যক্তি নির্দেশক পদ) + ই প্রত্যয় > অঁইঁ (ও, সে)।

(৮) অঁহঁ (প্রথম পুরুষ সর্বনাম পদের একবচনের ব্যক্তি নির্দেশক রূপ)। অর্থ- ও, সে, উনি।

(৯) অঁহেঁ (প্রথম পুরুষ সর্বনাম পদের একবচনের ব্যক্তি নির্দেশক গুরুত্বারোপিত পদ)। অর্থ- ওই, উ।

(১০) অঁহঁরা < অঁহঁ (প্রথম পুরুষ একবচনের সর্বনাম পদ) + রা (বাহুবচনাত্মক প্রত্যয়) > অঁহঁরা (বিলুপ্ত)।

(১১) অঁহঁটা < অঁহঁ + টা প্রত্যয় (সাধারণ ভাববোধক পুংলিঙ্গের বস্তু নির্দেশক প্রত্যয়) > অঁহঁটা (ওটা)।

(১২) অঁহঁটি < অঁহঁ + টি (আদর ভাববোধক স্ত্রী লিঙ্গের বস্তু নির্দেশক প্রত্যয়) > অঁহঁটি (ওটি)।

(১৩) অঁহঁগিলা (ন) < অঁহঁ + গিলা (ন) (বহুবচনাত্মক পুংলিঙ্গের প্রত্যয়) > অঁহঁগিলা (ন)। অর্থ- ওগুলি।

(১৪) অঁহঁগিলি(ন) < অঁহঁ + গিলি (ন) (বহুবচনের স্ত্রীলিঙ্গের প্রত্যয় > অঁহঁ গিলি (ন)-ওগুলি।

(১৫) হু < অহঁ + উ (বস্তু, ব্যক্তি প্রভৃতি নির্দেশক প্রত্যয়) > অঁহুঁ > হুঁ > হু (নাসিক্যধ্বনি লোপ)। অর্থ- ঐ ত, ঐ যে।

(১৬) হুঁআঁ < হু + আ (নির্দিষ্টার্থক প্রত্যয়) > হুআ > হুঁআঁ (স্বতোনাসিক্যীভবন)। অর্থ-ওখানে।

(১৭) উঁহাঁ < হুঁআঁ > উঁহাঁ (ওখানে)।

(১৮) উধির < অঁহুঁ (প্রথম পুরুষ সর্বনাম পদের একবচনের 'দিক নির্দেশক পদ'। অর্থ- ও, ঐ) + ধাইর (দিক) > অঁহুঁধাইর > হুঁধাইর > উদাইর > উধির (ঐ দিকে)।

(১৯) উধাইর < অঁহুঁ + ধাইর > অঁহুঁধাইর > উধাইর। (অর্থ-ঐদিক)।

(২০) উ (= প্রথম পুরুষ সর্বনাম পদের ব্যক্তি নির্দেশক একবচনের পদ) অর্থ- ও, সে, he/she।

(২১) উনিখা < উ + নিখা (বহুবচনাত্মক প্রত্যয় > উনিখা) অর্থ- ওরা, তারা, They।

(২২) উনিখান < উনিখা + নি (সমূহবাচক বহুবচনের বিশিষ্ট প্রত্যয়) > উনিখনি > উনিখান। (ওরা সবাই; all of them)।

(২৩) হউটা < হাঁড়ঁ-অঁহ্ঁক্ (প্রথম পুরুষ সর্বনাম পদের একবচনের ব্যক্তি নির্দেশক মূল ধ্বনিরূপ)। > হাঁউঁ-অঁঅঁ > হাঁউ > হউ (নাসিক্যধ্বনিহীনতা) > হউ + টা (বড় আকারের কোন বস্তু নির্দেশক প্রত্যয়; পুংলিঙ্গ) > হউটা (= ঐটা)।

(২৪) হাউটা < হাউ্+টা> হাউটা (= ঐটা)।

(২৫) হউটি < হউ + টি (ছোট আকারের বস্তু নির্দেশক প্রত্যয়; স্ত্রীলিঙ্গ) > হউটি (=ঐটি)।

(২৬) হউঠিন < হউ + ঠিন (জায়গা নির্দেশক প্রত্যয়) > হউঠিন (= ঐ জায়গা)।

(২৭) অঁহেঁটা < অঁহেঁ + টা > (বড় আকারের বস্তু নির্দেশক প্রত্যয়)> অঁহেঁটা (ঐটি, পুংলিঙ্গ)।

(২৮) অঁহেঁটি < অঁহেঁ + টি > (ছোট আকারের বস্তু নির্দেশক প্রত্যয়) > অঁহেঁটি (ঐটি; স্ত্রীলিঙ্গ)।

(২৯) অঁহঁবাটেঁ < অঁহঁ + বাট (দিক নির্দেশক) + এ (সম্পর্কিত প্রত্যয়) অঁহঁবাটেঁ (ঐদিকে)।

(৩০) অঁহেঁবাটেঁ < অঁহেঁবাটেঁ (ঐদিকে)।

২.ঘ) সম্বন্ধ নির্দেশক সর্বনাম পদ:

কুড়মালি ভাষায় বহুল প্রচলিত সম্বন্ধ নির্দেশক সর্বনাম পদগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- জেঁ, জেঁইঁ, জাঁকর, জাঁক্‌রাক (র), জাঁখর, জাঁখ্‌রাক (র), জঁন্‌টা, জঁন্‌টি, জে, জেঁ-জেঁ, জেঁইঁ-জেঁইঁ, তেঁ, তেঁ-তেঁ, তেঁইঁ-তেঁইঁ, জঁন্‌গিলা (ন), জঁনগিলি (ন), মঁর, হাঁমঁর, হাঁম্‌রাক (র), হাঁম্‌রানিক (র), অঁকর, অঁক্‌রাক (র), অঁক্‌রানিক

(র), অঁখর, অঁখ্‌রাক (র), অঁখ্‌রানিক (র), তঁর, তঁহ্‌রাক(র), তঁহ্‌রানিক (র) প্রভৃতি ছাড়াও আরও নানান সম্বন্ধ নির্দেশক সর্বনাম পদের বহুল প্রচলন রয়েছে যেগুলির ব্যুৎপত্তি হল—

(১) জেঁ < জঁন্‌ (বস্তু,ব্যক্তি আদি সম্বন্ধিত সর্বনাম পদ) > জঁ + এ (নির্দিষ্টার্থক প্রত্যয়) > জেঁ (= যে, যাহা)।

(২) জেঁই < জেঁ + ই (ব্যক্তি নির্দেশক গুরুত্বারোপক প্রত্যয়) > জেঁইঁ (নাসিক্যীভবন)। অর্থ- যে কেউ।

(৩) জাঁকর < জঁন (যে, যিনি; whom soever) + কর (সম্বন্ধবোধক বিভক্তি) > জঁন্‌কর > জঁকর > জাঁকর (যাহার)।

(৪) জাঁক্‌রাক (র) < জাঁকর + আ (ব্যক্তি-নির্দিষ্টার্থক প্রত্যয় + ক (র) -ব্যক্তি নির্দেশক সম্বন্ধবোধক বিভক্তি > জাঁক্‌রাক (র), অর্থ- যাদের।

(৫) জাঁখর < জাঁকর > জাঁখর ('ক' ধ্বনির মহাপ্রাণতার ফলে 'ক' + র = খ)অর্থ- যার।

(৬) জাঁখ্‌রাক (র) < জাঁকর + আ (ব্যক্তি নির্দিষ্টার্থক প্রত্যয়) + ক (র) > জাঁক্‌রাক (র) > জাঁখ্‌রাক (র)। অর্থ- যাদের।

(৭) জঁন্‌টা < জঁন্‌ + টা (বড় আকারের জিনিস্‌ নির্দেশক পুংলিঙ্গের প্রত্যয়) > জঁন্‌টা (= যেটা)।

(৮) জঁন্‌টি < জঁন্‌ + টি (ছোট আকারের জিনিস নির্দেশক স্ত্রীলিঙ্গের প্রত্যয়) > জঁন্‌টি (=যেটি)।

(৯) জেঁ < জঁন্‌ + এ প্রত্যয় > জঁন্‌এ > জেঁ (যে, যাহা)।

(১০) জেঁ-জেঁ (জেঁ-সম্বন্ধার্থক সর্বনাম পদটি দ্বিত্ব প্রয়োগ)। অর্থ- যে-যে।

(১১) জেঁইঁ < জেঁ + ই-প্রত্যয় (ব্যক্তি নির্দেশক গুরুত্বারোপক প্রত্যয়) > জেঁই > জেঁই (= যে)।

(১১) জেঁইঁ- জেঁইঁ ('জেঁইঁ' সর্বনাম পদটির দ্বিত্বপ্রয়োগ)। অর্থ- যে-যে।

(১২) তেঁ < তঁ (মধ্যম পুরুষ সর্বনাম পদের একবচনের ব্যক্তি নির্দেশক পদ) + এ-প্রত্যয় > তএ > তেঁ। শাব্দিক অর্থ- 'তুমি'। এই 'তেঁ' পদটি বর্তমানে অপ্রচলিত।

(১৩) তেঁ-তেঁ < 'তেঁ' মধ্যম পুরুষ সর্বনাম পদের একবচনের দ্বিত্বপ্রয়োগ। শাব্দিক অর্থ- তুমি-তুমি।

(১৪) তেঁইঁ < তেঁ + ই-প্রত্যয় (ব্যক্তি-নির্দেশক গুরুত্বারোপক প্রত্যয়) > তেঁইঁ ('ইঁ' প্রত্যয়টির নাসিক্যভবন)। শাব্দিক অর্থ- 'তুমি'।

(১৫) তেঁইঁ-তেঁইঁ < 'তেঁইঁ' -এর দ্বিত্ব প্রয়োগ (শাব্দিক অর্থ:- তুমি-তুমি)।

বিঃদ্রঃ- উপরোক্ত সম্বন্ধ নির্দেশক 'তেঁ' সর্বনাম পদটি মূলতঃ হল কুড়মালি মধ্যম

পুরুষবাচক সর্বনাম পদের একবচনের পদ এবং এই 'তেঁ' এর অর্থ হল- 'তুমি'। কিন্তু এইই 'তুমি'-অর্থ- ব্যঞ্জক 'তেঁ' সর্বনাম নাম পদটির মুল অর্থটি পরিবর্তিত হয়ে আজ থেকে প্রায় হাজার খানেক বছর আগেই 'তুমি'র পরিবর্তে 'সে' (He/She) হয়ে গেছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমান পাওয়া যায় কুড়মালি ভাষার আদি নিদর্শন 'চর্যাগীতি পদাবলী' গ্রন্থ থেকে। চর্যাগীতি পদাবলীতে পাওয়া যায়-

'জেঁ-জেঁ আইলা তেঁ-তেঁ গেলা।'

অর্থ হল- 'যে-যে এল সে-সে গেল'। এইদিক দিয়ে বলতে পারা যায় যে, যেকোন ভাষায় প্রচলিত শব্দাবলীর মধ্যে কিছু কিছু শব্দের অর্থের পরিবর্তন কালানুসারে নানান কারণে ঘটে থাকে এবং এটি হল যেকোন জীবন্ত ভাষার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আর এই দিক দিয়ে যতদূর জানতে পারা গেছে তার অনুসারে জোর করে বলতে পারি যে, অন্ততঃ চর্যাপদগুলির রচনার সমসাময়িককালেই কুড়মালী ভাষাতে প্রচলিত মধ্যম পুরুষের একবচনের সর্বনাম পদ- 'তেঁ' এর মুল অর্থ 'তুমি' (You) পরিবর্তিত হয়ে প্রথম পুরুষের একবচনের সর্বনাম পদ— 'অঁ এঁ' (= সে; He/She)-এর স্থান গ্রহণ করেছিল বলেই চর্যাপদের মধ্যে 'সে-সে' অর্থে 'তেঁ-তেঁ' সর্বনামপদটির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য প্রসঙ্গতঃ একথাও সবিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এইভাবে যদিও জানতে পারা যায় যে আজ থেকে প্রায় হাজার খানেক বছর আগেও 'সে' অর্থে- 'তেঁ' সর্বনাম পদটির প্রচলন থাকলেও বতমানে এই শব্দটি বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু সে যাইহোক এরপর পূর্বকথাঃ-

(১৬) জঁন্‌গিলা (ন) <জঁন্ + গিলা (ন)- বহুবচনের (পুংলিঙ্গ) প্রত্যয় > জঁন্‌গিলা(ন) (=যেগুলি)।

(১৭) মঁর < মঁ (উত্তম পুরুষ একবচনের সর্বনাম পদ) + র = (সম্বন্ধ নির্দেশক বিভক্তি) > মঁর (= আমার)।

(১৮) হাঁমঁর < হাঁম (উত্তম পুরুষ একবচনের সর্বনাম পদ) + র- সম্বন্ধ নির্দেশক বিভক্তি) > হাঁমঁর (= আমার)।

(১৯) হাঁম্‌রাক (র) < হাঁমঁ + রা (বহুবচনাত্মক প্রত্যয়) > হাঁমঁরা > হাঁম্‌রা (= আমরা) + কর (সম্বন্ধ নির্দেশক বিভক্তি) > হাঁম্‌রাক (র) (= আমাদের)।

(২০) হাঁম্‌রানিক(র) < হাঁম্‌রা + নি (সমষ্টিবাচক বহুবচনের প্রত্যয়) + কর (সম্বন্ধ নির্দেশক বিভক্তি) > হাঁম্‌রানিক (র), অর্থ-আমাদের সকলের।

(২১) অঁকর < অঁ (প্রথম পুরুষ একবচনের সর্বনাম পদ) + কর (সম্বন্ধ নির্দেশক বিভক্তি) > অঁকর (= ওর, তার)।

(২২) অঁক্‌রাক(র) < অঁক্‌রা (প্রথম পুরুষ বহুবচনের সর্বনাম পদ); অর্থ- 'ওরা'(they) + কর (সম্বন্ধ নির্দেশক বিভক্তি > অঁক্‌রাক (র), অর্থ- ওদের, তাদের।

(২৩) অঁক্‌রানিক(র়) < অঁক্‌রা + নি (সমষ্টিবাচক বহুবচনের প্রত্যয়) + কর (সম্বন্ধ নির্দেশক বিভক্তি) > অঁক্‌রানিক (র়), অর্থ- ওদের সবার, তাদের সবার।

(২৪) অঁখর < 'অঁকর' - সর্বনাম পদটির মহাপ্রাণিত রূপ। অর্থ- ওর, তার।

(২৫) অঁখ্‌রাক(র়) < অঁক্‌রাক(র়) সর্বনাম পদটির মহাপ্রাণিত রূপ; অর্থ- ওদের, তাদের।

(২৬) অঁখ্‌রানিক (র়) < অঁক্‌রানিক (র়)-সর্বনাম পদটির মহাপ্রাণিত রূপ; অর্থ-- ওদের সবার, তাদের সবার।

(২৭) তঁর < তঁ (মধ্যম পুরুষ একবচনের সর্বনাম পদ) + র-সম্বন্ধ-নির্দেশক বিভক্তি > তঁর। অর্থ- তোর।

(২৮) তঁহঁর < তঁহ্‌ঁ (প্রথম পুরুষ একবচনের সর্বনাম পদ) + র সম্বন্ধ নির্দেশক বিভক্তি > তঁহঁর (= তোর)।

(২৯) তঁহ্‌রাক(র়) < তঁহঁরা (প্রথম পুরুষ বহুবচনের সর্বনাম পদ, অর্থ- 'তোমরা') + কর-সম্বন্ধ নির্দেশক বিভক্তি > তঁহঁরাক (র়) > তঁহ্‌রাক (র়); অর্থ- তোদের।

(৩০) তঁহ্‌রানিক(র়) < তঁহ্‌রা + নি (সমষ্টিবাচক বহুবচনের প্রত্যয়) + কর (সম্বন্ধ-নির্দেশক বিভক্তি) > তঁহ্‌রানিক (র়), অর্থ- তোদের সবার।

পরিশেষে, কুড়মালি ভাষাতে বহুল প্রচলিত নির্দেশক সর্বনাম পদের সম্পর্কে বলতে পারা যায় যে, আরও অনেক কুড়মালি নির্দেশক সর্বনাম পদের প্রচলন এতদ্‌ঞ্চলে যেখানে সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। তবে পরিতাপের বিষয় সবকিছুর আলোচনা করা বর্তমানে সম্ভব হল না।

(৩) অনির্দিষ্ট কুড়মালি সর্বনাম পদ:

কুড়মালি ভাষাতে বহুল প্রচলিত অনির্দিষ্ট সর্বনাম পদগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল—

কেঁহুঁ (= কেহ), কেঁহুঁ- কেঁহুঁ (= কেহু- কেহ), কেউ (= কেহ), কেউ-কেউ (কেহ কেহ), হেঁন-থেঁন (এটা-ওটা) প্রভৃতি। বিশদ আলোচনা এরপর আর নয়।

(৪) পরিমাণবাচক সর্বনাম পদ:

ক. কঠিনবস্তু সম্পর্কিত:

যথাঃ- কথুক (অল্প পরিমাণ), কথুক-কথুক (অল্প-অল্প পরিমাণ)।

খ. তরল পদার্থ সম্পর্কিত:

যথাঃ- রিচিক্‌ (খুবই সামান্য), রিচিক্‌-রিচিক্‌ ('রিচিক'-এর দ্বিত্ব প্রয়োগ), টুএক (অত্যল্প), টুএক-টুএক ('টুএক'-এর দ্বিত্ব প্রয়োগ), টুকু (অল্প), টুইক্‌চা (অত্যল্প), এত্‌না/এত্‌লা(এতটা), অত্‌না /অত্‌লা (অতটা), কত্‌না/কত্‌লা (কতটা) প্রভৃতি।

(৫) প্রশ্নাত্মক সর্বনাম পদ:

যথাঃ- কন্ (কে?), কঁনেঁ (কে?), কঁন্-কঁন্ (কে-কে?), কঁনে-কঁনে (কে-কে?), কাহে (কেন?), কাক্‌রাকেঁ (কাদেরকে?), কাখ্‌রাকেঁ ('কাক্‌রাকেঁ' সর্বনাম পদের মহাপ্রাণিত প্রয়োগ, অর্থ- 'কাদেরকে'), কঁন্‌টা (কোনটা? পুং), কঁন্‌টি (কোনটি? স্ত্রী) কঁনগিলা(ন) (কোনগুলি-পুং), কঁনগিলি(ন) (কোনগুলি, স্ত্রী), কাঁহাঁ (কোথায়?), কাঁহাঁ-কাঁহাঁ (কোথায়-কোথায়?), কঁদেঁ (কোনদিকে?), কঁদেঁ-কঁদেঁ (কোন কোন দিকে?), কঁন্‌ঠিন (কোথায়), কাহে (কেন?), কাকর (কার?), কাক্‌রা/কাখ্‌রা (কারা?), কাক্‌রাক(র)/কাখ্‌রাক(র) (কাদের?), কাকেঁ (কাকে), কাকেঁ- কাঁকেঁ (কাকে-কাকে) প্রভৃতি।

(৬) সীমানাবাচক কুড়মালি সর্বনাম পদ:

যথাঃ- কাঁহাঁতক্ (কতদূর পর্যন্ত), হিঁআঁতক্ (এতদূর পর্যন্ত), হুঁআঁতক্ (ঐখান পর্যন্ত), কঁন্‌ঠিনতক্ (কতদুর পর্যন্ত), কঁন্‌ঠিনলেঁ (কোনস্থান থেকে), এঁহেঁঠিনলেঁ (এই স্থান থেকে), কাঁহাঁলেঁ (কোন্ স্থান থেকে), অঁহেঁঠিনলেঁ (ঐ স্থান থেকে), জঁনঠিনলেঁ (যেখান থেকে) প্রভৃতি।

(৭) সমষ্টিবাচক সর্বনাম পদ:

সমূহবাচক সর্বনাম পদ রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে মূলতঃ একটি, যথা- সভ্ (সকল/সব), সভেঁ (সবাই), সভেঁকাই (সবাই) পদটি।

(৮) আত্মবাচক সর্বনাম পদ:

আত্মবাচক সর্বনাম পদও মূলতঃ হল একটি, যথা- আপন্ (নিজ), আপনেঁই (নিজ থেকেই), আপ্‌না-আপ্‌নিই (নিজে-নিজেই), আপন্-আপন্(নিজ-নিজ) প্রভৃতি।

মন্তব্য:-

পরিশেষে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হল- বর্তমানে কুড়মালি ভাষাতে প্রচলিত পুরুষবাচক উত্তম পুরুষের একবচনের ব্যক্তি-নির্দেশক সর্বনাম পদ 'মঁ' (আমি), মধ্যম পুরুষের একবচনের ব্যক্তি-নির্দেশক সর্বনাম পদ- 'তঁ' (তুমি), এবং প্রথম পুরুষের একবচনের সর্বনাম পদ- 'অঁ' (সে) -এই তিনটিই মূলতঃ হল নাসিক্যধ্বনি (Nasal-Sound)। আর তাই এই তিনটির উচ্চারণও নাকিসুরে হাল্‌কাভাবেই করা যায়। বলাবাহুল্য আমরা যখন দু-চার জন একসঙ্গে গল্প-গুজব করি তখন 'মঁ', 'তঁ', 'অঁ' এই সর্বনাম পদ তিনটির উচ্চারণও নাকিসুরেই মিহিভাবে করে থাকি। কিন্তু যখনই আমরা দুরস্থিত কাউকে চীৎকার করে সজোরে ডাকা-হাঁকা করি তখন আর গল্প-গুজব করার মত নাকিসুরে ডাকলে কাজ চলে না। আর এইভাবে বাস্তব ও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে আমার যুক্তি-নির্ভর অনুমান হল- দল বাঁধার তাগিদে আমাদের পূর্বপুরুষ আদি-মানবেরাও 'মঁ' (আমি), 'তঁ' (তুমি) এবং 'অঁ' (সে) অল্পপ্রাণ

পুরুষবাচক সর্বনাম পদগুলির ব্যবহার হাল্‌কাভাবে নাকিসুরে না করে চীৎকার করে সজোরে যখন ডাকা-হাঁকা করেছিল তখন নিশ্চয়ই 'মঁ' (আমি) এর উচ্চারণটি হয়ে পড়েছিল মহাপ্রাণিত ('হ্‌' ধ্বনিযুক্ত)- 'হাঁম্‌-মঁহ্‌' (আমি)। অনুরূপভাবে অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'তঁ' (= তুমি)- এর উচ্চারণটি হয়ে পড়েছিল মহাপ্রাণিত 'হঁতৃ-তঁহ্‌' (= তুমি)। আবার এইভাবেই অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'অঁ' (= সে) -এর উচ্চবারণও হয়ে পড়েছিল মহাপ্রাণিত- 'হাঁউ'-অঁহ্‌ক্‌ (=সে)। আর এইভাবেই কুড়মালি ভাষার পুরুষবাচক সর্বনাম পদগুলির উদ্ভব ঘটেছে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। প্রসঙ্গতঃ সংক্ষেপে আরও বলতে পারি যে কুড়মালি পুরুষবাচক সর্বনাম পদগুলির উদ্ভবের সূত্র ধরেই কুড়মালি ভাষাটিরও উদ্ভব ঘটেছে। আর তাছাড়া কুড়মালি পুরুষবাচক সর্বনাম পদ তিনটিরই ভাষাছাঁদ বা স্বরূপ স্বতোদ্ভূত ও সহজাত নাসিক্যধ্বনি যুক্ত হওয়ার কারণেই কুড়মালি ভাষাটিও স্বাভাবিক কারণেই হয়ে উঠেছে 'নাসিক্যধ্বনিপ্রবণ ভাষা'। সত্যি কথা বলতে কি নাসিক্যধ্বনিহীন কুড়মালি ভাষার কথা চিন্তাই করা যায় না।

যাইহোক 'কুড়মালি সর্বনাম পদ পরিক্রমা' নামক বিষয়টির আলোচনা প্রসঙ্গে আমি যেটুকু জানতে পেরেছি তারই অকপট খোলাখুলি অভিব্যক্তি তুলে ধরলাম। তবে এই ক্ষেত্রে খোলা মনে স্বীকার করি যে, আলোচনার বিষয় এবং আলোচনার পদ্ধতি দুটিই হল একেবারে নতুন ধরণের অদ্যাবধি অনালোচিত একটি দিক। আর তাই আমি একথাও স্বীকার করছি যে, যেহেতু, অজানাকে জানার জন্য অজানা পথে আমাকে চলতে হয়েছে তাই ভুল-ভ্রান্তি হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে পন্ডিত মহলে তর্ক-বিতর্কের ঝড় উঠাই স্বাভাবিক। উঠুক, তবে এই তর্ক-বিতর্কের ঝড়টা সুধীজনোচিত ও ভ্রান্তিবিমোচনকারী হওয়াই হবে আমার একান্ত কাম্য ও বাঞ্ছনীয়। কারণ, তার ফলে আমার অজ্ঞাত –অজানিত তথ্যাদি যেমন জানা হয়ে যাবে তেমনি পরবর্তীকালে বিষয়টির আলোচনাতে সংযোজন-বিয়োজনও অনায়াসেই করে নিতে পারব। এই মহৎ আকাঙ্খার সঙ্গে আমার কথা শেষ করলাম। ভালোমন্দের বিচারের ভার সুধীজনের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

কুড়মালি ভাষা পরিচয়

ছত্রমোহন মাহাত

ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িষা, ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড়, আসাম ও রাজস্থান হয়ে ত্রিপুরা পর্য্যন্ত সব মিলিয়ে প্রায় দেড় কোটি মানুষ কুড়মালি ভাষায় কথা বলেন। ভারতের বাইরে বাংলাদেশেও কুড়মালি ভাষার প্রচলন রয়েছে। ভারতে দেড় কোটি কুড়মালি ভাষাভাষি মানুষের হিসাব সরকারি জনগণনার রিপোর্টে পাওয়া যাবে না। তার বড় কারণ, এই দেড় কোটির মধ্যে অনেকেই উচ্চ শিক্ষিত, মধ্য শিক্ষিত নিম্ন শিক্ষিত, নব স্বাক্ষর এবং নিরক্ষরও আছেন। কিন্তু তথাপি তাঁদের অজ্ঞতার কারণে জনগণনার সময় তাঁরা তাঁদের ভাষা কুড়মালি না লিখিয়ে থাকেন। সেকারণে সরকারি পরিসংখ্যানে কুড়মালি ভাষাভাষি মানুষের সংখ্যা অনেকটাই কম। যেমন- সারনা ধর্মের মানুষ রিপোর্টে পাওয়া যায় না। অথচ, ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ সারনা ধর্ম নিষ্ঠার সাথে পালন করছেন, যুগ যুগ ধরে। বাস্তবে দেখা যায় কুড়মি অধ্যুষিত এলাকায় সমস্ত রকম জাতির মানুষের ভাব প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম কুড়মালি ভাষা। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া,পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী কুড়মালি ভাষার মানুষের সংখ্যা ৪১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮৭ জন। শতাংশের হিসাবে মোট জনসংখ্যার ৪৬ শতাংশ। সাঁওতালদের জনসংখ্যা ২০ লক্ষ ৩৫ হাজার। মোট জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ। সাঁওতালি ভাষাভাষি মানুষও কুড়মালি ভাষায় কথা বলেন। বাকিদের মাতৃভাষা অন্য হলেও কুড়মালি ভাষাতেই কথা বলেন। দেখা যায় জঙ্গলমহলের বাউরি, বাগদি, হাড়ি, ডোম, নাপিত, ধোপা, লোধা, শবর, মুন্ডা, ময়রা, মুদি, তাঁতি,কামার, কড়া, দেশোয়ালি, ভুঁইঞা, ভূমিজ, মুচি, মেথর, ঘাসি, কেঁওট, বাগাল, গোয়ালা, মাহাত, রাজোয়াড়, সাঁওতাল, মাহালি, বেনে, ছুতার, ব্রাহ্মণ, মুসলমান ইত্যাদি জাতিগুলির ১০০ শতাংশ মানুষ কুড়মালি ভাষায় কথা বলেন। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম

জেলা সহ এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ কুড়মালি ভাষায় কথা বলে থাকেন।

এত বেশি সংখ্যক মানুষের ভাষা কুড়মালি হলেও তা শ্রুতি সাহিত্যরূপেই রয়ে গেছে। হাজার হাজার বছর ধরে উপেক্ষিত হয়ে ব্রাত্যই থেকে গেছে কুড়মালি ভাষা অথচ, এই ভাষার অফুরন্ত ভান্ডার তার ব্যবহারিক শব্দ, প্রবাদ-প্রবচন, ঝুমইর গীত, ছড়া, মাহারাই গীত, অহিরা গীত, টুসু গীত, বিহা গীত, ফড়ই, কহনি, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই অর্থে কুড়মালি ভাষার আলোচনা বা চর্চা, গবেষণা বিশদে তো নয়ই নজরে পড়ার মতো হয়নি। আঙ্গুল গোনা কয়েক জন কুড়মি পন্ডিত সাহিত্য চর্চা ও আলোচনা করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে সৃষ্টিধর মাহাত, আনন্দ খুঁটদার, কেশব মাহাত, লক্ষীকান্ত মাহাত, বিভূতি মাহাত, বুচন মাহাত, ডঃ পশুপতি প্রসাদ মাহাত প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে কিরীটি মাহাত, অনন্ত মাহাত, শ্রীপদ মাহাত, চারিয়ান মাহাত, সৃষ্টিধর মাহাত, সাধন মাহাত, ক্ষুদিরাম মাহাত, উপেন মাহাত, জয়দেব মাহাত, সুনীল মাহাত, কৃষ্ণপদ মাহাত, অনাদিনাথ মাহাত, শক্তিপদ মাহাত, শম্ভুনাথ মাহাত, জ্যোতিলাল মাহাত (পুরুলিয়া) এবং ডঃ বিনাপানী মাহাত (জামশেদপুর), ক্ষিতীশ মাহাত (দিনাজপুর) ও সঞ্জীব মাহাত, সমীর মাহাত, জয়ন্ত মাহাত, মঙ্গল মাহাত (ঝাড়গ্রাম) প্রমুখ ব্যক্তিগণ কুড়মালি ভাষার ও সংস্কৃতি সাহিত্য চর্চা করে চলেছেন।

কুড়মালি লিপি (হরফ) তৈরী করেছেন লক্ষীকান্ত মাহাত (ধানবাদ), স্বপন মাহাত (পুরুলিয়া) এবং জয়ন্ত মাহাত (ঝাড়গ্রাম)। বিদগ্ধ পন্ডিতদের মধ্যে বিচার বিশ্লেষণ চলছে। যেটি অধিক মাত্রায় সহজ সরল ও বিজ্ঞানসম্মত মনে হবে সে লিপিই গৃহীত হবে। বর্তমানে বাংলা লিপি, ভাষা কুড়মালি, এভাবেই লিখিত গ্রন্থ প্রকাশের কাজ চলছে। কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে পন্ডিতগণ গবেষণামূলক চর্চায় নিবিষ্ট। সঞ্জীব মাহাত এর বিজ্ঞানসম্মত দিকের অনুসন্ধান করে চলেছেন। শম্ভুনাথ মাহাত "ভাঁউঅর" নামে কুড়মালি ব্যাকরণ রচনা করে প্রকাশ করেছেন। কিরীটি মাহাত তাঁর "ঝুমুর ও চর্যাপদ" এবং "সিন্ধু সভ্যতার ভাষা ও কুড়মালি" নামে দুইটি গ্রন্থ প্রকাশ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রমান করেছেন যে, চর্যাপদ হলো কুড়মালি ভাষার পূর্ববর্তী রূপ অর্থাৎ কুড়মালি ভাষা চর্যাপদের জননী। কুড়মালি থেকে চর্যাপদের জন্ম। তাঁর "আদি চর্যাপদ" গ্রন্থটি বর্তমান ২০২১ সালে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে কুড়মালি ভাষার প্রাচীনত্ব বিশদে জানা যাবে। এই ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে "মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি" নামে একটি প্রকাশন সংস্থা স্থাপিত হয়েছে।

বর্তমানে সিধু-কানহু-বিরসা বিশ্ব বিদ্যালয় (পুরুলিয়া)-তে কুড়মালি ভাষায় পঠন পাঠন শুরু হওয়ায় এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে স্বীকৃতি পাওয়ায় এই ভাষার চর্চা

অনেকগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিপূর্বে পঠন-পাঠন ব্যবস্থা না থাকায় শ্রুতির আকারে বেঁচেছিল এই ভাষা তার নিজ গরিমায়। মুদ্রিত গ্রন্থ ছাড়াই হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকার কারণ অনুসন্ধান করছেন কুড়মালি ভাষা বিজ্ঞানীগণ। বর্ত্তমানে মুদ্রিত গ্রন্থে এই ভাষার বিকাশ সাধন ঘটছে নিঃসন্দেহে। শিক্ষিত মহলও মনোনিবেশ করছেন কুড়মালি ভাষায় সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে এর বহুমুখী দিক উন্মোচনের জন্য।

আমি কোন রকম ভাষাবিদ, ভাষা বিশারদ বা ভাষা গবেষক কোনটাই নই। তার অর্থ এই নয় যে, আমি আমার মাতৃভাষা সম্পর্কে ভাবতে পারব না বা গবেষণা করতে পারব না। আমি জানি, এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে লোকটা এম.এ. পাশ করেছিল তার সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করেছিলেন যিনি, সেই মহান ব্যক্তি এম.এ. পাশ ছিলেন না। অতএব নমিনেটেডে রিসার্চার না হয়েও গবেষণা করা যায়, যেতেই পারে। অন্তত খনি থেকে মণি তুলে আনার ন্যায় গবেষণার রশদ জোগান দেওয়ার মত করে।

আমরা শুনি। শুনতে পাই। শুনেওছি। আমাদের মা-বোনেরা প্রায়শই একটা কথা বলে থাকে যে, রান্না করতে হাঁড়ির সব ভাত ছুঁয়ে দেখার দরকার হয় না। একটা ভাত টিপে দেখলেই হাঁড়ির সম্পূর্ণ ভাতের অবস্থার খবর বলে দিতে পারি। কুড়মি তথা খেরওয়াড় মহিলারা কবে কোন সময় থেকে তাঁদের এই অভিজ্ঞতার কথা বলে আসছে তা জানা যায় না। যতদুর জানা যায়, তার অনেক পরে লিখিত আকারে অনুরূপ একটা কথা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদের অন্তর্গত মাধব নিদান (মাধব নিদানম্) গ্রন্থে বলা হয়েছে—

সামন্যে তু বিশেষার্ত্তু জৃম্ভাত্যর্থং সমীরনাৎ।
পীত্বান্নয়োঁদাহং কপাদন্নারুচির্ভবেৎ।।

অর্থ: শরীরের সামান্য লক্ষন (রোগের পূর্বরূপ) দেখে রোগের কারণ সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া যায় এবং তা সুনিশ্চিত বলে দেওয়া যায়। যেমন, "জৃম্ভা বা জৃম্ভন" অর্থে হাই। ঘন ঘন হাই তুললে সমীরণ অর্থাৎ বায়ু প্রকুপিত হয়েছে বুঝতে হবে। "পীত্বান্নয়োর্দাহং" অর্থাৎ চোখে প্রদাহ সৃষ্টি হলে পীত্ব ঘটিত রোগ এবং "কফাদন্নারুচির্ভবেৎ" অর্থে আহারে অরুচি হলে কফের বিকার জনিত রোগ বুঝতে হবে। আয়ুর্বেদ মতে কফ, পীত্ব, বায়ুর সাম্যতাই শারীরিক সুস্থতা ও বৈষম্যই অসুস্থতার হেতু।

পৃথিবীর যেকোন ভাষা সম্পর্কে বিশেয ধারণা পেতে হলে সেই ভাষার নিম্নতম (কমপক্ষে) একটি শব্দ, একটি বাক্য, একটি বস্তুর নাম ও অন্তত একটি মাত্র প্রবাদ-প্রবচন সম্পর্কে সম্যক জানতে পারলেই সেই ভাষার গভীরতা ও অর্থবহ দিক

সম্বন্ধে বিশদে ধারণা পাওয়া যাবে। আলোচ্য কুড়মালি ভাষার এরকম একটি শব্দ-কাটা।

ইংরাজী ভাষায় কিছু শব্দ (Word) আছে যে শব্দগুলির পূর্বে অন্য একটি ছোট শব্দ বসলে শব্দটির অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যায়। যেমন-

Social- সমাজ, সামাজিক, সামাজিকতা।

Anti Social - সমাজ বিরোধী, অসামাজিক।

Edible- ভোজ্য, খাদ্য।

Non বা Inedible - অভোজ্য, অখাদ্য, Not fit to be eaten.

Coplete - সম্পূর্ণ, সমাপ্ত, অখন্ড।

Incomplete - অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত, Not finished or Perfect.

Necessary - আবশ্যক, প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য্য।

Un-necessary- অনাবশ্যক, নিষ্প্রয়োজন, পরিহার্য্য।

Government - সরকার।

Non-governmet - বেসরকারি।

কুড়মালি ভাষায় অনেক শব্দ আছে যে শব্দগুলির পূর্বে একটি বসলে তার অর্থ অন্য রকম হয়ে যায়। যেমন-

<u>কাটআ (কাটা)</u>

অরিক কাটআ: ভিত খনন করা।

আইড় কাটআ: জমি বা বাঁধ পুকুরের পাড় খনন করে কেটে দেওয়া।

আগ কাটআ: কোন আদেশ, নির্দেশ বা পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তা নাকচ করা, শষ্যে বেতন (বেরহুন) দেওয়ার পূর্বে শষ্যের অগ্র অংশ রেখে নেওয়া, শীর্ষ বা শীর্ষ অংশ কাটা, অগ্রভাগ কেটে ফেলা, নির্দেশ বা আদেশ পালন না করা, আদেশ অমান্য করা।

আড়এ কাটআ (আড়ে কাটা): প্রস্থে ছেদন করা, আড়ালে কাটা।

আঁক কাটআ : রেখা টানা, রেখাপাত করা, আঁকিবুকি করা, দাগ দেওয়া, চিহ্ন দেওয়া।

আঁতর কাটআ (আঁতর কাটা): লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণের একক সৃষ্টি করা।

উঁদউর কাটআ (উঁদুর কাটা): আদেশ অমান্য করা, কথার দ্বারা (যুক্তি দ্বারা) কথাকে বাতিল করা, বাক্য দ্বারা বক্তাকে অপ্রতিভ করা, বক্তার বক্তব্যকে খন্ডন করা।

করআত কাটআ (করাত কাটা): করাত দ্বারা কাটা, করাতে কাটা।

কান কাটআ: দক্ষতায় পরাস্ত করা, অপ্রতিভ করা।

কাল কাটআ: দিনাতিপাত করা, সংসার করা, সময় অতিবাহিত করা।

কাঁটআ কাটআ (কাঁটা কাটা): বঁড়শি নির্মান করা, কাঁটা দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হওয়া,

বেড়া দেওয়ার জন্য কাঁটাযুক্ত ডাল কাটা।

কু-কাটআ: অশুভ নাশ করা, অশুভকে বিতাড়িত করা, অশুভ শক্তির বিনাশ সাধন করা।

কুঁআ কাটআ (কুঁয়া কাটা): কূপ খনন করা, কুয়া খুঁড়া।

খাদি কাটআ: মুষ্ঠি প্রমান মোটা গাছ বা ডালকে দেড়-দুই হাত লম্বা মাপে টুকরা অর্থাৎ খন্ড খন্ড করে কেটে জ্বালানির জন্য প্রস্তুত করা।

খাপ কাটআ: অস্ত্র দ্বারা কেটে ঘাট তৈরি করা, সমান্তরালভাবে সমন্বয় না হলে একটার পর আরএকটার উঁচু নিচু দৃষ্টি গোচর হওয়া, চুলের ভাঁজ সৃষ্টি করা বা হওয়া, অসামঞ্জস্য, অসমান থাকা, খাঁজ কাটা।

খাসি কাটআ: খাসি ছাগল কাটা, ছাগল খাসির মাংস কাটা।

খাঁজরি কাটআ: অস্ত্র দ্বারা খাপ কাটার ন্যায় ছোট ছোট ঘাট তৈরী করা, খাঁজ কাটা, খাপ এর ছোট রূপ করা।

গলা কাটআ (গলা কাটা): গলদেশ কর্ত্তন করা, কণ্ঠদেশ ছেদন করা।

গার কাটআ: আঁচড় দ্বারা অল্প গর্ত্ত হয়ে দাগ হওয়া, জলের মৃদু স্রোতে মাটি ক্ষয় হয়ে যে সামান্য গর্তের লম্বা রেখার মত দেখা যায় তাহা, কোন সচল বস্তুর ঘর্ষণে দ্বিতীয় বস্তুতে সরু রেখার মত গর্ত সৃষ্টি আঙ্গুলের রেখার ন্যায় রেখা উৎপন্ন করা।

গাঁইট কাটআ(গাঁইট কাটা): গাঁট কাটা, গন্থি ছেদন করা, গাঁট মোট অর্থাৎ তল্পিতল্পা অপহরণ করা।

গিত কাটআ: গীত অর্থাৎ গান গাওয়ার কায়দা, শ্রোতা এবং বাদককে বুঝিয়ে দিয়ে গান শেষ করা, গানের সুর বা তাল কেটে যাওয়া অহে বেতাল হওয়া, গানের তাল ভঙ্গ হওয়া, গানের কলি ও গতি পরিবর্তনের পূর্বে তেহাই বাদ্যের প্রয়োগ দ্বারা গান রাখা।

গুটি কাটআ: ঘুঁটি পক্ষে আসা, ভাগ্যোদয় হওয়া জুয়া খেলার মত অর্থকরী খেলায় স্বপক্ষে ঘুঁটির রায় দেওয়া, বাঘচাইল (বাঘ ছাগল), অসটা প্রভৃতি খেলায় খেলার নিয়মে পরাজিত প্রতিপক্ষের গুটি ছক থেকে তুলে নেওয়া।

গুহাইলে ঢুকাঞ ন্যাজ কাটআ: নিমন্ত্রণ করে এনে অপমান অপদস্থ করা।

ঘর কাটআ: খেলার ছক আঁকা, একই আদর্শে বিভাবিত ও পরিচালিত পরিবারকে ভিন্ন আদর্শে প্রভাবিত ও প্ররোচিত করে স্বপক্ষে আনা, রেখা টেনে ছক উৎপন্ন করা।

ঘরআ কাটআ(ঘরা কাটা): ক্ষয় হতে হতে বড় গর্ত্ত সৃষ্টি হওয়া, মুখ সুরু অথচ ভিতর ফাঁপা গর্ত হওয়া।

ঘাঁস কাটআ: ঘাস কাটা, ঘাস ছাঁটা।

চাইল কাটআ: স্থির জলে মাছ খেলা করলে জলের তরঙ্গে মাছের অস্তিত্ব অনুভব অনুভূতি জলে ঢেউ তুলে মাছের অন্যত্র গমন, অসটা ইত্যাদি খেলায় ঘুঁটি পাতন ও পতন।

চাইলসা কাটআ: চোখের ঝাপসা দৃষ্টি নিরাময় হওয়া।

চাহাল কাটআ: অস্তিত্বের অবস্থান জ্ঞাতকরণ, অস্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করা, অবস্থান জানন দেওয়া।

চুইল কাটআ(চুল কাটা): চুল কাটা, চুল ছাঁটা।

চুটকি কাটআ: মানত উৎসর্গ করার পর মানতের উদ্দেশ্যে রাখা শিখা ছেঁটে ফেলা।

চুহুল কাটআ: নড়াচড়া করা, সাড়া-শব্দ দেওয়া, সজাগ সচেতনতার পরিচয় দেওয়া।

চুড়ি কাটআ: নাট বা বোল্ট এর চুড়ির ন্যায় চুড়ি নির্মাণ করা, নাট বা বোল্ট এর চুড়ি বিনষ্ট হওয়া।

চেলি কাটআ: ঘাসযুক্ত ভিজা মাটির চাপড়া কেটে তুলা, চাপড় (মাটির) কাটা।

ছানি কাটআ: বিচালি কাটার লৌহ পাতি, বিচালি কাটার যন্ত্র, গবাদি পশুখাদ্য তৈরীরর জন্য খড় কেটে ছোট ছোট টুকরা করা, খড়কে পশুখাদ্য করার জন্য কাটা, চোখে ছানি পড়লে চোখে অস্ত্রোপচার করা, চোখের ছানি অপসারণ করা।

ছালি কাটআ: সর ছিঁড়ে যাওয়া, সর সৃষ্টি হওয়া, দুধ থেকে সর পৃথক করা।

ছাঁইরা কাটআ(ছাঁঞরা কাটা): ছায়া (পর্য্যন্ত) না মাড়ানো, মুখোমুখি বা কাছাকাছি হওয়া দুরের কথা, ছায়াও এড়িয়ে চলা।

ছেনআ কাটআ(ছেনা কাটা): দুধ থেকে ছানা উৎপন্ন হওয়া, দুধ থেকে ছানা তৈরীর প্রক্রিয়াকরণ করা, দুধ কেটে বা ফেটে যাওয়া।

জর কাটআ(জ্বর কাটা): জ্বর নিরাময় হওয়া, জ্বর উপশম হওয়া, জ্বর থেকে মুক্তি পাওয়া।

জল কাটআ: মাছ ধরার ফাঁদ ঘুগি, পাটায় স্রোতের জল নিয়ন্ত্রিত হওয়া, নালায় বা মগরায় (পাইপে) প্রবাহিত হয়ে জল না জমে যাওয়া, বৃষ্টি থেমে যাওয়া, বর্ষা অতিবাহিত করা, অন্য স্থানের নূতন জলে স্নান ও পানের ফলে সর্দি মাথাধরা হলে আরও অন্যজল ব্যবহারে আরোগ্য লাভ করা, সাঁতার দিতে জলে হাত পা নাড়া।

জাড় কাটআ: ঠান্ডা না লাগা, শীত করবে না এমন, ঠান্ডা কেটে যাওয়া, শীত অতিবাহিত করা, শীত সমাপ্ত হওয়া, শীতের মরশুম গত হওয়া।

জিরআন কাটআ(জিরান কাটা): খেজুর গাছের রস নির্গত করতে গাছের নির্দিষ্ট স্থান প্রত্যহই সামান্য পরিমান চেঁচে কেটে ফেলতে হয়। পর পর তিনদিন এই চেঁচে

ফেলা বা কাটার পর ৩দিন বিশ্রাম দিতে হয়। বিরাম বিশ্রামের পরদিন আবার ঐ গাছের রস বের করতে পুনরায় কাটা হয়। এই কাটার নামই জিরান কাটা। জিরান কাটার সর্বোৎকৃষ্ট রস থেকেই নলেন গুড় তৈরী হয়। যা বিভিন্ন সুস্বাদু মিষ্টান্ন ও মোয়া তৈরীর জন্য সুবিখ্যাত।

জুলউম কাটআ (জুলুম কাটা): তেজ প্রকাশ করা, যথাযোগ্য উত্তেজিত হওয়া, জেদ ধরা, মনযোগী হওয়া, বীরত্ব প্রদর্শন করা, কর্মোদ্যগী হওয়া, পূর্নোদ্যিমে লেগে পড়া।

জুলি কাটআ: মৃদু শ্রোত প্রবাহে ক্ষীণ নালা সৃষ্টি হওয়া, নরম মাটির উপর চলন্ত গরুর গাড়ির চাকা বসে গিয়ে যে সরু নালার ন্যায় লম্বা গর্ত হয় তাহা, সমন্বয় যুক্ত সংশ্লিষ্ট বস্তুর ঘর্ষণে ক্ষয় হয়ে গর্ত হওয়া, দ্বিতীয় বস্তু সংস্থাপনের জন্য বস্তুর মাপে গর্ত্ত করা।

জঊড় কাটআ (জোড় কাটা): এক জোড়ার একটিকে বিচ্ছিন্ন করা, বিবাহের (বরের) পোষাক কাটা, ক্রয় বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক জোড়ার একটিকে বেছে নেওয়া।

ঝইড়আ কাটআ (ঝই্ড়া কাটা): অবিরাম ঝিরঝিরে বৃষ্টির প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেটে যাওয়া।

ঝড় কাটআ: ঝড় থেমে যাওয়া, দুর্যোগ দুর্দিন অপসারিত হওয়া, বিপাক বিপত্তির অবসান ঘটা।

ঝাড় কাটআ: শাখা প্রশাখা মেলা, বংশবৃদ্ধি পাওয়া, বংশ বিস্তার করা, গুচ্ছাকারে পল্লবিত হওয়া।

ঝুড় কাটআ:ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করা, আগাছা জাতীয় গাছ গাছালি কেটে ফেলা।

টসঅর কাটআ(টসর কাটা): রাঢ় ঝাড়খন্ডের বনাঞ্চলে লম্বা শালগাছে প্রজাপতি তসর প্রস্তুত করলে সেই গাছের তসর থাকা অংশটি কেটে দিয়ে মানুষ তসর সংগ্রহ করত। গাছের ঐ কাটা অংশই টসঅর কাটআ বা তসর কাটা, তসর কেটে প্রজাপতি বেরিয়ে যাওয়া তসর।

টেরি কাটআ: চিরুনি দ্বারা মাথার চুল সুবিন্যস্ত করে সিঁথ/সিঁথি/সিঁতা সৃষ্টি করা।

ঠেক কাটআ: ইংরাজ আমলে এবং স্বাধীনতার পরেও ভারত সরকার জঙ্গল বিক্রয় করত। সেই বিক্রিত জ্বালানি যোগ্য গাছ কেটে ঠেক করানো হত। তিন হাত লম্বা ও দুই হাত করানো হত। তিন হাত লম্বা ও দুই হাত উচ্চতা বিশিষ্ট স্থানকে দেড় হাত লম্বা কাঠের টুকরা দিয়ে ভরাট করলে একটি ঠেক হয়। যারা এই কাজ করে তারাকে টেক কাটা মজুর বলে। বর্তমানে জঙ্গল বিক্রয় হয় না। ব্যক্তিগত বাগানের গাছ থেকে কোথাও কোথাও ঠেক কাটা ও বিক্রয় হয়ে থাকে।

ঠেঁগআ কাটআ(ঠেঙ্গা কাটা): লাঠি কাটা, পয়না, গুজি, হোসেল খেলায় (লাঠি খেলায়), শেয়াল কুকুর তাড়াতে, আত্মরক্ষায়, গোচারণে, জমিতে ঘোরা সময় হাতে রাখতে ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে কুড়মি তথা সমগ্র খেরওয়াল সমাজের প্রত্যেক পরিবারে বিভিন্ন ধরণের ও মাপের বাঁশ এবং কাঠের লাঠি দেখা যায়। এই লাঠি কাটারি বা বিভিন্ন কাঠ কাটা অস্ত্র দ্বারা কেটে প্রস্তুত করাই ঠেঁগআ কাটআ।

ডবহা কাটআ(ডভা কাটা): ডোবা কাটা, ডোব কাটা, মাটি খুঁড়ে ডোবা নির্মান করা, কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন রবিচাষের জন্য মাদা খনন করা, অল্প পরিসরে মাছ চাষ ও ক্ষুদ্র সেচের জন্য ছোট জলাধার নির্মান করা।

ডুরি কাটআ: মাথা ভাঁউরি জালের দড়ি ছিঁড়ে যাওয়া, মোটা দড়ির বাঁধনে শেষ প্রান্তে যে সরু দড়ি ব্যবহার হয় তা ছিঁড়ে যাওয়া, ছিপের ডোর ছিঁড়ে যাওয়া।

ডোব কাটআ: ছোট গর্ত খুঁড়া, রবিচাষের বিভিন্ন বীজ বপনের জন্য জমিতে ছোট ছোট গর্ত করা।

ডোর কাটআ: ঘুড়ি উড়ানোর নাটাইয়ের সূতা (ডোর) ছিঁড়ে যাওয়া, সায়া, পাজামা ইত্যাদির দড়ি ছিঁড়ে যাওয়া।

ঢোল কাটআ: ঢোলের তালা (ছাউনি) কেটে (ছিঁড়ে) যাওয়া, ক্ষুদ্র (দুর্বল) এর বৃহৎ কর্ম করা।

তাল কাটআ: গানের তাল ভঙ্গ হওয়া, সঙ্গতকালীন সঙ্গীতের তালভঙ্গ হওয়া, ছন্দপতন হওয়া, বেতাল হয়ে যাওয়া, তালে আঁটি হওয়ার পূর্বে তালশাঁস খাওয়ার উদ্দেশ্যে গাছ থেকে তাল কাটা।

দরআ কাটআ(দরা কাটা): কুলার সাহায্যে ভাঙা চালের টুকরা পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া।

দাড়হি কাটআ (দাড়ি কাটা): দাড়ি কাটা, ক্ষৌরকর্ম করা।

দিন কাটআ: সময় অতিবাহিত করা, সময় কাটানো।

দুধ কাটআ: দুধ টক হয়ে যাওয়া, দুধ ছিঁড়ে গিয়ে দুধ থেকে ছানা হয়ে যাওয়া।

ধান কাটআ: কাস্তে দিয়ে পাকা ধানগাছ কাটা, ধান্য ছেদন, কুলার সাহায্যে হাতের কৌশলে ধান থেকে আবর্জনা মুক্ত করা।

ধুঁআ কাটআ(ধুঁয়া কাটা): ধূম নির্গত হওয়া, ধোঁয়া সৃষ্টি হওয়া, ধোঁয়া থেমে যাওয়া।

নখ কাটআ: নখ কেটে ফেলা, নখ ছাঁটা।

নখএ কাটআ (নখে কাটা): নখ দ্বারা কাটা, (প্রকারে) ও (তাচ্ছিল্যে)- অনায়াসে কাটা।

নমবর কাটআ (নম্বর কাটা): ভুল উত্তর দানে বরাদ্দ কত নম্বর না পাওয়া।

নমএ কাটআ (নমে কাটা): লম্বা দিক কাটা, লম্বালম্বি কাটা, লম্বে ছেদন।

নাখ কাটআ: চরম অপমানিত হওয়া, বেমানান হওয়া, সৌন্দর্য্যহানি হওয়া।

নেজ কাটআ(ন্যাজ কাটা): লেজ কাটা, ডেকে এনে অপমান করা, সুযোগ পেয়ে শোষণ করা, বাগে পেয়ে ঠকানো।

নেসআ কাটআ(নেশা কাটা): নেশা চটে যাওয়া, নেশা কেটে যাওয়া, নেশামুক্ত হওয়া।

পঅআর কাটআ (পয়ার কাটা): খেমটা রেগ (সুর) এরঝুমইরের চিতান কলি বা দুন অংশ গাওয়ারআগে যে প্রথম অংশ বলা হয়, খেমটা রেগের ঝুমইর বিশেষ।

পঅনা কাটআ(পয়না কাটা): গবাদি পশুতে টানা গাড়ি বা লাঙ্গল চালাতে বাড়ি যা ছড়ির মত দেখতে দেড় দু হাত লম্বা লাঠি (সরু) কেটে প্রস্তুত করা।

পইসসঅ কাটআ(পস্য কাটা): সদ্ভাব বিনষ্ট হওয়া, বন্ধুত্ব কেটে যাওয়া, বন্ধুবিচ্ছেদ হওয়া।

পকআ কাটআ(পকা কাটা): পোকা কাটা, কী দ্রংষ্ট, কীট দংশিত, পোকায় কাটা।

পখইর কাটআ (পখইর/পখ্যর/পখের কাটা): পুকুর খনন করা, পুকুর খুঁড়া, লাঙ্গলের ফলা (ফাল) পাশি দ্বারা ধরে রাখতে পাশির সুরক্ষা গর্ত্ত কাটা।

পাইজ কাটআ(পাইজ কাটা): জাবর কাটা, রোমন্থন করা।

পাহি কাটআ: ধান্য রোপন বা ধান্য ছেদন করতে একজন ব্যক্তি যে পরিমান চওড়া জমি জুড়ে সহজ সাবলীল ভাবে কাজ করে যেতে পারে সেই পরিমান স্থান, ঐ কাজের ক্ষেত্রে।

পুড়ি কাটআ: দা অর্থাৎ কাস্তে এবং খড় (ছানি) কাটার পাতিতে ছেনি দ্বারা কেটে কেটে করাতের ন্যায় হেলানো দাঁত সৃষ্টি করা।

পেছলি কাটআ: পিছু হটা, পশ্চাদপসরণ করা, পশ্চাধাবিত হওয়া, প্রথমে হ্যাঁ করে পরে না করা, মতদানের পর তা নাকচ করা।

পেঠএর কাটআ(পেঠের কাটা): পেটের কাটা, খাওয়া খরচ থেকে বাঁচতিয়ে উদ্বৃত্ত করে সঞ্চয় করা।

ফল কাটআ: ফল কেটে টুকরা করা, তীর এবং বঁড়শির ফলা (গালসি) নির্মান করা।

ফড়অন কাটআ(ফড়ন কাট): কথার মাঝে কথার কথা বলা, উস্কানি মূলক কথা বলা।

ফড়আ কাটআ (ফড়া কাটা): ফোঁড়া কাটা, নরুন দ্বারা কেটে ফোঁড়ার মুখ করা।

ফঁটঅ কাটআ(ফঁটা কাটা): ফোঁটা কাটা, তিলক করা/কাটা।

ফাঁড়আ কাটআ(ফাঁড়া কাটা): সম্ভাব্য বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া, বিপদমুক্ত হওয়া।

ফুল কাটআ: কাঠ, কাগজ ইত্যাদি দ্রব্য কেটে কেটে নক্সা তৈরী করা, নক্সা কাটা।

বদআ কাটআ(বদা কাটা): পাঁঠা কাঠা, পাঁঠা বলি দেওয়া।

বন কাটআ: জঙ্গল কাটা, গাছ কেটে জঙ্গল পরিষ্কার করা, বিক্রিত জঙ্গলের গাছ কাটা।

বাইটআ কাটআ(বাইটা কাটা): ঢেরার সাহায্যে পাট বা শন জাতীয় আঁশ (ফাইবার) থেকে সুতলির ন্যায় মোটা সূতা কাটা, যে সুতলি প্রয়োজন মত কয়েক প্রস্থ একত্র করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের উপযোগী মোটা দড়ি প্রস্তুত করা যায়।

বাজনা কাটআ: গান ও বাজনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাজনা গানের লালিত্য বৃদ্ধি করে শ্রুতি মধুর করে। সেই বাজনা গানের সুরে-তালে গরমিল হলে বলে বাজনা কেটে গেল, এটা এক ধরনের বাজনা কাটা। আবার একটা বাজনা চলতে থাকলে সেই বাজনা শেষ করে নূতন বাজনা ধরতে গেলে যে তেহাই বাজনা বাজাতে হয়, তাকে বলে বাজনা কাটা, এই অর্থে বাজনা কাটা দুই প্রকার।

বাদঅল কাটআ(বাদল কাটা): মেঘলা আকাশ পরিষ্কার হওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেটে যাওয়া, মেঘ সরে যাওয়া, ভাসমান মেঘ সরে গিয়ে রোদ ঝলমলে আকাশে সূর্য্য দেখতে পাওয়া।

বাধি কাটআ: বাদ্যযন্ত্রকে টান দিয়ে ধরে রাখতে যে চামড়ার সরু ফিতা ব্যবহার তা কেটে যাওয়া বা ছিঁড়ে যাওয়া।

বুইনআদ কাটআ (বুইনাদ/ব্যুনাদ কাটা): ভিত খনন করা, ভিত খুঁড়া।

বুগলি কাটআ: জামার থলি (পকেট) কাটা।

বুদআ কাটআ(বুদা কাটা): ঝোপ কাটা, ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করা, ঝোপ ছাঁটা।

বেরহুন কাটআ: বেতন কাটা, চুক্তি মোতাবেক দিন বা সময় পর্য্যন্ত কাজ না করলে কাজে অসম্পূর্ণ দিন বা সময়ের বেতন না দেওয়া, কৃষিজীবি কুড়মিদের বাগাল (বাৎসরিক চুক্তিবদ্ধ ভৃত্য), মুনিস (দিন মজুর), কামিন (মহিলা শ্রমজীবি) প্রভৃতি সবরকম কাজের বিনিময়ে বেরহুন (বেতন) নগদ অর্থের বদলে ধান দেওয়া ও নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনো প্রচলিত আছে।

বেলআ কাটআ(বেলা কাটা): সময় গত করা, সময় অতিবাহিত করা, সময় কাটানো।

ভাঁউরি কাটআ: পাক খাওয়া, ঘূর্ণি হওয়া ঘূর্ণিঝড়ের ন্যায় ঘুরপাক খাওয়া।

ভিতআ কাটআ(ভিতা কাটা): জমির পাড়ের (আইলের) নিজের জমির দিকের জমি সংলগ্ন কোল মাটি সহ ঘাস কোদাল দ্বারা ছেঁটে দেওয়া, চাষের জমির চারদিকে ভিত বরাবর ছেঁটে পরিষ্কার করা।

ভুসকা কাটআ: উই পোকা দ্বারা ফসলের শিকড় ও কান্ড অংশ কেটে দেওয়া।

ভুড়ভুড়ি কাটআ: জলবিম্ব সৃষ্টি করা, জলে বিম্ব উঠা।

ভেলি কাটআ: রবিচাষের জন্য জমিতে বারেবারে লাঙ্গল ও মই চালিয়ে ঝুরঝুরে সমতল মাটিতে বীজ বা চারা বসানোর (লাগানোর) জন্য অগভীর নালা কাটা।

মউড় কাটআ(মোড় কাটা): কার্ত্তিক মাসে অমাবস্যা থেকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্যন্ত্য পশ্চিম রাঢ়-ঝাড়খন্ডের মানুষ বাঁদনা উৎসব পালন করে থাকে। বাঁদনা পরবের শেষ দুইদিন অর্থাৎ দ্যুতপ্রতিপদ ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন কুড়মিরা তাদের সমস্ত গরু মহিষকে এবং লাঙ্গল, মই ও সমস্ত ঘরের মুইধনে ধান শীষের মোড়ক (টোপর) পরায়। এই টোপর প্রস্তুত করতে সাদা চাল যুক্ত সাদা ধানগাছের শীষ দরকার হয়। মোড় প্রস্তুত করার জন্য কুড়মিরা উপবাস করে স্নান সেরে ভিজা কাপড়ে প্রয়োজন মত ধানগাছ কেটে আনে। এরকম নিয়ম মেনে ধানগাছ কেটে আনাই মোড় কাটা।

মচ কাটআ: গোঁফ ছেঁটে ফেলা, গরুর গাড়ির চাকার বাইরের লিঘার (এক্সেলের) প্রয়োজনের বেশি অংশ কেটে বাদ দেওয়া, গোঁফ দাড়ি গজায়নি এমন কিশোর বয়সীর মুখে গোঁফ এঁকে দেওয়া।

মড়আ কাটআ(মড়া কাটা): শব ব্যবচ্ছেদ করা, ময়না তদন্ত।

মুড়হা কাটআ(মুঢ়া কাটা): কামার শালের কয়লা করতে মরা গাছের মূলযুক্ত কান্ড কাটা, প্রকান্ড মোটা কাঠ কাটা।

মাটি কাটআ: মাটি খুঁড়া, মৃত্তিকা খনন করা।

মানউস কাটআ (মানুষ কাটা): মানুষ খুন করা, মানুষ কাটা, গলা কেটে মানুষ খুন করা।

মুড় কাটআ: মাথা কাটা, মুন্ড কাটা, মুন্ড ছেদন, গলা কেটে ধড় থেকে মাথা আলাদা করা, মস্তক ছেদন, শিরচ্ছেদ।

মুড়হা কাটআ(মুঢ়া কাটা): কামার শালের কয়লা করতে মরা গাছের মূলযুক্ত কান্ড কাটা, প্রকান্ড মোটা কাঠ কাটা।

রইসআনি কাটআ(রইসানি/রস্যানি কাটা): খোশ, পাঁচড়া, একজিমা, ফোঁড়া, দুষ্টব্রন, নাড়িব্রন (নালি ঘা), ক্ষতস্থান ইত্যাদি থেকে রস নির্গত হওয়া, পচনশীল স্থান থেকে দেহরস ঝরা।

রাগ কাটআ: ক্রোধ প্রশমিত হওয়া, সতেজ বিকশিত হওয়া, মনযোগ সহকারে কর্মে উদ্যোগী হওয়া, প্রভাব বিস্তার করা, উদ্ভিদাদির সতেজতা প্রাপ্ত হওয়া।

রাসতা কাটআ (রাস্তা কাটা): পথ নির্মান করা, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে রাস্তা কেটে দেওয়া, নূতন করে দুয়ার খোলা, জমির পাড় (আইল) কেটে গাড়ি যাতায়াতের পথ নির্মান করা।

রুঁআ কাটআ(রুঁয়া কাটা): লোম কাটা, সারা শরীর লোমাবৃত গবাদি পশুর পুরাতন

লোম ঝরে গিয়ে নূতন লোম গজিয়ে দেহের চাকচিক্য বৃদ্ধি পাওয়া।

রউদ কাটআ (রোদ কাটা): প্রখর রৌদ্রের সময় বিশ্রাম নেওয়া, রোদ ভোগ করা, রৌদ্রের তেজ কমে যাওয়া।

ললি কাটআ: বস্ত্রশিল্পের অন্তর্গত তাঁতশিল্পে মাকুর সাহায্যে পড়েন সূতা (Weftyearn) দ্বারা বস্ত্র-বয়ন করার জন্য নলিতে (Prin) সূতা ভরা, নলিতে চরখার সাহায্যে সূতা জড়ানো, খেজরু রস গাছ থকে কলসীতে এসে পড়ার জন্য নলির ন্যায় দেখতে যে কাঠি গাছে পুঁততে হয় সেই কাঠি প্রস্তুত করা, দেশি মাকুর নলি সর বা বাঁশকাঠি থেকে নির্মান করা।

লাইড় কাটআ(লাইড় কাটা): নাড়ীচ্ছেদ করা, প্রসবের পর মা ও শিশুর ভ্রূণাবস্থার সংযোগ নাড়ী ছেদন করে মা ও শিশুকে বিচ্ছিন্ন করা, জাতাশৌচ হওয়া।

লালআ কাটআ(লালা কাটা): নালা কাটা, অবিরত (মৃদু) স্রোতপ্রবাহে নালার সৃষ্টি হওয়া, ব্রন, ফোঁড়া বা দুষ্টক্ষত স্থান থেকে দীর্ঘদিন রস নির্গত হয়ে নালির জন্ম হওয়া, নালা সৃষ্টি করা (মাটি কেটে)।

লালি কাটআ: রান্না করা খাদ্যদ্রব্য বাসি হয়ে দূষিত হওয়া, বাসি খাদ্যদ্রব্যে অম্ল (অ্যাসিড) উৎপন্ন হওয়া, খাদ্যদ্রব্য বাসি হয়ে পিচ্ছিল হয়ে যাওয়া এবং ভাঙ্গলে বা বিচ্ছিন্ন করলে সূতার ন্যায় পিচ্ছিল আঁশ দেখতে পাওয়া।

সত কাটআ: নালার জন্ম হওয়া, নালার উৎপত্তি হওয়া, ঝর্ণার জল অন্য দিকে প্রবাহিত করতে ঝর্ণার পাড় কাটা।

সাখি কাটআ: মনসা পূজা উপলক্ষ্যে ঝাঁপান উৎসবে মন্ত্রের প্রশ্নের জবাব মন্ত্রে দিতে পারা, ঝাঁপান উৎসবে মন্ত্র আউড়ানো।

সাপএ কাটআ(সাপে কাটা): সাপে ছোবল মারা, সাপে কামড়ানো।

সিমআ কাটআ(সীমা কাটা): সীমানা কেটে দেওয়া, সীমানা বরাবর চিহ্ন দেওয়া, সীা অতিক্রম না করা, নিজ সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা/অবস্থান করা, সীমা চিহ্নিত করণ করা।

সিঁত কাটআ: সিঁতা কাটা, কপাল থেকে তালু পর্য্যন্ত মাথার মাঝ বরাবর বিশেষত মহিলারা চুল দুই ভাগে সুবিন্যস্ত করে যে সিঁত বা সিঁতা সৃষ্টি করে, তাহা। সেজন্য মাথার এই অংশের নাম সিঁথি এবং এই অঙ্গে (স্থানে) কপালের দিকে ঝুলিয়ে মহিলারা যে অলংকার পরে তার নামও সিঁথি।

সিঁদ কাটআ: চুরি করার জন্য ঘরের মফস্বল দিকের দেওয়াল কাটা, নিশুতি রাতের অন্ধকারে চোর দ্বারা ঘরের দেওয়াল কাটা।

সিঁস কাটআ: শীষ কাটা, শিস দেওয়া।

সুতআ কাটা (সূতা কাটা): সূতা কাটা, তূলার পাঁজ থেকে তকলি বা চরকার টেকো সহযোগে সূতা কাটা, অবাঞ্ছিত সূতা ছেঁটে ফেলা।

সঁইদ/সুঁইদ কাটআ(সুঁইদ/স্যুঁদ কাটা): মাটি খনন করে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করা, খনন করে গুহা গহ্বর জাতীয় গর্ত সৃষ্টি করা।

সুর কাটআ: সুর সঠিক না হয়ে বদসুর হওয়া কথার সঙ্গে সুর যোগ হলে হয় সঙ্গীত। কথা অপেক্ষা সঙ্গীত শ্রুতি মধুর হয়ে হৃদয়গ্রাহী হয়ে থাকে। কিন্তু সঠিক সুর প্রয়োগ না হলে সঙ্গীত শ্রুতিকটু হয়ে যায়। তখন বদসুরো সঙ্গীত হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারে না।

হালমুড়হা কাটআ(হালমুঢ়া কাটা): লাঙ্গল তৈরীর জন্য যথোপযুক্ত মোটা ও লম্বা কাঠ কেটেছেঁটে লাঙ্গলের আকার আকৃতি গঠন (নির্মান) করা।

হালি কাটআ: অ ল্পদিন আগের কাটা, হালের কাটা, খুব বেশিদিন আগের কাটা নয় এমন, সাম্প্রতিক কালের কাটা, কয়েক দিন পূর্বের কাটা, পুরাতন নয়, হালে কাটা।

দেখা যাচ্ছে কুড়মালি ভাষার "কাটআ" (কাটা) শব্দটি সাধারণভাবে ১৩৩ রকম অর্থে ব্যবহার হচ্ছে। যে অর্থে দুই শতাধিক অর্থ নিহীত রয়েছে। কুড়মালি ভাষায় এরকম অনেক শব্দ আছে যেগুলি শতাধিকঅর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্তর্নিহিত অর্থ আরও শতাধিক। চর্চা ও অনুসন্ধান দ্বারা আবারও বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়াতেই পারে আমি পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম জেলায় বাস করি। যতদুর জানিতাতে বাংলা ভাষায় এরকম শব্দের অপ্রতুলতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে কুড়মালি ভাষার অর্থ প্রকাশ করার ক্ষমতা অনেক বেশি বিশাল ও গভীর। তথাপি আমাদের দেশে কুড়মালি ভাষার চর্চা ও গবেষণা ইতিপূর্বে হয়নি বললেই চলে। অথচ, অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে এই ভাষার অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।

এবারে কুড়মালি ভাষায় বাক্যের ভাব প্রকাশের আলোচনায় আসা যাক। বাংলায় বলা হয়-

দূর্গা আছে তো ডেকে দাও

অথবা

দূর্গা থাকলে ডেকে দাও

বাংলা ভাষার এই বাক্য দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় না যে, কোন দূর্গাকে ডাকতে হবে। কারণ, গিয়ে দেখা যায়, দুইজন দূর্গা আছে। একজন দূর্গাবতী ও অপর জন দূর্গাপ্রসাদ। সেক্ষেত্রে দূর্গা আছে তো ডেকে দাও বা দূর্গা থাকলে ডেকে দাও বললে মহিলা দূর্গা নাকি পুরুষ দূর্গা কোনটিই বুঝায় না।

এদিকে কুড়মালি ভাষায়-দুগ্‌গা আহে তঅ হাঁকাঞ দে নঅ বললে পুরুষ

দুর্গাকে বুঝায় এবং দুগগা আহি তঅ হাঁকাঞ দে নঅ বললে মহিলা দুর্গাকে বুঝায়। অর্থাৎ কুড়মালি ভাষায় বলার সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গ নির্ণয় হয়ে যায়। যা বাংলা ভাষায় দুর্লভ। বাংলা অপেক্ষা কুড়মালি ভাষার অর্থ এবং ভাব প্রকাশ ক্ষমতা যে অত্যধিক বেশি, আশা করি প্রিয় পাঠককে সেকথা আর ব্যাখ্যা করে বোঝানোর দরকার হবে না। পাঠকের নিজস্ব অনুভূতির সাহায্যে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম হয়েছে নিশ্চয়।

অতঃপর কুড়মালি ভাষায় একটি বস্তুর নাম সম্পর্কে আলোচনা। বস্তুটি হলো মৃৎপাত্র বা মাটির জিনিস। মৃৎপাত্রের আকৃতি (অবয়ব) বিশেষে নাম বিশেষ ও ব্যবহার ক্ষেত্র এবং মাটির অন্যান্য দ্রব্য ও তার নাম এবং ব্যবহার।

<u>মৃৎপাত্র (মাটির জিনিস)</u>

চুকআ (চুকা): সর্বাপেক্ষা ছোট আকৃতির ভাঁড়, যা বিশেষত বিবাহ অনুষ্ঠানে ছাঁদনা তলার মন্ডপের চার কোণে চারটি ব্যবহৃত হয়।

ছুটঅ সরআ(ছট সরা): ছোট সরা, যা বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত মাসকলাই (ব্রীহি) পূর্ণ চুকার ঢাকনা, বাঁদনা উৎসবে ভগবতী জ্ঞানে গো-ধনের অশুভ বিনাশ কামনায় নিমছানোর আধার।

গাড়উ (গাড়ু): চুকা অপেক্ষা বড় এবং ভাঁড়ের থেকে ছোট আকৃতির মধ্যম আকারের ভাঁড়।

ভাঁড়: গাড়ু অপেক্ষা বড় কিন্তু হাঁইড়কা থেকে ছোট মাপের মৃৎপাত্র/ভাঁড়।

হাঁইড়কা: ভাঁড়ের চেয়ে বড় ও হাঁড়ির চেয়ে ছোট আকৃতির মৃৎপাত্র/হাঁঞড়কা।

হাঁড়ি: চওড়া মুখ বিশিষ্ট বড় মৃৎপাত্র, যে মৃৎপাত্র জল রাখতে ও রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়।

কপড়ি: ছোট কলসী, বহুপূর্বে যখন কুয়া, নলকূপ, নলবাহিত জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল না, তখন রাঢ়-ভূখন্ডে স্কুল, কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ছিল না। ঐ সময় অল্প বয়সী মেয়েদের ঘর-গৃহস্থালির কাজে অভ্যস্ত করতে নদী, নালা, বাঁধ, পুকুর থেকে জল বয়ে আনার জন্য যে ছোট ছোট মাটির কলসী বানিয়ে দেওয়া হত।

গুজি: খেজুর গাছ থেকে রস ধরতে যে কলসী সারারাত খেজুর গাছে ঝুলানো হয়, বিশেষভাবে নির্মিত এই কলসীতে খেজুর রস ও রসের ভিতর থাকা গুড় এর গুনমান অটুট থাকে।

কলসী: কাঁখে (কক্ষে) করে বয়ে আনার এবং সরু (ছোট) মুখ বিশিষ্ট হওয়ায় হাঁটার সময় কলসীর জল গায়ে বা কাপড়ে নড়ে উপচে পড়বে না, এমন প্রযুক্তিগত সর্বজন বিদিত জলপাত্র, মানব সভ্যতা বিকাশে পোড়া মাটির মৃৎপাত্র নির্মানে আদিম মানবের মস্তিষ্ক ব্যবহারের পরিচয় ও ছাপ বিভিন্ন অবয়ব বা আকৃতির মৃৎপাত্রগুলি

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষ্য করলে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায় ও যাবে। মাটির কলসী তার অন্যতম রুপ।

কুঁদআ (কুঁদা)/পাআ (পায়া): আখ মাড়াইয়ের পর গুড় তৈরী করতে আখের রস আগুনে ফুটিয়ে সিদ্ধ করতে হয়, ফুটন্ত রস ঘনীভূত হয়ে এক সময় তা গুড়ে পরিণত হয়, তখন সেই ফুটন্ত গরম গুড় যে পুরু কলসীতে ঢেলে রাখা হয়। বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্যে কুঁদা-কলসীর গায়ে উঁচু নিচু (এবড়োখেবড়ো) দাগ কাটা এবং বেশ মোটা (পুরু) করে বানানো হয় যাতে গরম গুড় দ্বারা না ফেটে যায়, জল কলসীর ন্যায় মুখ সরু এই গুড়ের কলসী (কুঁদা) তে যাতে পিঁপড়া ঢুকতে না পারে তারজন্য। কলসী (পায়া)-র মুখে অল্প খড়ের সাথে মাটির প্রলেপ দিয়ে বন্ধ করা থাকে। ঢাকনার আকারের এই প্রলেপ প্রয়োজনে বারে করে খোলা ও পুনরায় বন্ধ করা যায়।

মেচলা: খুব পুরু মাটির, খলা বা টব আকৃতির চওড়া মুখ বিশিষ্ট পাত্র, সাধারণত তাঁতিদের হস্ততাঁত শিল্পে টানার সূতায় মাড় প্রকরণের জন্য এই মেচলায় দৈনন্দিনের মাড় রাখে এবং আঞ্চলিক ভাষায় মাড় প্রকরণকে আসন করা বলে, জলপাত্র হিসাবে বা গৃহপালিত পশুকে জল খাওয়ানোর কাজেও মেচলা ব্যবহার হয়, প্রায় গামলা আকারের মৃৎপাত্র।

কুঁড়ি: গৃহপালিত গরু মহিষকে কুঁড়া, ঘাঁটা, জল ও সব রকম খাদ্য খাওয়ানোর উপযোগী করে বেশ পুরু ও মেচলা অপেক্ষা অনেক বড় আকারের পাত্র, কুঁড়ি সারাবছর বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হয় এবং পৃথকভাবে গরু মহিষকে খাদ্য খাওয়ানোর জন্য গোয়াল ঘরে স্থায়ীভাবে মাটির বেদি করে বসানো থাকে, বিভিন্ন সাপের ও আকৃতির উভয় মুখ খোলা কুঁড়ি দ্বারা নানা রকম বাদ্যযন্ত্র হয়ে থাকে।

বাহিন (বহি্ন): তলদেশ সরু ফলে উপুড় করলে গম্বুজাকৃতি দেখায় ও কুঁড়ি অপেক্ষা বড় মাপের পশুখাদ্য পাত্র, যা মাটিতে রাখতে গেলে উল্টে যায় সেকারণ সম্পূর্ণ বাইনটি মাটির নিচে বসিয়ে গরু ও (বা) মহিষের সুবিধাজনক উচ্চতায় বেদি বেঁধে স্থাপন করা পশুখাদ্য পাত্র, বড় বড় মহিষের খাদ্যপাত্র।

দন: বাহি্নের আকৃতি বিশিষ্ট কিন্তু বাহি্ন অপেক্ষা আরও বড় মাপের এবং তলদেশ সামান্য প্রশস্ত বেশ মোটা অর্থাৎ পুরু পশু খাদ্যপাত্র, সবচেয়ে বড় মাপের গো-মহিষের একমাত্র খাদ্যে পেট ভরবে এমন বড় মাপের পশুখাদ্য পাত্র, যা মাটির বেদিতে স্থায়ীভাবে স্থাপিত থাকে।

খলআ(খলা): হাঁড়ির নিচের দিক থেকে অর্দ্ধেক অংশের ন্যায় দেখতে, শাকসব্জি ইত্যাদি রান্নায় ব্যবহৃত হয়, সময়ে কম লোকের ক্ষেত্রে ভাত রান্নাও হয়ে থাকে।

খাপরি: খলার আকৃতি বিশিষ্ট কিন্তু খল অপেক্ষা ছোট মাপের তরকারি রান্নার পাত্র।

সানকি: এ্যাসকা (আঁই্সকা) বা খলাপিঠা অর্থাৎ জল দিয়ে ভাজা পিঠা তৈরীর জন্য খাপরি অপেক্ষা ছোট এবং কম গর্ত বিশিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত ভিন্ন অবয়বের মৃৎপাত্র।

সরআ(সরা): সানকিতে জল দ্বারা পিঠা ভাজার সময় পিঠাকে ঢেকে দিতে মাটির বাঁট (হাতল) নির্মিত পিঠার চেয়ে কেটু বড় মাপের, সানকির সাথে সেটভাবে বিক্রয় হয়, বলা হয় সানকি সরা, সরা সাধারণত তিন প্রকার। যথা-১। ছটআ সরা, ২। সানকি-সরা, ৩। বড়অ সরা বা মালস

খাপইর (খাঁপের/খাপ্যর/খাপই্র): মুড়ি ভাজার খলা, হাঁড়ির নিচের দিকের অর্দ্ধেকাংশেরও বেশি অংশের সমান মাপের তৈরি করা কিনতে পাওয়া যায়, জরুরী ক্ষেত্রে হাঁড়িকে বিশেষভাবে কাস্তে বা কাটারির সাহায্যে ভেঙ্গে তৈরি করে নিতেও দেখা যায়।

তাওউআ (তাউয়া/তাওয়া): মুড়ি ভাজার আগে মুড়ির চালকে নির্দিষ্ট মাত্রায় গরম রে নিতে হয়, তাওয়া সেই পাত্র যে পাত্রে কাঠের বড় হাতল (চাটু) দ্বারা মুড়ির চাল যথোপযুক্ত মাত্রায় নাড়াচাড়া করে গরম করা হয়, সর্বাপেক্ষা বড় (চওড়া) মুখ বিশিষ্ট অগভীর মৃৎপাত্র, ধাতব কড়াই নির্মাণ ও আমদানির পূর্বে সামাজিক অনুষ্ঠানে তরকারি রান্নার কাজেও ব্যবহার হত, বর্তমানে তাউয়া থাকলেও সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার হতে প্রায় দেখায় না।

হাঁড়আ (হাঁড়া): সর্বাপেক্ষা বড় আকারের মাটির পাত্র, জালা, সাধারণত কৃষক পরিবারগুলিতে আমন ধান ঘরে উঠার পর তারা সাধ্য অনুসারে সারা বছরের চাল তৈরি করার চেষ্টা করে। ধান থেকে তিন প্রকার চাল করে থাকে। যথা-১. আলঅ বা আরুয়া অর্থাৎ আতপ চাল, ২. একসিদ্ধ চাল ও ৩. দুই সিদ্ধ চাল। সিদ্ধ চাল করতে হাঁড়াতে ধান ভিজিয়ে রাখে ও হাঁড়িতে সিদ্ধ করে। প্রধানত ধান ভিজানোর জন্য প্রত্যেক কৃষি পরিবারে একাধিক হাঁড়া রাখার প্রচলন দেখা যায়। আলমারি, সিন্দুক, বাক্স, পেটি ইত্যাদি হওয়ার আগে হাঁড়ার মধ্যে কাঁথা, পোষাক-পরিচ্ছদ সংরক্ষণ করা হত। আবার বীজধান, চাল-ডাল রাখার জন্য এবং অনুষ্ঠানে জল রাখার কাজে হাঁড়া ব্যবহার হত। হাঁড়ার বাংলা নাম জালা।

মালসা: বড় সরা, ঘর গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজে সরা ব্যবহার হয়, তিন প্রকার সরার মধ্যে মালসা সবচেয়ে বড় আকারের সরা।

দিআ বা পদদিব (পদ্দিব): প্রদীপ, প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে প্রদীপ ও ধুনা জ্বালিয়ে তুলসী মঞ্চে এবং ঘরের সদর মফস্বল সহ প্রত্যেকটি দ্বারে, খামার, শষ্যগোলা (ধানের

মাচা), ও গৃহ দেবতা, বাস্তুপুরুষ সহ বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে, বিশেষত সন্ধ্যাদেবীকে বাড়ির মহিলারা প্রণাম নিবেদন করে থাকে। ধাতু নির্মিত প্রদীপের পূর্বে পাথরের ও মাটির প্রদীপ দিয়ে এই কাজ করা হত। ঘর আলোকিত করতে পাথর বা মাটির প্রদীপে তিল, গুঁজা, কুজরি, করজ,জাড়া (এরন্ড) (রেড়ি), নিম প্রভৃতি তৈলবীজের জাঁতপেড়া তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হত, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে মঙ্গল দ্রব্যের সাথে প্রদীপ জ্বালানোর ব্যবস্থা সুপ্রাচীনকাল থেকে বর্তমানেও প্রচলিত আছে। এখন মাটির বা পাথরের বদলে ধাতব প্রদীপ ব্যবহার হয়। যা শুরু হয়েছিল মাটির প্রদীপ দিয়ে মানব সভ্যতার উষালগ্নে।

সিরিবারি পদ্‌দিব: সিরিবারি প্রদীপ, চতুর্মুখী প্রদীপ, চারটি মুখ বিশিষ্ট বিশেষ আকৃতির মাটির প্রদীপ, সিরিবারি প্রদীপ কুড়মি জাতির বিবাহ অনুষ্ঠানে মঙ্গলদীপ রূপে ব্যবহৃত হয়। সিরিবারি প্রদীপ মাটিতে বসানো হয় না। বাঁশ নির্মিত প্রায় এক ফুট x এক ফুট মাপের সমচতুষ্কোণ বিশিষ্ট একটি ডালা (ডালি) তে বিরি (ব্রীহি) বিরহি কলাই রেখে তার উপর প্রদীপটি বসানো হয়। এই বিশেষ ডালিকে সিরিবারি ডালা বলে। কুড়মিদের ক্ষেত্রে বিবাহের রাত্রে বরের সাথে একজন সাঁওতালি যুবক সিরিবারি ডালাটি কনের ঘরে বয়ে নিয়ে যাওয়ার রীতি আছে। সিরিবারি প্রদীপ জ্বালানো হয় বিবাহ পর্ব শেষ পাত্রপাত্রীকে যুগলরূপে শুভাশীর্বাদ ও যৌতুকাদি প্রদানের সময়। এই অনুষ্ঠান শেষে বরকণে বিদায় হলে প্রদীপ ও সিরিবারি ডালা বরের বাড়িতে ফেরৎ আনা হয়। এখানেও বাঁদাপণ অনুষ্ঠানে সিরিবারি প্রদীপ পুনরায় জ্বালানো হয়ে থাকে আশীর্বাদ ও যৌতুকাদি প্রদানকালে। এই মাঙ্গলিক আচারক অনুষ্ঠান শেষ হলে বরের মা, দিদিমা, জেঠিমা এমন কোন মহিলা সযত্নে সিরিবারি ডালাসহ প্রদীপটি বাড়ির মধ্যে রেখে দেন। এই সিরিবারি প্রদীপ পুনরায় আর কোনদিন ব্যবহার করে না।

ধুনআচুর (ধুনাচুর): ধুনুচি, ধূপদানি, প্রত্যহ সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বেলে ও ধুনাচুরে ধুনা পুড়িয়ে তুলসী মঞ্চে ও ঘরের প্রতি দরজায় সন্ধ্যা দেবী সহ বিভিন্ন দেবদেবীকে প্রণাম নিবেদন করে ঘরের মহিলারা। অন্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেও ধুনাচুর ব্যবহার হয়। গ্রাম্য দেবদেবী, গরাম ইত্যাদি পূজায় কাঁচা শালপাতার তৈরী ধুনাচুর ও প্রদীপ ব্যবহার হয়। বর্তমানে স্টোভ, জ্বালানি গ্যাসে রান্না হচ্ছে, সেজন্য আগুনের অভাবে ধুনার বদলে ধূপকাঠি ব্যবহার হচ্ছে। ফলে ধুনাচুরের ব্যবহার কমে আসছে।

করহাই (কহাঁই/কর্‌হাই): দেখতে সানকির মত অবয়ব কিন্তু তলদেশ সরু এবং বেশি গর্ত (খাউলআ, গভীর) বিশিষ্ট কহাঁই একমাত্র বাঁদনা উৎসবের মাঝের দিন গরইআ (গরৈয়া) পূজার একমাত্র নৈবেদ্য ঘি-এর (ঘিয়ের) পিঠা ভাজার জন্য

একটি পাত্র একবার মাত্র ব্যবহার করে থাকে, বৃহত্তর কুড়মি সমাজের কোথাও কোন পরিবারে একই কহাঁই দ্বিতীয় বার ঐ কাজে ব্যবহার করে না। সেজন্য প্রতি বছর বাঁদনার আগে কুড়মিরা একটি করে নূতন কহাঁই কিনে রাখে। ঘিয়ের পিঠা বা গরইয়া পিঠা করতে কেবল মাত্র দুধ ও গুড় দিয়ে যে পরিমান গুঁড়ি পিঠা তৈরীর উপযোগী হয়ে থাকে তা দিয়েই যতগুলি হোক ঘি দিয়ে ভাজা হয়। পিঠার পরিমান বাড়াতে কোনক্রমেই এই গুঁড়িতে জল ব্যবহার করা যায় না। অবশ্য এটা অলিখিত বিধি বিধান। তবু কিন্তু সমগ্র কুড়মি সমাজে এই রীতি নিয়ম সমগ্র কুড়মি সমাজে এই রীতি-নিয়ম নিষ্ঠার সাথে কঠোরভাবে হাজার হাজার বছর পালিত হয়ে আসছে। উপবাস করে স্নানের পর ভিজা কাপড়ে ঢেঁকিতে গুঁড়ি তৈরি করার পর নূতন উনানে করহাই চাপিয়ে শাল কাঠের আগুনে ঘি সহযোগে মহিলারা গরইআর পিঠা ভাজে। ভাজার পাত্র কহাঁই (করহাই)।

জাগর হাঁড়ি (জাগর হাঁড়ি): মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে মঙ্গলদীপের প্রজ্বলিত শিখা যাতে বাতাস বা আগন্তুক দ্রব্যাদির চাপে না নিভে যায় তার জন্য একটি বিশেষ হাঁড়ি মধ্যে জ্বলন্ত প্রদীপ রাখা থাকে, সেই হাঁড়ি। জাগর হাঁড়ির মুখে ঢাকনা থাকে, যাতে উপর দিক থেকেও বায়ুর চাপে বা অন্য কোন বস্তুর চাপে প্রদীপটি না নিভে যায়। অবশ্য ঢাকনা বেশ ঢিলেঢালা অর্থাৎ ফাঁকফোকর থাকে। সেজন্য জাগর হাঁড়ির নির্মান কৌশলে দেখা যায়, দীপশিখার প্রধান জ্বালানি অক্সিজেন ও বর্জ্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রবেশ ও নিগর্মনের জন্য হাঁড়ির তলদেশ থেকে গলদেশ পর্য্যন্ত অসংখ্য ছিদ্র করা থাকে। এরা যে সময়কাল থেকে জাগর হাঁড়ি নির্মান ও ব্যবহার করতে শুরু করেছিল সেই সময় থেকে অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস চিহ্নিত করতে পেরেছিল সন্দেহ নাই। অতএব নিঃসন্দেহে একথাও বলা যায় যে, কুড়মি তথা খেরওয়াড় জাতি গোষ্ঠী ও অন্যান্য, তাদের বৃত্তিজীবি জাতিগুলি বিজ্ঞানমনষ্ক তথা বিজ্ঞান সাধক ছিল। তার ফল স্বরূপ তাদের আদিম হাতে জাগর হাঁড়ি নির্মান সম্ভব হয়েছিল।

কইলকা(কইলকা): কলকে, কলিকা, গুড়াখু তামাক ও গাঞ্জার ধূমপান করতে কলিকা ব্যবহার হয়, গাঁঞ্জার ধূমপান করতে কলিকা ব্যবহার হয়, গাঁজার জন্য ছোট আকারের কলকে ব্যবহার করতে দেখা যায়, কেবল কলকে দিয়ে তামাক সেবন যেমন হয় তেমনি হুঁকার উপর বসিয়ে বা গড়গড়ার মাধ্যমেও হয়ে থাকে। ক্লান্তি নিবারণ হবে ভেবে বা অবসর বিনোদনের জন্য পুরুষেরা কলকের সাহায্যে ধূমপান করত। বর্তমানে ধূমপান প্রচলিত থাকলেও কলকের প্রচলন কমে গেছে। নাই বললেও চলে। কলকের ন্যায় দেখতে এক ধরণের ফুল দেখা যায় বলে ঐ ফুলের নাম

কলকে ফুল। গাছটিকে বলে কলকে ফুলের গাছ। এই গাছের ফল খুব বিষাক্ত।

খাপরইল(খাপরই্‌ল/খাপরাল/খাপরৈল): অর্দ্ধ নলাকৃতি মাটির দ্রব্য খাপরই্‌ল ঘর ছাউনির (আচ্ছাদনের) জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে, বুনো ঘাস বা খড়ের ছাউনিযুক্ত ঘর প্রায়শই আগুন লেগে ভষ্মিভূত হয়ে যায় ও যেত। সেক্ষেত্রে পাকাবাড়ি পোড়া মাটির ইট বা পাথরের পাকাবাড়ি নির্মাণের ঘর ও প্রযুক্তির পূর্বে পোড়া মাটির খাপর ছাউনি করে আদিম ভারতীয় খেরওয়াড় মানব গোষ্ঠী যে উপায় উদ্ভাবন করেছিল তাদের বাসগৃহকে আগুনের হাত থেকে বাঁচাতে সেই প্রযুক্তি অবদান খাপরইল, সাধারণত গরীব এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরের ছাউনিতে খাপরইল ব্যবহার বেশি করে দেখা যায়।

দমড়ি: মাটির বাটি, বিভিন্ন মাপের পুরু মাটির তৈরী বাটিতে জল, নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য, খাদ্যের সাথে তরকারি খাওয়ার জন্য এবং লবণ রাখার কাজে ব্যবহার হত। লোহা আবিষ্কারের পর লোহার ছেনি দিয়ে পাথর কেটে থালা বাটি, গ্লাস ইত্যাদি তৈরী করতে শিখলে দমড়ি জাতীয় মাটির পাত্রগুলির ব্যবহার কমে যায়।

মগরা: দুই ফুট থেকে প্রায় সাড়ে তিনফুট লম্বা বেশ মোটা ফাঁপা মাটির নল, বর্ষাকালে জমির বা বাঁধ পুকুরের অতিরিক্ত জল বাইরে বের করতে এবং প্রয়োজনে জমিতে সেচ দিতে বা বাঁধ পুকুরে জল ভরতে ব্যবহার হয়ে থাকে। মগরা জমির বা বাঁধ পুকুরের পাড়ে পুঁতে স্থায়ীভাবে বসানো থাকে। তার ফলে মগরার ভিতর দিয়ে অনায়াসে জল যাতায়াত করে বা প্রবাহিত হতে পারে। তাতে পাড় ধুয়ে ক্ষয় হয় না, অক্ষত থাকে। মগরার সাহায্যে জল নিষ্কাশন বা নির্গমন পদ্ধতি কৃষিজীবি কুড়মি মানুষদের অবদান, কৃষিকাজের সূচনা পর্বেই তারা আবিষ্কার করতে পেরেছিল। প্রথমত পাথরের সাহায্যে ছিদ্রপথ সৃষ্টি করে জলবাহিত করত। পরে মগরা নির্মান ও ব্যবহার শুরু করে। বর্তমানে সিমেন্ট, লোহা, প্লাস্টিক জাতীয় ফাইবার বা মিশ্র ধাতুর বিভিন্ন মাপের নল নানান কাজে ব্যবহার হচ্ছে দেখা যায়। উদ্ভাবন সেই আদি মানব সভ্যতার উষালগ্নে কৃষি সভ্যতা বিকাশের যুগেই হয়েছিল। দক্ষিণবঙ্গে বাঁকুড়া জেলার রাইপুর থানার (বর্তমানে বারিকুল) অন্তর্গত একটি গ্রামের নাম মগরা। পাশের গ্রামটির নাম দুধ্যা। এই গ্রাম দুইটি দুধ্যা-মগরা নামে বিশেষ ভাবে পরিচিত। সম্ভবত পূর্বে কোন সময় ওখানের মানুষ মগরার ভিতর দিয়ে দুধ পরিবাহিত করেছিল বলেই এই নামের উৎপত্তি হয়েছে।

কুপ: খুচরো টাকা পয়সা ঢুকানো যাবে কেবল ততটুকু মাপের একটি মাত্র ছিদ্র বিশিষ্ট সবদিক বন্ধ গোলাকার মৃৎপাত্র, কুপের ছিদ্রে টাকা পয়সা ঢুকিয়ে রাখার পর সেই টাকা পয়সা পুনরায় বেরিয়ে আসে না বা বের করা যায় না। এটাই কুপের

প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিজের টাকা নিজের চোখের আড়াল করে রাখার সহজ উপায় এটা। এভাবে টাকা রাখতে রাখতে অনেকদিন পর বেশ কিছু টাকা কুপের মধ্যে জমা হতেই পারে। তখন বিপদে আপদে বা বড় কোন কাজে লাগানোর জন্য কুপটি ভাঙ্গলে সব টাকা এককালে পাওয়া যায়। সম্ভবত মুদ্রার প্রচলন হওয়ার পর এবং ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে রাঢ়-ঝাড়খন্ডের কুড়মি সহ সমস্ত খেরওয়াড় জাতি গোষ্ঠীর মানুষ নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধিতে কুপের মাধ্যমে স্বল্প সঞ্চয়ের পথ আবিষ্কার করেছিল। কারণ, তারও পুর্বে বা বাংলাদেশের ডঃ মহম্মদ ইউনুস মহাশয় স্বল্প সঞ্চয় নীতিতে নোবেল পুরষ্কার পাওয়ার অনেক আগে থেকে কুড়মি সমাজের প্রতি পরিবারে রান্নার পূর্বে এক মুঠি করে চাল একটি বিশেষ হাঁড়িতে তুলে রাখার নীতি-নিয়ম প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানেও এই নীতি কুড়মিরা পালন করে থাকে। এই হাঁড়িকে ঠাকুরহাঁড়ি বলে। মুদ্রা এবং ব্যাঙ্কের যুগেও ঠাকুরহাঁড়ি কুড়মি ঘরে প্রচলিত আছে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে কুপ কুড়মিদের প্রতি ঘরে দেখা যায় না। আজকাল মাছ, কচ্ছপ, খরগোশ, হরিণ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাণীর মুর্ত্তির আকারের রং বেরংয়ের কূপ পাওয়া যায়। আদিরূপ মেটে রং গোলাকার।

কুঁজআ(কুঁজা): হাঁড়ি কলসী অপেক্ষা ছোট আকারের এবং লম্বা ঘাড় (গলা) বিশিষ্ট ছোট মুখ লম্বাটে গড়নের উপরিভাগ এবড়োখেবড়ো অর্থাৎ অবস্থান করে পুরু মাটির তৈরী করা হয়, কুঁজা যদিও জল পাত্র তবু সাধারণত গ্রীষ্মকালে বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কারণ নির্মান কৌশলে এমনই এক বিজ্ঞান প্রযুক্তি নিহীত আছে যে, কুঁজার জল সাধারণ হাঁড়ি কলসীর জল অপেক্ষা বেশি ঠান্ডা থাকবে। এই বোধ অনুভূত হয়েছিল মানব সভ্যতা বিকাশের প্রথম ধাপে মানুষের মস্তিষ্কে। যখন মানুষ নদী নালার জল মাটির পাত্রের ভরে তাদের ঘরে এনে ব্যবহার করত। বিদ্যুৎ চালিত ফ্রিজ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর যখন অকল্পনীয় ছিল তখনই তারা জল ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে পেরেছিল, জলপত্র নির্মান প্রযুক্তির মাধ্যমে মানব সভ্যতা বিকাশে এটাই হয়তো প্রথম বিজ্ঞান প্রয়োগ। যা বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতেও অপরিবর্তিতভাবে ব্যবহার হচ্ছে। আদিম মানব মননে জলের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েছিল এবং তারই ফলস্বরূপ আদিম মানুষের হাতে মাটির কুঁজার সৃষ্টি।

টব: মেচলা জাতীয় আকৃতির, তলদেশ কোন বিশিষ্ট, উপর অংশ নক্সাযুক্ত, মেচলা অপেক্ষা একটু ছোট খুব পুরু মৃৎপাত্র, বাড়ির ও বাড়ির আশেপাশের সৌন্দর্য্যায়নের জন্য টবের মধ্যে নানা রকমের ছোট প্রজাতির ফুলগাছের চাষ করা হয়, বর্তমান যুগেও মাটির বাড়ি থেকে পাকাবাড়ি এমনকি বৃহৎ অট্টালিকাতেও ফুলচাষের জন্য

টবের ব্যবহার দেখা যায়।

নিত্য ব্যবহার যোগ্য পোড়া মাটির নানাবিধ পাত্র ছাড়াও আরও অনেক প্রকার মাটির দ্রব্য তারা ব্যবহার করত এবং সেগুলিও বানিয়ে পুড়িয়ে নিত। যা সে যুগের জীবনজীবিকায় ও সংস্কৃতি চর্চায় কাজে লাগাত। বর্তমান সভ্য সমাজেও সেগুলির ব্যবহার কমেনি, বরং সমানভাবেই সমাদরে ব্যবহার হচ্ছে। যেমন—

হাতি-ঘঁড়া(হাথি-ঘঁড়া): হাতি ও ঘোড়া, হাতি ঘোড়ার প্রতীকি রূপে মাটির ছোট ছোট হাতি ঘোড়া কুড়মিরা তাদের গ্রাম্য দেবদেবীর উদ্দেশ্যে গরামথানে উৎসর্গ করে থাকে। বিস্মৃত যুগের কোন সময়কাল থেকে কুড়মালি রীতি সংস্কৃতিতে এটা প্রচলিত হয়েছিল তা এখনো জানা যায় না। হয়তো আরও গভীর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আগামী দিনে জানা সম্ভব হবে। কুড়মিদের বিশ্বাস যে, গরাম থানে প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য দেবদেবীগণ কেউ ঘোড়ায় কেউ বা হাতির পিঠে চড়ে তাদের গ্রামকে রক্ষা করতে ঘুরে বেড়ায়। সেজন্যই গরামথানে হাতি ঘোড়ার প্রতীক উৎসর্গ করা হয়। রাঙ্গামাটির দেশ পশ্চিম রাঢ় ঝাড়খন্ডে ব্যাপক প্রচলন হওয়াতে মাটির হাতি-ঘোড়া বেশি ববেশি করে নির্মিত হতে থাকে। ফলস্বরূপ এই মৃৎ শিল্প টেরাকোটার রূপ নেয় এবং বিশেষ মর্যাদাঁও ও সম্মান লাভ করে। আজ বাঁকুড়া জেলা টেরাকোটার জন্য বিখ্যাত। গরামথানে হাতি-ঘোড়া ছাড়াও শিব ঠাকুরের উদ্দেশ্যে শিবথানে কুড়মির জীবন্ত অদন্তা এঁড়ে বাছুর উৎসর্গ করে থাকে। কুড়মিরা শিবকে শিবঠাকুর বলে না। বলে বুড়হাবাপ (বুঢ়াবাপ)। তারা মনে করে কুড়মিদের আদিপিতা বা আদিপুরুষ মহাদিদেব মহাদেব। তবু কিন্তু কুড়মিরা শিবকে শিব, শঙ্কর, মহাদেব ইত্যাদি কোন কিছু না বলে কেবল বুঢ়াবাপ বলেই জানে। বংশধরদের রক্ষণাবেক্ষণ কারণে স্থানান্তরে গমনাগমন জন্য বুঢ়াবাপের বাহন ষাঁড় (অদন্তা) উৎসর্গ করে থাকে, বাৎসরিক পূজার দিনগুলিতে। এই ষাঁড় যথেচ্ছ আহার বিহার করে থাকে। কুড়মিরা বা কুড়মালি এলাকায় অন্য কোনও জাতির মানুষও তাকে বাধা দেয় না।

কাঁঠি: এক ইঞ্চি থেকে প্রায় আড়াই ইঞ্চি লম্বা এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলির ন্যায় মোটা কিন্তু উভয়প্রান্ত ক্রমশ সরু ও মাঝ বরাবর মোটা ছিদ্র বিশিষ্ট পোড়া মাটির দ্রব্য, যা কাঁঠি নামে পরিচিত, এই কাঁঠি সাধারণত মাছ ধরার জালে ব্যবহার হয়ে থাকে। কাঁঠি জালকে জলের নিচে টেনে নিয়ে যায় এবং জালকে পাঁক সংলগ্ন করে রাখে। ফলে জালের ভিতরের মাছ জালের মধ্যে আটকে পড়ে। জাল অনুসারে কাঁঠির প্রয়োজনীয় মাপ নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। আজকাল মোটা আকারের কাঁঠিগুলি লোহার তৈরী পাওয়া যায়। নাম জালকাঁঠি।

তুমড়ি: তুবড়ি, খুব বড় পেঁয়াজের ন্যায় দেখতে ভিতরটি ফাঁপা, উপরের সরু দিকে ছিদ্রযুক্ত মাটির পাত্র, এই পাত্রে বিস্ফোরক বারুদ ভরে রাখা হয় এবং তাকে তুমড়ি (তুবড়ি) বলে। উৎসব অনুষ্ঠানে তুবড়ির মুখে অগ্নি সংযোগ করে দলে বারুদে আগুন ধরে অসংখ্য অগ্নি (কনা) স্ফুলিঙ্গ বিস্ফোরিত হয়ে বিচ্ছুরিত হয়। (মাটি) ভূমিতে রেখে অগ্নি সংযোগ করা হয় বলে এই তুবড়িকে ভুঁইতুমড়ি বলে। সাধারণত রাতের অন্ধকারে জ্বালানো হয়। তখন তুবড়ির অগ্নি কণার উথান পতন দৃষ্টিনন্দন হয়ে থাকে।

মাদইল: মাটির এক প্রকার খোল, এই খোলকে বলে কুঁড়ি, কুঁড়ি নামে স্বতন্ত্র এক প্রকার বৃহৎ মৃৎপাত্র আছে। মাদইলের কুঁড়ির উভয় মুখ খোলা। সেকারণ এই কুঁড়ি কোন পাত্র নয় বাদ্যযন্ত্রের কাঠামো মাত্র। মাদই্‌ল তিন প্রকার। যথা-১. পাখওয়াজের ন্যায় গড়ন ও মাপের। মাটির এই মাদই্‌লকে বলে সুর মাদইল। ২. ধুমড়ি মাদই্‌ল। মাদই্‌লের মধ্যে ধুমড়ি মাদই্‌ল। সবচেয়ে মোটা আকারের হয়। ৩. সাঁওতালি মাদই্‌ল। সাঁওতালি মাদই্‌ল সবচেয়ে বেশি লম্বা হয়। তিনপ্রকার মাদইলই বাদ্যযন্ত্র। অর্থাৎ গীত ঝুমইরের যন্ত্রাণুষঙ্গ। সুর মাদইল ঢুআ (ঢুয়া), বাউল গান, পল্লীগীতি, টুসুগীত ইত্যাদি গানে ব্যবহার হয়। এই মাদইলে তবলা বা পাখওয়াজের বোল বাজানো যায়। কিন্তু তবলা বা পাখওয়াজের মত সুর বাঁধার জন্য গুটকা ব্যবহার হয় না। তালার বেড়িতে ঠোক্কর মেরে সুরমাদইলের সুর বাঁধা হয়। ধুমড়ি মাদই্‌লকে রাঢ়-ঝাড়খন্ডের নানা জাতির সমন্বয় সাধনের প্রকৃষ্ট প্রতীক বলা হয়। এই মাদই্‌ল সবরকম ঝুমইরের (ঝুমুরের) প্রধান বাদ্যযন্ত্র। সবচেয়ে বেশি লম্বা সাঁওতালি মাদই্‌ল সাঁওতালি গীতের বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাঁওতালদের আর একটি অত্যধিক লম্বা বাদ্যযন্ত্র কাঠির সাহায্যে চওড়া দিক বাজানো হয়। বলে থাকে ঢাক। এই ঢাক এত বেশি লম্বা যে, উভয় দিক বাদকের নাগালের বাইরে থাকে। কাঠের অথবা পাতলা লোহার (টিন) পাত দিয়ে তৈরি হয়। তিন প্রকার মাদই্‌লেরই একদিক মোটা ও অপর দিক অপেক্ষাকৃত সরু হয়। ছাউনির পর সরু দিকটি বাদকের ডানদিকে ব্যবহার করে বলে ঐ দিককে ডাইনা বলা হয়।

খউল (খোল): সুর মাদই্‌ল এবং ধুমড়ি মাদই্‌ল অপেক্ষা লম্বা ও ডানদিক ক্রমশ সরু হয়ে একটা নির্দিষ্ট মাপের হয় খোল এর কুঁড়ি, চামড়ার বাধি দ্বারা চামড়ার তালা আচ্ছাদিত করা হলে তখন এই মাটির কুঁড়ির নাম হয় খোল বা শ্রীখোল, শ্রীখোল শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অপরিহার্য্য বাদ্যযন্ত্র, রামায়ন গানেও শ্রীখোল ব্যবহার হয়, খোল বাদ্যের বোল মাদই্‌লের বোলের থেকে আলাদা, সম্ভবত শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের পর মাটির খোল ব্যবহার শুরু হয়, চৈতন্য পরবর্তীকালেই

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বা পদাবলী কীর্ত্তন বহুলভাবে প্রচলিত হয়। বৈষ্ণবগণ খোলকে ব্রহ্ম স্বরূপ মনে করে। তাদের শ্রীখোল প্রণাম মন্ত্রে জানা যায়-

নমস্তে শ্রীজগন্নাথায় গৌরাঙ্গায় নমো নমঃ,
নমস্তে শ্রী শ্রী খোল করতালায় নমো
কীর্ত্তনমন্ডলি।
মৃদঙ্গ ব্রহ্মরূপায় লাবনং রসমাধুরি,
সহস্র গুন সংযুক্তায় শ্রী শ্রীমৃঙ্গায়ৈ নমো নমঃ।।

মূলকাঠামো মাটির কুঁড়ি হওয়ায় বৈষ্ণবরা খোলকে মৃদঙ্গ বলে থাকে। মাটির খোল মৃদঙ্গের জন্ম চৈতন্য যুগে অর্থাৎ পাঁচশত বছরের পুরাতন। মানব সভ্যতার গোড়ার দিকে মাটির বদলে কাঠের খোল (বাদ্যযন্ত্র) ব্যবহার করত। মনসা মঙ্গল কাব্যে সে পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

"খদির কাষ্ঠের খোল, ঘন করে উতরোল
বেহুলা নাচনি সেথা নাচে।

স্বর্গে নৃত্য প্রদর্শন করে বেহুলা সতী তার স্বামী লখিন্দরের পুনর্জীবন ফিরিয়ে আনে। বেহুলার নৃত্যকালে বিভিন্ন সুরযন্ত্রের সাথে নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়েছিল। তার মধ্যে খদির (খয়ের) কাঠের খোল ব্যবহার করা হয়েছিল। মনসা মঙ্গল কাব্য থেকে সেই সাক্ষ্য প্রমান পাওয়া যায়।

বাঁআ (বাঁয়া): বাঁয়া বা বাঁওয়া খলার মত হাঁড়ি কলসীর তলদেশের অর্থাৎ অর্দ্ধেকাংশের ন্যায় দেখতে কানখা থাকে না। চামড়ার ছাউনি দিয়ে তবলার সহযোগী বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে।

মৃৎ পাত্রের অঙ্গ বা স্থান বিশেষে নাম:

কানখা: মাটির পাত্রের একেবারে উপরের যে অংশ কানের মত বাইরের দিকে ঝুঁকে থাকে এবং পাত্রের অঙ্গ অপেক্ষা বেশ পুরু করে বানানো হয়, পাত্র ব্যবহারের সুবিধার্থে যে অংশ হাত দিয়ে ধরার উপযোগী করে গঠন করা হয়, পাত্রের গলার উপরে বাইরের দিকে ঝুঁকে থাকা অংশ, মাটির হাঁড়ি বা হাঁড়া (জালা) ভেঙ্গে গেলে সেই সম্পূর্ণ কানখাটি ধান সিদ্ধ করার উনান, সিআল গাড়হা (শিয়াল গাঢ়া) বা রান্নার উনানের মুখ নির্মান করতে ব্যবহার হয়ে থাকে। তাছাড়া বেড়ির আকারে কানখাটি হাঁড়ি, তাউআ (তাওয়া) ইত্যাদি বসাতে আধার হিসাবেও ব্যবহার হয়।

ঘাড়/গলআ(ঘাড়/গলা):কপড়ি, কলসী এবং কুঁজার ঘাড় থাকে, কানখার নিচে ও পেট বা মোটা ফাঁপা অংশের উপরের অংশ ঘাড় বা গলা, কলসী অপেক্ষা কুঁজার ঘাড় সরু এবং বেশি লম্বা হয়ে থাকে, হাঁড়ি, হাঁড়ার নামমাত্র ঘাড় থাকে। কুঁদা বা

পায়ার গলা কলসীর ন্যায় হয়ে থাকে। জলভর্ত্তি কলসী কাঁখে করে বয়ে আনার সময় মেয়ে মহিলারা কলসীর গলায় হাতের চাপ দিয়ে আনতে পারে। গলা না থাকলে জলভর্ত্তি বারী কলসী কাঁখে (কক্ষে, কোলে) করে বয়ে আনা যাবে না। সেজন্য মাটির পাত্র নির্মানের যুগে, ধাতব যুগের পূর্বেই আদিম মানুষদের যে বিজ্ঞান চেতনা ছিল তা মাটির কলসীর ঘাড় নির্মান প্রযুক্তি (কৌশল) থেকে (দেখে) পরিষ্কার বোঝা যায়। যখন মানুষ নদী নালার জল খাওয়ার জন্য বয়ে আনত, বিশেষত রাঢ়-ঝাড়খন্ডের কুড়মি অধ্যুষিত এলাকার মানুষরা ইংরাজ আমলেও যেভাবে নদী নালার জল মাটির কলসী করে বয়ে এনেছে, বর্তমান নলকূপ, নলবাহিত টেপকলের যুগেও কলসীর ঘাড় বা গলার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অনুভব উপলব্ধি করতে বর্তমান বিজ্ঞানীদেরও ভাবার বিষয় এই মাটির কলসী নির্মান প্রযুক্তি। মাটির পাত্রে অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে মেচলা, বাইন, দন, কুঁড়ি, খলা, খাপরি, সানকি, সরা, খাপইর, তাউআ (তাওয়া), করহাই ইত্যাদি পাত্রগুলির কোন রকম ঘাড় বা গলা তারা নির্মান করেনি। সেকারণ তাদের বিজ্ঞান মনষ্কতা আরও অধিক মাত্রায় প্রতিভাত হয়।

ফাঁইড় (ফাঁঞড়/ফাঁইড়): হাঁড়ি কলসী জাতীয় মৃৎপাত্রের মধ্যদেশ, মাটির পাত্রের সবচেয়ে বেশি ফাঁপা অংশ।

পেঁদআ (পেঁদা): পাত্রের তলদেশ, মৃৎপাত্রের নিম্নাংশ ও পশ্চাৎ দিক।

খুরি: মাটির সাথে তলদেশের ঘর্ষণ নিবারণের জন্য কোন কোন পাত্রের তলায় বেড়ির মত সামান্য উঁচু অংশ, চতুষ্পদ প্রাণীর পা রক্ষাকারী ক্ষুর এর নামে মৃৎপাত্র রক্ষার ব্যবস্থার খুরি নামকরণ হয়েছে।

ক্ষণভঙ্গুর মৃৎপাত্র গৃহস্থালির কাজে কারণে অকারণে ভেঙ্গে যায়। ভাঙ্গতেই পারে। সেই ভগ্ন পাত্রখন্ডের আকার আকৃতি বিশেষে কুড়মালি ভাষায় চিহ্নিত করণে সেগুলির নাম।

খাপতা: বড় আকারের মৃৎপাত্র খন্ড, বন্ধুর এলাকায় বর্ষাকালে স্রোতের জলে ছোট বড় গর্ত সৃষ্টি হয়। সেই গর্তগুলিতে নানা রকম মাছ আশ্রয় নিয়ে জমা হয়। স্রোতের জল বন্ধ করে ঐগর্তের জল খাপতার সাহায্যে ছিটিয়ে গর্তটিকে জলশূন্য করে মাছ ধরতে খাপতা কাজে লাগে। পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলে মাছ ধরতে খাপতার ব্যবহার কত প্রাচীন কালের তা অজানা থাকলেও এখনও প্রচলিত আছে।

খাপতি: খাপতা অপেক্ষা ছোট অথচ খেলামখুঁচি থেকে বড় অর্থাৎ মধ্যম আকারের মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরা, খাপতার মতই খাপতির ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণত কম বয়সী কিশোরদের সহজ সাধ্য হয়ে থাকে। তাছাড়া কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার সরঞ্জাম হিসাবে খাপতির ব্যবহার ব্যাপকভাবেই

দেখা গেছে।

খেলামখুঁচি (খেলামখুঁচি): খোলামখুচি, ভাঙ্গা মৃৎপাত্রের ছোট ছোট টুকরা, যে টুকরা বস্তুগুলির কোন সম্পদ নয় কেবলমাত্র বর্জ্য পদার্থ বলে অপবাদ আছে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বলতে শোনা যায় "তকি খেলাম খুঁচি বঠে যে, বটরাঁঞ আইনে দিবঅ।" কিন্তু খোলামখুঁচি একেবারেই মূল্যহীন পদার্থ নয়। এই টুকরা থেকে খেলার সরঞ্জাম, কাতি খেলার কাতি, চাকি, তকলি ইত্যাদি বহুক্ষেত্রে ব্যবহার হত। বর্তমানে ধাতব পাত্রের যুগে খোলামখুচি দুষ্প্রাপ্র হয়ে গেছে। তাই খেলার সরঞ্জাম, খেলার বস্তু ও চাকি বা তকলি কৃত্রিম উপায়ে তৈরী হচ্ছে এবং বাজারী পণ্য হিসাবে পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে, আবার বিনামূল্যে যা পাওয়া যেত আজ তা দুষ্প্রাপ্য সেইসঙ্গে অপত্য স্নেহ বশতঃ ছেলেমেয়েদের খেলার জন্য বাজারী খেলনা প্রায় প্রতি ঘরেই দেখতে পাওয়া যায়।

দেখা গেল কুড়মালি ভাষায় মাটির পাত্রের ৪০ রকমের (নানান দ্রব্যাদি সহ) প্রকারভেদ আছে। যা শুধুমাত্র বাংলায় কেন কুড়মালির পড়শি-ভাষাগুলিতেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আকার আকৃতির সামান্য পরিবর্তনে মৃৎপাত্রগুলির নামের পরবির্তন একমাত্র কুড়মালিতেই সম্ভব হয়েছে। চুকা, গাডু দ্বারাই প্রমানিত হয় যে, কুড়মালির কাছে অন্য ভাষাগুলি অবশ্যই দুর্বল। এটা কুড়মালি ভাষার ভাব প্রকাশ নাকি অর্থ প্রকাশ ক্ষমতা গভীর তা ভাষাবিদ ভাষা পন্ডিতগণ বলবেন। আমার মাতৃভাষা। এই ভাষায় জন্মাবধি কথা বলি। ফলে সদা সর্বদা ব্যবহার করি। আবার অল্প বিস্তর চর্চাও করি কিন্তু আমি কোন ভাষাবিদ বা ভাষা পন্ডিত নই। তবে একজন ভাষা পন্ডিতের মতই প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ একজন ভাষা ব্যবহারকারীকেউ বিশদে যেমন জানতে হয় ঠিক তেমন ভাবেই আমারও জানা হয়ে গেছে। ভাষাকে জানার জন্য বা পন্ডিত হওয়ার জন্য জানা অপেক্ষা মাতৃভাষা ব্যবহারকারীর জানাই অধিক জানা। একথা আমি একশত শতাংশ বিশ্বাস করি। পাঠক নিজ অনুভূতির সাহায্যে অনুভব করবেন-কুড়মালি ভাষার সমৃদ্ধি ও গভীরতা এবং বিস্তৃতির পরিসর কতখানি।

এবারে প্রবাদ প্রবচন প্রসঙ্গে আসা যাক। কুড়মালি ভাষায় অসংখ্য প্রবাদ রয়েছে। যেগুলি আজও মানুষকে পথ দেখায়। এবং সমান আদরনীয়। কুড়মালি প্রবাদ সমূহ লোকসমাজ থেকে উদ্ভূত, লোকসমাজেই তার স্ফুরণ এবং প্রসারণ। গভীর অর্থবহ এই প্রবাদগুলির গুরুত্ব সীমাহীন। কারণ এর মধ্য দিয়েই ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণ স্পন্দন বিশেষ ভাবে অনুভব করা যায়। মুখে মুখে এদের অধিষ্ঠান। প্রকৃত শ্রুতি এই প্রবাদগুলি, মানুষের জ্ঞান আহরণ কাল থেকে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত। সবঙ্গীনভাবে কুড়মালি প্রবাদের মধ্যে যে চিরায়ত প্রবহমান অভিজ্ঞতা বর্তমান,

প্রবাদ তারই স্বল্পবাচী বাক্যরূপ। যার ধর্ম হচ্ছে-বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর স্বাদ পাইয়ে দেওয়া। আবার প্রবাদ এক ধরণের এক পংক্তির (লাইনের) একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা। লিখিত সাহিত্য সৃষ্টির পুর্বে যে শ্রুতির প্রচলন ছিল, আদিম ভারতীয় লোকসমাজ সেই অলিখিত শ্রুতি সাহিত্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় তাদের এই কুড়মালি প্রবাদগুলির মাধ্যমে। আজও যেগুলি স্মৃতির মাধ্যমে শ্রুতি সাহিত্যরূপে প্রবাহিত হয়ে চলেছে বংশানুক্রমিক ভাবে বংশ পরম্পরায়।

অসংখ্য কুড়মালি প্রবাদের মধ্যে একটি প্রবাদ হলো—

" কলেক ছা গলে, ধুলআক ছা বলে।" (কলেক ছা গলে, ধুলাক ছা বলে)

কলেচ্ছা গলে, ধুলেচ্ছা বলে। কলের ছা গলে, ধুলার ছা বলে।

অর্থ: কোলের শিশু দুর্বল, শীর্ণ হয়; ধুলার শিশু সবল শক্তিধর হয়।

প্রবাদ মধ্যে নিহীত উপদেশ- অধিক যত্ন অযত্নেরই মূল। অতএব শিশুর সুস্বাস্থ্য চাও তো (তাকে) ধুলায় খেলতে (ছেড়ে) দাও।

অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য্য—"কলেক ছা" অর্থাৎ যে শিশুকে বেশির ভাগ সময় কোলে-পিঠে করে রাখা হয়। মাটিতে নামতে দেওয়া হয় না। একোল সেকোল করে বড় (লালন পালন) করা হয় সেই শিশু। "গলে" অর্থাৎ দুর্বল শীর্ণ হয়। অনেক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে না। আবার "কলেক ছা" অর্থে- কোলের শিশু বলতে যে বয়স পর্যন্ত্য শিশুকে কোলে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। জন্মের পর থেকে সেই বয়সের শিশু। নইলে, মা-বাবার কাছে প্রাপ্রত বয়স্ক ছেলেমেয়েরাও "ছা" অর্থাৎ শিশু বা সন্তান।

প্রবাদের দ্বিতীয় অংশ-"ধুলাক ছা (বলে)" অর্থাৎ যে শিশু অধিক সময় (ঘরের) ধুলার সংস্পর্শে থাকে। কোলে নেওয়ার সময় এবং লোকের অভাব হেতু সেই শিশু ঘরের ধুলার মধ্যে খেলা করে, ধুলা মাখে, ধুলায় গড়াগড়ি দেয়, ধুলিধুসরিত অবস্থায় ক্ষুধা পেলে কান্নাকাটি করে। তখন তার মা এসে (অগত্যা) দুধ (বুকের) খাওয়াতে খাওয়াতে হয়তো কিছু ধুলা ঝেড়ে দেয় এবং ঘুমিয়ে গেলে ধুলিমাখা অবস্থাতেই (মেঝেতে) শুইয়ে রেখে আবার কাজে মন দেয়। না ঘুমালে মেঝেতেই ছেড়ে (নামিয়ে) রেখে দিয়ে পুনরায় কাজে যায়। এই শিশুই প্রবাদের "ধুলাক ছা"। অর্থাৎ ধুলার শিশু।

(ধুলাক ছা) বলে," প্রবাদের এই দ্বিতীয় অংশে "বলে" অর্থে বলবান হয়। শক্তিধর হয়। অনেক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সঞ্চয় করে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে নিরোগ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

প্রবাদটির (আংশিক) আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা লব্ধ ব্যাখ্যা। সংবাদ

প্রতিদিন ১০ মে শনিবার। পৃষ্ঠা-৭, ১ ম কলম, টুকরো খবর-এ (প্রকাশ) লন্ডন (রয়টার) শিশুদের হাঁপানি এবং অ্যালার্জি থেকে বাঁচাতে ঘর গেরস্থালির ধুলোর বিস্ময়কর কারসাজি আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানীরা। ঘরের ধুলোর মধ্যে এক ধরণের ব্যাকটিরিয়া থাকে। নাম এনডোটক্সিন। এই এনডোটক্সিন অ্যালার্জি সংক্রমণে বাধা দেয় তার ফলেই হাঁপানি প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায় শিশুদের। জানিয়েছে ডেনভার এবং কলোরাডোর ন্যাশনাল ডিউইশ মেডিকেল এন্ড রিসার্চ সেন্টার।

এবিষয়ে প্রত্যক্ষ তথা জীবন্ত ও বাস্তব প্রমান:- পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল, ঝাড়খন্ড, বিহার এবং ওড়িষা প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে লোধা-শবর-খেড়িয়া জাতিগোষ্ঠীর মানুষজনদের জীবন, জীবিকা, স্বাস্থ্য এবং রোগ-অসুখ চিকিৎসা সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, ঐ সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর মানুষ এখনও অরণ্যচারী। আদিমতার ছাপ তাদের জীবন জীবিকায়, আচার আচরণে। কৃত্রিম খাদ্য প্রায় ব্যবহার করে না। শয্যা বলতে মাটিতে ঘুমায়। ফলে সদ্যজাত শিশুটিরও ভূমিষ্ট হওয়ার পর থকে ভূমিতেই তার শয়ন, অশন, খেলাধুলা, বিশ্রাম সবকিছুই হয়ে থাকে । এদের অসুখ বিসুখ এবং চিকিৎসার খোঁজ নিয়ে দেখা যায় সচরাচর হাসপাতালে এই জাতিগুলি রোগী পাওয়া যায় না। অথচ সভ্যজাতির রোগী সংখ্যা শীট সংখ্যার চেয়ে বেশি থাকে সব ঋতুতে, সবদিন। যেকোন হাসপাতালে আউটডোরের খাতাতেও এদের নাম পাওয়া যাবে না। শৈশবে তথা বাল্যাবস্থা থেকে বৃদ্ধাবস্থা অর্থাৎ সারাজীবন এরা ধুলায় ভূমিশয্যা ব্যবহার করে থাকে। তাই এদের শিশুরাও ভূমিশয্যাতেই বড় হয়। শিশুর যত্নের জন্য এরা বর্তমানেও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তথাকথিত সভ্য সমাজের মত শিশু বিশেষজ্ঞ কোনরকম পরামর্শ নেয় না। কৃত্রিম খাদ্য, প্রসাধন সামগ্রীই শিশুকে দেয় না। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার জন্য কোন ক্রীম, লোশন বা মলম বাচ্চার জন্য ব্যবহার করে না। জুতা, মোজা, গরম পোষাক তাও না। এরাই কিন্তু নিরোগ দেহধারি। আবার খেড়িয়া জাতির বৈশিষ্ট্যই হলো, স্নান না করা। যে ব্যক্তি স্নান না করে কুড়মালিতে তাকে খাইড়আ (খাইড়া) বলে। খাইড়া কথাটি লেখার ক্ষেত্রে খেড়িয়া হয়ে গেছে। বাংলা ভাষাভাষি মানুষেরা কুড়মালি শব্দ খাই্ড়া উচ্চারণ করতে পারে না বলেই এই বানান বিভ্রাট। এটা তাদের জীহ্বার দুর্বলতা ছাড়া কিছু নয়। উক্ত বিষয়গুলি "ধুলাক ছা বলে" তার বাস্তব প্রমানের সংকেত মাত্র। বিশ্লেষণ অবশ্যই দীর্ঘায়িত হবে।

অভিমত: বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞানীরা যেটা আবিষ্কার করলেন ২০০০ খৃষ্টাব্দে তা নিঃসন্দেহে মানব সমাজের কল্যাণ সাধন করবে কিন্তু কুড়মালি প্রবাদটি অনুরূপ কথাই বলে আসছে, তার হাজার হাজার বছর পূর্বকাল থেকে। কোন সময়কালে

কোন গবেষণা কেন্দ্রের পরীক্ষার পর কুড়মিরা অর্থাৎ খেরওয়াল জাতিগোষ্ঠীর আদিম ভারতীয় মানুষজন এই ঘর গেরস্থালির ধুলোর বিস্ময়কর কারসাজির (গুণের) কথা জানতে পেরেছিল তার সঠিক কোন প্রমান বা ইতিহাস এখনো না জানা গেলেও, একথা অবশ্যই বলা যায় যে, খেরওয়াড় আদিম জনজাতি গোষ্ঠীর অন্তর্গত কুড়মিরাও আর্য্যপূর্ব ভারতীয়। অর্থাৎ ভারতবর্ষের (জম্বুদ্বীপের) আদিম অধিবাসী এবং বিশ্বের অন্যতম কৃষি সভ্যতার স্রষ্টা ভারতের ভূমিপুত্র প্রকৃতি পূজারী। যখন বর্তমান বিজ্ঞানের জন্ম নাই তখনই কিন্তু কুড়মিরা বর্তমানের বিজ্ঞানীর সমধিক বিজ্ঞান মনস্ক ও গবেষক ছিল। যার ফলস্বরূপ এই অমূল্য প্রবাদের সৃষ্টি। আমার মনে হয়, ঘর গেরস্থালির ধুলোর আরও অনেক এবং সূক্ষ্ম গবেষণার প্রয়োজন আছে। তা প্রবাদটির "ধুলাক ছা বলে", এই "বলে" কথাটির মধ্যেই নিহীত আছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি "বলে" অর্থে বলবান হয়, শক্তিধর হয়। নিরোগ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। ন্যাশনাল ডিউইশ মেডিকেল এন্ড রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানীগণ কেবলমাত্র এনডোটক্সিন ব্যাকটিরিয়ার খোঁজ পেয়েছেন ঘর গেরস্থালির ধুলো গবেষণা করে। যা অ্যালার্জি সংক্রমণে বাধা দেয় তার ফলেই হাঁপানি প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে গেলেই "বলে"। অর্থাৎ শিশুটি বলবান স্বাস্থ্যবান, নিরোগ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে নাকি ঘরের ধুলোর মধ্যে আরও এমন কিছু গুন আছে যা বর্তমান বিজ্ঞানের টীকা আবিষ্কারের ন্যায় সারা জীবনের জন্য নানা প্রকার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে অথবা সংক্রামক রোগজীবাণুকে নিষ্ক্রিয় নপুংসক করে সংক্রমণ ছড়ানো বন্ধ করে দেয় এবং বাহকের দেহেও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। যেহেতু " চাকে সঞ্চিত ফুলমধুর পাঁচ শতাংশ ভাগ উপাদান বা বস্তু এখনো বর্তমানের বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করতে পারে নাই।"-কে,ডি, মুখার্জী, আন্তজার্তিক মধুমক্ষিকা পালন প্রশিক্ষক, পশ্চিমবঙ্গ। ১৯৯৭, অমরকানন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাদল আশ্রম, বাঁকুড়া। (মৌখিক আলোচনার অংশ) তদ্রুপ "ধুলাক ছা বলে" প্রবাদাংশটি নিয়ে বিজ্ঞানীদের আরও হয়তো শত শত বা হাজার হাজার বছর ভাবতে হতেই পারে। আবার এরকম হাজার হাজার কুড়মালি প্রবাদ রয়েছে। যার প্রত্যেকটি মানুষকে পথ দেখাতে পারে। সঠিকভাবে নিঙড়াতে পারলে অমৃত রস ঝরে পড়বে নিঃসন্দেহে; একথা জোর দিয়েই বলতে পারি। বিলাত দেশের লোকেরাও স্বীকার করে Prevention is better than Cure যা, প্রিভেন্স ইজ নট অনলি বেটার বাট চিপার দ্যান কিওর অলসো। এক্ষেত্রে কুড়মালি সংস্কৃতির সহরই (বান্দনা/বাঁদনা) পরবে গরু জাগানোর শেষে প্রাতঃকালে গ্রামের কুলহির একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত্য ডহরউআ গীত-বাদ্য ও নৃত্য সহযোগে শিশুদের শরীরে ধুলা লাগানোর প্রত্যক্ষ Practical

আচরণ একটি বাৎসরিক আচরণীয় "লে-হাসি" অনুষ্ঠান বিচার্য্য বিষয়।

আলোচ্য প্রবাদ-এর বয়সঃ যেহেতু সিন্ধু সভ্যতার কাল থেকে ২০০০ খৃষ্টাব্দের বিজ্ঞানীদের পূর্বে অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ সময়কালে বিশ্বের কোন জাতি বা সমাজ ঘর গেরস্থালির ধুলোর এমন কথা বলতে পারে নাই। সেইহেতু তৎকালীন বিশ্ব সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর সভ্যতা যা সিন্ধু সভ্যতা নামে পরিচিত, তার স্রষ্টা খেরওয়াড় নামের ভারতীয় আদিম জনজাতি গোষ্ঠী। বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদ, জাতিতত্ত্ববিদ, পুরাতত্ত্ববিদ এবং ইতিহাসবিদগণ ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পর তাঁদের নিজ নিজ গবেষণার ফল গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে প্রমান করেছেন যে, ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন কৃষি-সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা ছিলেন ভারতের ভূমিপুত্র প্রকৃতি পূজারী আদিম জাতিগণ। সেই সুসভ্য যুগের উন্নততম বিজ্ঞান গবেষণার ফল যা "কলেক ছা গলে, ধুলাক ছা বলে" এই কুড়মালি প্রবাদ রুপে শ্রুতির মাধ্যমে আদিম ভারতীয়দের মুখে মুখে ফল্গুধারার মতোই আজও বেঁচে আছে বংশ পরম্পরায় বংশানুক্রমে। এদিকে ২০০০ খৃষ্টাব্দ ওদিকে সাড়ে ছড় হাজার খৃষ্টপূর্বাব্দ এবং সিন্ধুসভ্যতার স্থায়িত্বকাল আড়াই হাজার বছর হলে মোট প্রায় ১০, ০০০ (দশ) হাজার বছর আগেই কুড়মিরা ধুলোর বিষয়টি আবিষ্কার করেছিল। প্রবাদটি যে সিন্ধু সভ্যতার যুগের তার আরও প্রমান- হরপ্পা লিপির সাথে কুড়মিদের ৭০ (সত্তর) টি বঁসদাগ (বংশ প্রতীক চিহ্ন) এর মিল খুঁজে পাওয়া গেছে।

এই সমস্ত কারণে প্রমানিত হয় যে, কুড়মিদের মধ্যে বর্তমানে বিজ্ঞান চর্চা বা গবেষণা না দেখা গেলেও তাদের পূর্বপুরুষগণ উন্নত এবং সূক্ষ্ম স্তরের বিজ্ঞান সাধক ছিলেন। সেজন্যই কুড়মালি সংস্কার সংস্কৃতির যাবতীয় বিষয়গুলি বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তার ফলেই হাজার হাজার বছর ধরে আজও স্বমহিমায় অম্লান ভাবে টিকে আছে।

প্রবাদ প্রসঙ্গে প্রবাদ-

"বরং গাভীর দুধ তিত হয়, তবু প্রবাদ কভু মিথ্যা নয়।"

(মালয়ালম প্রবাদ)

সম্ভবত ২/৪/২০১৭ তারিখে টি.ভি.-র পর্দায় ২৪ ঘন্টা চ্যানেলে দেখা গেছে যে, "শিশু ধুলা মাখছে, নোংরা ঘাঁটছে, ঐ হাতেই খাবার খাচ্ছে। তাতেই সুস্থ সবল স্বাস্থ্যবান হবে, ঘাঁটতে দিন।

বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান ও শিশু বিশেষজ্ঞরা কুড়মালি প্রবাদটির সত্যতা মেনে নিয়ে বাস্তবে প্রয়োগের পরামর্শ দিচ্ছেন। এটা কুড়মি কুড়মালির গৌরব।

কুড়মালি ভাষার নবদিগন্ত: প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, লিপি সমস্যা ও বানান-বিতর্ক

ড. অশোক কুমার মাহাত

ভূমিকা:

আমি কুড়মালি ভাষার বিশেষজ্ঞ নই, তবু এ বিষয়ে আমার আগ্রহী হওয়ার কয়েকটা সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। প্রথমতঃ কুড়মালি আমার কাছে এক গভীর ভাবাবেগের ভাষা, তাই এ ভাষার বিচরণভূমি থেকে কর্মসূত্রে দূরে অবস্থান করলেও কুড়মালিতে লেখা সাময়িক পত্রপত্রিকা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক রচনার সঙ্গে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করে চলেছি। দ্বিতীয়তঃ কর্মসূত্রে আমি অন্য একটি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণার সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে দুটি ভাষার তুলনামূলক অনুশীলনে আমার ব্যক্তিগত জ্ঞানলাভের স্বার্থ আছে। তৃতীয়তঃ পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে কুড়মালি ভাষার ভৌগোলিক ক্ষেত্র হিসাবে যতটা বিস্তৃত অঞ্চল বলা হয়ে থাকে বাস্তবে তার পরিধি ক্রমশঃ কমে আসছে। একথা সত্য যে কয়েক প্রজন্ম আগে ছোটনাগপুর মালভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কুড়মালি সমগ্র কুড়মি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা ছিল। সেই সঙ্গে সমসংস্কৃতিসম্পন্ন কয়েকটি প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের যোগাযোগ রক্ষার ভাষা হিসাবে এ ভাষার ব্যবহার ছিল এ অঞ্চলে একদা অপ্রতিহত। কিন্তু পরবর্তী কালে এই ভৌগোলিক ক্ষেত্রের কিয়দংশে তাঁদের উত্তরপুরুষদের মুখ থেকে সেই ভাষা ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে। মাতৃভাষা ও পরম্পরাপ্রাপ্ত সংস্কৃতির প্রতি অনাস্থা ও অনাদর একটি বড় কারণ। তার ওপর আঞ্চলিক বিভাজনের দ্বারা একই ভাষাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সরকারি স্বীকৃতির প্রদানের মাধ্যমে কুড়মালির ভাষাক্ষেত্রকে পরিকল্পিত উপায়ে সঙ্কুচিত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তার ব্যবহারসীমা ক্রমশঃ কৃত্রিমভাবেও ক্ষয় পেয়েছে। এই উভয় কারণে আপন উৎসভূমিতেই কুড়মালি আজ যেন অবলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। তাই সেই ভাষার উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও

অবক্ষয় তথা সমকালীন বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান বিষয়ে যথাসম্ভব আলোকপাত করতে পারলে সেটাকে আমি সামাজিক ঋণশোধ বলে মনে করব। চতুর্থতঃ এই ভাষাচর্চার অঙ্গনে সাম্প্রতিক কালে যে ধরণের অমূলক ও উদ্ভ্রান্ত ধারণার বিস্তার ঘটে চলেছে তা মোটেই অভিপ্রেত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারবে না। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যুক্তিগ্রাহ্য ও যুগোপযোগী চিন্তায় আগ্রহী করে তোলাও আমার এ বিষয়ে বলতে চাওয়ার অন্য একটি কারণ বলে পরিগণিত হতে পারে। যদিও আমার এই উৎসাহে যথেষ্ট ঝুঁকি আছে, কারণ বেশ কিছু অমূলক মতবাদ সমাজে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে আছে যে সেই ধারণার মূলে আঘাত করলে আমাকে অনেকের রোষের স্বীকার হতে হবে। তবু ভালো কিছু ফলের আশা না রেখেই কিছু কথা আমাকে বলতে হবে, যেটাকে আমি সামাজিক কর্তব্য বলেই মনে করে আপনাদের নিকট দু-চার কথা উপস্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছি।

সাম্প্রতিক শুভারম্ভ:

কুড়মালি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পুরনো হলেও সম্প্রতি এ নিয়ে চর্চা একটি নতুন মাত্রা লাভ করেছে। পুরুলিয়ার সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান শিক্ষাবর্ষ (২০২১ ২০২২) থেকে এই ভাষায় স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠদান আরম্ভ হয়েছে। বিগত কয়েক বছর আগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ রামানন্দ সেন্টিনারি কলেজে (২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে) এবং পরবর্তী শিক্ষাবর্ষ থেকে (২০১৮-২০১৯) আরও দুটি কলেজে (আড়ষা কলেজ ও চিত্ত মাহাতো মেমোরিয়াল কলেজ) স্নাতক শ্রেণীতে সাধারণ বিষয় হিসাবে কুড়মালি ভাষায় পঠন-পাঠনের সূচনা হয়েছিল। সম্প্রতি সেই কলেজগুলিতে সাম্মানিক বিষয় হিসাবেও কুড়মালি পড়ানো শুরু হয়েছে। সুতরাং এটাকে পশ্চিমবঙ্গে কুড়মালি ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে নবযুগের শুভারম্ভ বলে মনে করা যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে অনেক সংগ্রামের মাধ্যমে এই পর্যন্ত প্রাপ্তি ঘটেছে।

সঙ্কটের পটভূমি:

এখন প্রশ্ন হল কুড়মালি ভাষার এই নবজাগরণের প্রয়োজন কোথায় ? কিংবা বলা ভালো এর ফলে জনসাধারণের কী এমন উপকার সাধিত হবে ? ভাষা ও সংস্কৃতি হল কোনও জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় পরিচয়বোধক বৈশিষ্ট্য। বিশেষত তা যদি কোনও জনজাতি হয় তাহলে তার অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনেই এগুলো অত্যাবশ্যক। কুড়মি জনজাতির নাম অনুসারে ভাষাটির নামকরণ হয়েছে কুড়মালি। ছোটনাগপুর মালভূমি একটি জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল যেখানে প্রাচীনকাল থেকে নানা জনজাতি একসঙ্গে বাস করে আসছেন। প্রত্যেক জনজাতির নিজস্ব একটি ভাষা থাকাই

স্বাভাবিক। সেটা আবশ্যিকও বটে, না হলে তার স্বাতন্ত্র্যই ব্যাহত হয়। ছোটনাগপুর মালভূমির ক্ষেত্রে এটা ভীষণভাবেই প্রযোজ্য। এখানে সাঁওতাল জনজাতির ভাষা সাঁওতালি, মুণ্ডা জনজাতির মুণ্ডারি, কোল (হো) জনজাতির কোল (হো), ওঁরাও জনজাতির কুড়ুখ ইত্যাদি। সেই সূত্রে বলা যায় কুড়মি জনজাতির ভাষা হল কুড়মালি। তবে কুড়মি জনজাতি বর্তমানে অনুসূচিত জনজাতি তালিকাভুক্ত নয়। এ অঞ্চলে কুড়মিদের সংখ্যাধিক্যের কারণে পাশাপাশি বসবাসকারী অনেক জনগোষ্ঠী যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবেশী হিসাবে তাঁদের সঙ্গে বাস করে আসছেন, তাঁরাও কুড়মালি ভাষায় কথা বলে থাকেন। কুড়মিদের প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীরা প্রাথমিকভাবে যোগাযোগ রক্ষার জন্যেই এ ভাষার ব্যবহার করতেন, পরবর্তী সময়ে এটি তাঁদেরও মাতৃভাষায় পরিণত হয়।

কিন্তু নিদারুণ বাস্তব একটি বিষয় হল কুড়মি জনজাতি বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে এমন কিছু আত্মঘাতী ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় থেকেছে যে আর অল্পদিনের মধ্যেই তার ভাষা, সংস্কৃতি, লোকাচার ইত্যাদির সঙ্কট অনিবার্য্য। মাতৃভাষার গুরুত্বকে উপেক্ষা, কখনও বা বিস্মরণ এবং সেই সঙ্গে আপন সংস্কৃতির অবহেলা- সমস্তরকম নেতিবাচক মানসিকতারই শিকার কুড়মি সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। একদিকে পরম্পরাগত সংস্কৃতিকে বর্জন করে বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুসারী রীতিনীতিকে বরণ করা এবং অপরদিকে মাতৃভাষার ব্যবহার না করে বহিরাগত ভাষাকে ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা- এই দুই আত্মঘাতী প্রবণতায় দীর্ণ কুড়মি সমাজের একটি বিরাট অংশ। এমনকি কুড়মালি নামটি কুড়মিদের কাছেই ক্রমশ অবহেলিত হয়ে উঠেছে। ছোটনাগপুর মালভূমিতে কুড়মালি, নাগপুরী, খোরঠা, পাঁচপরগনিয়া- এগুলি একই ভাষার আঞ্চলিক রূপভেদ মাত্র। আবার এদের মধ্যে নাগপুরী রূপটি সাদরি, সাদানি ও গাঁওয়ারি নামেও পরিচিত। তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে যে আঞ্চলিক ভাষা (মানভূমিয়া) প্রচলিত তা ও এই ভাষাগুচ্ছের মধ্যে স্থানলাভের যোগ্য। এগুলো একই ভাষার সামান্য রূপভেদ, আবার কখনও কখনও নামভেদ মাত্র, তবু তাদের সমান্তরালভাবে ছুটে যাওয়ার প্রবণতা বড়ই বেদনাদায়ক। আমরা দেখি রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিবাসী ও ক্ষেত্রীয় ভাষা বিভাগে কুড়মালি, নাগপুরী, খোরঠা ও পাঁচপরগনিয়া এগুলি পৃথকভাষা হিসাবে গণ্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এদের সবারই পাঠ্যক্রমে প্রাচীন সাহিত্য হিসাবে মোটামুটিভাবে একই কবিদের কাব্য স্থানলাভ করেছে। বর্জুরাম, দীনা তাঁতি, ভবপ্রীতানন্দ, বিনন্দিয়া সিংহ, গৌরাঙ্গিয়া এই সমস্ত কবিদের ঝুমুর উক্ত সব ভাষারই পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত। এরকম হলে এগুলি পৃথক ভাষারূপে গণ্য হবে কী করে? আধুনিককালে সাহিত্যচর্চা বা গবেষণাকর্মে যাঁরা যুক্ত

হয়েছেন তাঁরা কুড়মালি নামের পাশাপাশি ভিন্ন নামগুলিও ব্যবহার করছেন। এমনকী কুড়মি সম্প্রদায়ের কবি সাহিত্যিকরাও কুড়মালি নামের পরিবর্তে কোথাও খোরঠা, কোথাও বা পাঁচপরগনিয়া নাম ব্যবহার করে কার্য্যত একই ভাষার চর্চা করে চলেছেন। এর চেয়ে হাস্যকর ও আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত কী আর হতে পারে? এই প্রতিকূলতার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে কুড়মালি ভাষাকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসা জীবনরেখার লক্ষণ বই কী। সুতরাং পুরুলিয়ার কয়েকটি কলেজ ও সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে কুড়মালিকে পাঠ্যবিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ আসলে একটি নবযুগের সুচনা। তাই বলা যেতে পারে কুড়মালি ভাষাকে অবলম্বন করেই তৈরি হতে চলেছে পশ্চাৎপদ এক জনসমুদায়ের নতুনভাবে আত্মপরিচয়ের ঘোষণা। মাতৃভাষা ও চিরাচরিত সংস্কৃতির উপযুক্ত সম্মানজ্ঞাপন ও পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে এটা একটা সাহসী পদক্ষেপ।

পাঠ্যবিষয় কুড়মালি:

বর্তমানে কুড়মালি ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের সরকারস্বীকৃত ভাষাগুলির অন্যতম। বিহার ভেঙে ঝাড়খণ্ড রাজ্য তৈরি হওয়ার বহু আগে ১৯৮০ সালে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনজাতীয় এবং ক্ষেত্রীয় ভাষাবিভাগে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে ক্ষেত্রীয় ভাষা হিসাবে কুড়মালির পঠন-পাঠন শুরু হয়। একই সঙ্গে নাগপুরী, পাঁচপরগনিয়া এবং পরবর্তী কালে খোরঠা ভাষারও। ঝাড়খণ্ড রাজ্য স্থাপিত হওয়ার পর সে রাজ্যে নানা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে কড়মালি বিভাগ খোলা হয়। বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে কুড়মালি ভাষার পঠনপাঠন চলছে। সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্যে লেখা হচ্ছে নানা ধরণের বই। এ ভাষার লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার যে সমৃদ্ধ তা সর্বজনবিদিত। সেই সাহিত্যের মধ্যে আছে লোকসঙ্গীত (ঝুমুর), প্রবাদ প্রবচন, লোককাহিনী প্রভৃতি। কিন্তু উচ্চশিক্ষার জন্যে প্রয়োজন আধুনিক কালের পাঠ্যবিষয়। সে কারণে বর্তমানে প্রয়োজনের তাগিদে এই ভাষায় কিছু আধুনিক সাহিত্যেরও রচনা হচ্ছে। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় তা একেবারেই অপ্রতুল। তাই এখন এই ভাষায় নতুন নতুন সাহিত্য রচনার প্রয়োজন- যা বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের পাঠের উপযোগী বিষয় হিসাবে কাজে লাগবে।

কুড়মালি ভাষার ভৌগোলিক ক্ষেত্র:

সাধারণভাবে কুড়মালি ভাষার মূল ভৌগোলিক ক্ষেত্র হল মধ্য-পূর্ব ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল। বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্য ও তার সন্নিহিত পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার কয়েকটি জেলায় এই ভাষাভাষীদের বসবাস। ছোটনাগপুর মালভূমি একটি বহুভাষিক অঞ্চল এবং ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষাগুলির

বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। ভাষাতাত্ত্বিকগণ এখানকার ভাষাগুলিকে ইন্দো-আর্য্য, দ্রাবিড়ীয় ও অস্ট্রিক- এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এদের মধ্যে অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রধান ভাষাগুলি হল- সাঁওতালি, মুণ্ডারি, হো, খাড়িয়া ইত্যাদি। আবার দ্রাবিড়ীয় ভাষাপরিবারের ভাষাগুলি হল কুড়ুখ ও মালটো। এ ছাড়া ইন্দো-আর্য্য ভাষাগোষ্ঠীতে আছে নাগপুরী, খোরঠা, পাঁচপরগনিয়া ও কুড়মালি। এই শেযোক্ত বর্গের ভাষাগুলিকে একই ভাষার আঞ্চলিক রূপ হিসাবে মনে করা যেতে পারে, যদিও তারা পৃথক পৃথক নামের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী। মোটামুটিভাবে ঝাড়খণ্ডের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে নাগপুরী, উত্তর ও উত্তরপূর্বে খোরঠা, পূর্বাঞ্চলে পাঁচপরগনিয়া এবং মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে কুড়মালির ব্যবহার দেখা যায়। ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলায় এবং পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার কিয়দংশে কুড়মালি ভাষা ব্যবহৃত হয়। এই হল কুড়মালি ভাষার একটি সম্ভাব্য ভৌগোলিক ক্ষেত্র।

ঔপনিবেশিক আমলে ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে অসম রাজ্যের চা-বাগানে বহু জনজাতীয় মানুষকে শ্রমিক হিসাবে নিয়ে যাওয়া হয়। এই মালভূমি অঞ্চল থেকেই অনেক মানুষকে সমতল বঙ্গের নদীয়া, চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি জেলার বহু স্থানে নীলচাষের জন্যে এবং সুন্দরবন অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্যে শ্রমিক হিসাবে চালান দেওয়া হয়। বর্তমান বাংলাদেশের বহু স্থানে কুড়মি সহ অন্যান্য সমগোত্রীয় জনগোষ্ঠীর বসবাস লক্ষ্য করা যায় যাঁদের পূর্বপুরুষদের একই উদ্দেশ্যে এই মালভূমি থেকেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এখনও এই সমস্ত অঞ্চলের স্থানান্তরিত মানুষদেরও মুখের ভাষা ছোটনাগপুরের ভাষাগুলি, যাদের মধ্যে আছে কুড়মালিও। তাহলে দেখা যাচ্ছে- আমাদের আলোচ্য কুড়মালি ভাষা তার উৎসভূমিতে অবহেলিত হলেও ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে একদা সম্প্রসারিত হয়ে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে।

বিভাজনের রাজনীতি:

ছোটনাগপুর মালভূমির ইন্দো-আর্য্য ভাষাপরিবারের যে রূপবৈচিত্র্য পর্যালোচনা করা হল তাতে বর্তমানে সর্বত্রই ভাষাটি এক নামে পরিচিত না হলেও তার মূল কাঠামো যে একই, তাতে কোনও কষ্টকল্পনা নেই। সব ভাষারই যেমন অঞ্চলভেদে অনেকগুলি রূপভেদ থাকে, এরও তেমনি আছে নানাবিধ আঞ্চলিক বৈচিত্র্য। আগেই বলা হয়েছে, অনার্য্য অধ্যুষিত ছোটনাগপুরে কুড়মি জনজাতির মাতৃভাষা কুড়মালি। এই নামটিই সেই পরিচয় বহন করছে। সেই কুড়মালি ভাষার আদিম অনার্য্য রূপটি বর্তমানে নানা অভিঘাতে সঙ্কুচিত, অস্বচ্ছ ও ক্রমক্ষীয়মাণ। বহু

বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তা এখন ইন্দো-আর্য্য ভাষার মাগধী প্রাকৃতজাত রূপের আধারে আশ্রয়প্রাপ্ত। তাই আদিতে অনার্য্যভাষা হলেও বর্তমানে তাকে নিজস্ব শব্দভাণ্ডারের অংশমাত্র ধারণ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। বহিরাগত ইন্দো-আর্য্য ভাষার অভ্যন্তরে স্থানলাভ করেই বজায় রাখতে হয়েছে তার আপন অস্তিত্বকে। ইন্দো-আর্য্য ভাষাভাষীদের এতদঞ্চলে অভিগমন এবং তাঁদের ব্যবহৃত ভাষার ক্রমবর্ধমান চাপের ফলেই কয়েকটি অঞ্চলে নাগপুরী, খোরঠা, পাঁচপরগনিয়ার উদ্ভব হয়। কুড়মিদের বাসভূমির কেন্দ্রীয় অঞ্চলেই কুড়মালি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। চতুষ্পার্শ্বের চাপে সে ভাষা নিজের শুদ্ধতা পুরোপুরি বজায় রাখতে পারেনি। নাগপুরী ভাষার আরও কয়েকটি নাম আছে, যেমন- সাদরি, সাদানি, গাঁওয়ারি প্রভৃতি। এই নামগুলি যে আঞ্চলিক রূপভেদে একই ভাষার ভিন্ন নাম মাত্র, সেটা বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না। একই ভাষার আঞ্চলিক বিভাজন আসলেও কোনও এক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে কুড়মিদের বিভেদবোধকে জাগিয়ে রাখতেই কোনও কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর একটা প্ররোচনা।

নামের বানানবৈচিত্র্য:

এবার কুড়মালি নামটির বানানবৈচিত্র্য বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কুড়মালি- এই নামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরও যে কয়েকটি নাম প্রতিপক্ষ হিসাবে এগিয়ে আসতে পারে তারা হল- কুড়মালী, কুরমালী, কুর্মালী, কুর্মালি, কূর্মালি, কুর্মালি ইত্যাদি একগুচ্ছ নাম। এই সমস্ত নামকরণের ক্ষেত্রে নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করেছেন বিশেষজ্ঞরা। কারও কারও মতে 'কূর্মালি" শব্দটি সংস্কৃত কূর্ম শব্দ থেকে উৎপন্ন। তাঁদের অনুমান "কূর্ম" শব্দ থেকে জাতিবাচক কূর্মী শব্দের উদ্ভব এবং এই কূর্মী জনগোষ্ঠীর ভাষা হল কূর্মালী (বানানভেদে কূর্মালি)। অন্য একটি মতে "কৃষিকর্মী" শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হল 'কর্মী", আর এই 'কর্মী" শব্দের একটি তদ্ভব রূপ হল 'কুর্মী' বা 'কুর্মি"। এই কুর্মি জনগোষ্ঠীর ভাষা হল কুর্মালী (বানানভেদে কুর্মালি বা কুরমালী)। এই মতগুলিকে আমরা মোটেই সমর্থন করি না এবং এজন্যে আমরা এই নামগুলি বর্জনের পক্ষপাতী।

ব্যাপারটা একটু স্পষ্ট করে বলা যাক। 'কুর্মি' ও 'কুড়মি'- এই দুটি শব্দের উচ্চারণ কাছাকাছি হলেও এদের দ্বারা দুটি পৃথক জনগোষ্ঠীকে বোঝায়। কুর্মি হল উত্তর ভারতের এক বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, যাঁরা ব্রাহ্মণ্য সংস্কার অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম (আধুনিক কালে একে জাতিবর্ণ প্রথা বলাই যুক্তিযুক্ত) পালন করে থাকেন। উত্তরপ্রদেশ, বিহার বা মধ্যপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাঁরা বসবাস করেন। গুজরাত ও মহারাষ্ট্রে তাঁরা কুনবী নামে পরিচিত হন। এঁদের কোনো গোষ্ঠীগত নিজস্ব ভাষা

নেই, প্রাদেশিক ভাষাই (হিন্দি, গুজরাতি, মারাঠি ইত্যাদি) এঁদের মাতৃভাষা। অন্যদিকে 'কুড়মি' জনগোষ্ঠী পূর্ব ভারতের ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদিম অধিবাসী এবং তাঁদের গোষ্ঠীগত নিজস্ব ভাষা আছে, যার নাম কুড়মালি। উচ্চারণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কুড়মিদের ভাষার নামের বানান এটিই হওয়া বাঞ্ছনীয়। "কুড়মালী" বানানটিতে এখানে দীর্ঘ-ঈ অনাবশ্যক। বর্তমানে 'কুড়মালি' বানান অধিক প্রচলিত।

লিপি-সমস্যা:

কুড়মালি ভাষার নির্দিষ্ট কোনও লিপি নেই, সুতরাং এই ভাষাভাষীরা নিজস্ব প্রাদেশিক লিপি ব্যবহার করে থাকেন। দীর্ঘকাল এ ভাষা মৌখিক ভাষারূপেই প্রচলিত ছিল, লিখিত সাহিত্যের মাধ্যম হিসাবে তার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সীমিত। এ ভাষায় সাহিত্যচর্চা যখন আরম্ভ হল তখন প্রথম দিকে লোকসঙ্গীত, লোকসাহিত্য ইত্যাদি লিখিত আকারে স্থান পেতে থাকে। আর সে কাজে প্রাদেশিক ভাষার লিপি ব্যবহৃত হয়। ফলে বিহারে দেবনাগরী, পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে বাংলা এবং ওড়িশায় ওড়িয়া লিপিতে লেখা হতে থাকে। একবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে বিশেষত ২০০০ সালে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠিত হওয়ার পরে ছোটনাগপুরের ভাষাগুলি গুরুত্ব পেতে থাকে। কুড়মালি কবি ও সাহিত্যিকরা নতুন উদ্যমে সাহিত্যকর্ম আরম্ভ করেন। একদা অনাদৃত ও উপেক্ষিত কুড়মালি ভাষা অন্যান্য কয়েকটি জনজাতীয় ও প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গে সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করে। এর অনেক আগেই কেউ কেউ কুড়মালি ভাষার লিপি নির্মাণের চেষ্টা করেছেন কিন্তু তার ব্যবহার সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হয়নি এবং তা প্রচলিত হয়নি। তবে এতে লিপি নির্মাতাদের উৎসাহে একটুও ভাঁটা পড়েনি, বরং দেশের বিভিন্ন স্থানে লিপি রচয়িতারা একের পর এক ভিন্ন ভিন্ন লিপি তৈরি করে চলেছেন। সম্প্রতি কুড়মালি ভাষার লিপি নির্মাণের একটি তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে এবং "আবিষ্কৃত" লিপির সংখ্যা চৌদ্দ বা পনেরোতে গিয়ে পৌঁছেছে। দুঃখের বিষয় সে তুলনায় কাব্য, নাটক বা গদ্যসাহিত্য রচনা যা প্রকাশিত হয়েছে তার সংখ্যা নেহাতই হাতে গোনা।

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, লিপি ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না, বরং উৎকৃষ্ট সাহিত্যই সে কাজ করতে পারে। সুতরাং, সমাজের সৃজনশীল ব্যক্তিদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ আপনারা সাহিত্যরচনার দ্বারা কুড়মালি ভাষাকে সমৃদ্ধ করুন। বন্ধ্যা মানসিকতাকে বিসর্জন দিয়ে সাহিত্যসৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করুন। একথা সত্য যে একাজ সকলের দ্বারা সম্ভব নয়, সকলে তা করেনও না। কিন্তু অনেককেই দেখেছি যাঁরা কুড়মালির পরিবর্তে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করে চলেছেন। এই সমস্ত সৃজনশীল ব্যক্তির কাছে নিজেদের মাতৃভাষা সমৃদ্ধ করার সনির্বন্ধ আবেদন

জানাই। আমার ধারণা এর ফলে যেমন তাঁরা সমাজে সম্মানজনক স্থানের অধিকারী হবেন এবং দিশাহীন সমাজ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পাবে।

এতদিন পর্যন্ত প্রচলিত স্থানীয় লিপিতেই কুড়মালি ভাষায় সাহিত্য সাধনা চলেছে। তদানীন্তন বিহার তথা সাম্প্রতিক ঝাড়খণ্ডে দেবনাগরী লিপিতে, পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে বাংলায় এবং ওড়িশায় ওড়িয়া লিপিতে এ ভাষার চর্চা একরকম চলছিল। নতুন লিপি নির্মাণের উদ্যোগ অনেকদিন ধরে চলেছে, এখনও তা থামেনি। জানি না কতদিন ধরে তা চলবে।

কুড়মালি ভাষায় ব্যবহৃত প্রায় সমস্ত ধ্বনিই দেবনাগরী, বাংলা বা ওড়িয়া লিপিতে প্রকাশ করা যায়। অক্ষর নির্মাণের শৈলী পৃথক হলেও এই তিন লিপির বর্ণমালা মোটামুটি একই। সুতরাং এই যে কোনও একটা লিপিই কুড়মালি ভাষার বাহন হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছনোর জন্যে ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও অসম- এই চারটি প্রদেশেরই কুড়মালি লেখক এবং চিন্তাবিদগণের একত্র হওয়া প্রয়োজন। সেই কাজে বাংলাদেশের কুড়মালি লেখকদেরও আমন্ত্রণ জানাতে হবে। শুধু তা-ই নয়, নাগপুরী, খোরঠা, পাঁচপরগনিয়া ও মানভূমিয়া প্রভৃতি ভাষার নামে যে সমস্ত কুড়মি লেখক ও কবিরা সাহিত্যরচনা করে চলেছেন তাঁদেরও একাজে যুক্ত করতে হবে। এটা যে একটা জ্বলন্ত সমস্যা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর এই কঠিন কাজটির দায়িত্ব নিতে একজন শক্ত কাঁধের হারকিউলিসের আবির্ভাবের জন্যে কতদিন কুড়মি সমাজকে অপেক্ষা করতে হবে সেটা বলা একেবারেই অসম্ভব।

কোনও ভাষার পৃথক লিপি না থাকলে আমাদের দেশে সামাজিক বা সরকারি স্তরে তার ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া যেন অসম্ভব। কিন্তু একই ভাষার একাধিক লিপি জনমানসে একধরণের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। সুতরাং যত কঠিনই হোক না কেন কুড়মিদের 'এক জনজাতি এক ভাষা"-র লক্ষ্যে এগোতে হবে। এক জনজাতি এক ভাষা" এই তত্ত্ব অনুসারে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে কুড়মিদের হারিয়ে যাওয়া জনজাতিত্ব প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হবে। আর একাজের প্রাথমিক সোপান হবে 'এক ভাষা এক লিপি'। সুতরাং দেবনাগরী, বাংলা ও ওড়িয়া এই তিন লিপিকেই পরিত্যাগ করে একটি নতুন লিপির আশ্রয় গ্রহণ করাই হবে একটি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই লিপিকে কোনও একটি রাজ্যে প্রাদেশিক স্তরে স্বীকৃতি দিলে সমস্যার সমাধান হবে না, বরং তার ফলে একটি বোঝা বাড়বে। সুতরাং একাজে ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও অসম- এই চারটি প্রদেশ এবং বাংলাদেশের কুড়মালিভাষী মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগ ও সার্বজনীন স্বীকৃতি একান্তভাবেই আবশ্যক।

শব্দভাণ্ডার:

কুড়মালি ভাষার শব্দভাণ্ডারে প্রধানত তিন রকমের শব্দ আছে। যেমন তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী। তদ্ভব শব্দগুলি সংস্কৃত শব্দজাত। সেই শব্দগুলি দীর্ঘকাল ধরে সংস্কৃত থেকে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও অপভ্রষ্ট রূপের মধ্য দিয়ে নব্যভারতীয় আর্য ভাষায় স্থানলাভ করেছে। আবার সংস্কৃত ভাষার শব্দভাণ্ডারে একদা অস্ট্রিক, দ্রাবিড় প্রভৃতি অনার্য্য ভাষা থেকে বহু শব্দের প্রবেশ লক্ষ্য করা যায়। তারাও উক্ত বিবর্তনের পর্যায়গুলি অতিক্রম করে আধুনিক কালে একই স্থানে অর্থাৎ নব্যভারতীয় স্তরে পৌঁছেছে। এই শব্দগুলির ধ্বনিপরিবর্তনের ধারা সুস্পষ্ট। এই উভয় প্রকার শব্দই তদ্ভব নামে পরিচিত। হিন্দি, বাংলা, ওড়িয়া, ভোজপুরী, মৈথিলি, মগহী, অঙ্গিকা প্রভৃতি প্রতিবেশী ভাষাতেও এরূপ তদ্ভব শব্দ বহুল পরিমাণে দেখা যায়। তবে কুড়মালিতে তাদের রূপের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। দেশী শব্দগুলি কুড়মালি ভাষার নিজস্ব সম্পদ। সংস্কৃত বা প্রাকৃত থেকে তারা সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন শব্দ। এই শব্দগুলি অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় উভয় ভাষাবর্গ থেকে আগত। এদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এই দুধরণের শব্দ দিয়েই কুড়মালি ভাষার মূল রূপটি গঠিত। আবার কুড়মালি ভাষায় কিছু আরবি, ফারসি প্রভৃতি বিদেশী শব্দও স্থান পেয়েছে। এছাড়া অল্প কিছু ক্ষেত্রে যেমন সাহিত্যরচনায় তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

বানান সমস্যা:

কুড়মালি ভাষায় অনির্দিষ্ট বানানের ব্যবহার একটি অতলান্তিক সমস্যা। এ নিয়ে আলোকপাত করা আর আগুনে হাত দেওয়া প্রায় সমান ব্যাপার। সাম্প্রতিককালে যে বেশ কিছু কবি, সাহিত্যিক, লেখক ও চিন্তাবিদ কুড়মালি ভাষার সাহিত্য রচনায় যুক্ত আছেন, সেটা খুবই আনন্দের বিষয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, এই সমস্ত কবি, সাহিত্যিক, লেখক ও ব্যাকরণ রচয়িতাদের বানানবিধিতে বড়ই সামঞ্জস্যের অভাব চোখে পড়ে। যদিও কোনও ভাষার নবজাগরণের যুগে এটাকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই মনে করা যায়, তবু এখনই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে ভবিষ্যতে কুড়মালি ভাষার বহু ক্ষতি হয়ে যাবে। সেই ব্যাপারে অনধিকারী হলেও শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে আমার কিছু সুনির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনা আছে। তবে সেগুলি একজন পাঠক হিসাবে আমার একান্তই ব্যক্তিগত অভিমত। অযৌক্তিক বা অবাস্তব মনে হলে আপনারা বিশেষজ্ঞ হিসাবে সেগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলে নাও মনে করতে পারেন।

আধুনিক কালের কুড়মালি কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের রচনায় বানান ব্যবহারে বিস্তর পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটা বৈশিষ্ট্য হল- ১) ঋ ঈ ঊ ঐ ও ঔ স্বরবর্ণের ব্যবহার না করা। ২) ঙ য শ ষ য় এই ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকেও বর্ণমালা

থেকে বাদ দেওয়া। ৩) যুক্তাক্ষরের ব্যবহার পুরোপুরি বর্জন করা।

বর্ণের সংখ্যা কমানো এবং যুক্তাক্ষরের ব্যবহার বর্জন করে শিক্ষার্থীর বোঝা কমিয়ে আনার যুক্তিটি অত্যন্ত সহজবোধ্য। তাছাড়া হিন্দি, বাংলা বা ওড়িয়া বর্ণমালায় এমন কিছু বর্ণ আছে যাদের উচ্চারণ কুড়মালিতে নেই। সুতরাং, কুড়মালিতে তাদের রাখা বাহুল্যমাত্র। সরল কথা এই যে এদের বাদ দিয়ে কুড়মালি ভাষায় অতি স্বচ্ছন্দে কাব্য, সাহিত্য বা নাটক রচনা করা যায়। কিন্তু বিগত শতাব্দী বা তারও পূর্বে যাঁরা কুড়মালিতে লেখালেখি করতেন তাঁরা সকলেই লিপি ব্যবহার করে প্রচলিত বানানবিধিই অবলম্বন করতেন। তাতে তাঁদের কোনো অসুবিধা হত না। একেবারেই যে হত না, তা নয়। এ ভাষার নিজস্ব কতকগুলি অতিরিক্ত ধ্বনি আছে, যেগুলি সেই বর্ণগুলির ব্যবহারে প্রকাশ করা সম্ভব হত না। সেগুলিকে তাঁরা সাধ্যমত প্রকাশ করার চেষ্টা করতেন উপস্থিত বর্ণগুলির দ্বারাই। যেটা একেবারেই করা যেত না সেটা অভিজ্ঞ পাঠকের ওপরে ভরসা করে ছেড়ে দিতেন। দেবনাগরী, বাংলা বা ওড়িয়া লিপি চেহারায় পৃথক রকমের হলেও এদের সবারই বর্ণমালা প্রায় সমান সংখ্যক। ঝুমুরের পদকর্তারা কুড়মালি ভাষায় এই বর্ণগুলির সবগুলিরই প্রয়োজন মনে করেছেন এবং এদের কোনওটিকে বাদ দেওয়া সঙ্গত মনে করেননি। সুতরাং যে লিপিই কুড়মালি ভাষার বাহন হিসাবে মান্যতা লাভ করুক না কেন সেই লিপিতে এই বর্ণমালার সমস্ত বর্ণকে রাখার সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত।

একথা ঠিক যে কুড়মালি ভাষার তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের বানানে সাম্প্রতিককালে বর্জিত বর্ণগুলির ব্যবহার নেই। কুড়মালি হল কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের ভাব বিনিময়ের ভাষা। তাই তাঁদের জীবনযাত্রার উপযোগী সাধারণ কথাবার্তায় ব্যবহৃত শব্দ লেখার জন্যে এদের প্রয়োজন নেই। আবার সাহিত্যের ক্ষেত্রেও গল্প, কবিতা বা নাটক রচনার ভাষা হিসাবে যখন কুড়মালি লেখা হয় তখনও ওই বর্ণগুলিকে অতিরিক্ত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই ভাষাটিকে বর্তমান স্তর থেকে উন্নত স্তরে নিয়ে যাওয়া কি আমাদের অভিপ্রেত লক্ষ্য নয়? ভবিষ্যতে কুড়মালিকে পাঠ্যবিষয়ের স্তর থেকে উন্নীত করে কীভাবে গবেষণা ও পঠনপাঠনের উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে তৈরি করে তোলা যায় সেই দুরদর্শিতা চিন্তাবিদদের কি থাকা উচিত নয়? উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনে অন্য ভাষা থেকে নতুন শব্দ গ্রহণ করার কোনও বিকল্প পথ নেই। আর এজন্যে বাংলা, হিন্দি বা সংস্কৃতের মতো উন্নত ভাষাগুলিকে উৎস হিসাবে গ্রহণ করা যেতেই পারে। কিন্তু উক্ত বর্ণগুলি ব্যবহারের পথ রুদ্ধ করে দিলে আমরা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হব। কুড়মালিকে সমৃদ্ধ করার জন্যে প্রয়োজনীয় নতুন নতুন পারিভাষিক শব্দ বাংলা, হিন্দি বা ইংরেজি থেকে গ্রহণ করার মতো মানসিক উদারতা

থাকলে তবেই এ ভাষা সমৃদ্ধ হতে পারবে। কিন্তু সেই নবাগত শব্দগুলির বানান অবিকৃত রাখার পথ যদি স্বেচ্ছায় নষ্ট করা হয় তাহলে এই ভাষার সমৃদ্ধির পথও রুদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি বানান পরিবর্তন করে শব্দগুলি ব্যবহার করা হয় তাহলে এতদিনে প্রাদেশিক ভাষায় শেখা শব্দগুলির বানান নতুন করে শেখার জন্যে শিক্ষার্থীকে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করতে হবে। তাছাড়া অন্য ভাষা থেকে নতুন শব্দ যদি নিতেই হয় তাহলে তার অপরিবর্তিত শুদ্ধ রূপটিকেই গ্রহণ করা হবে না কেন? পরিবর্তিত বানানের রূপটিকে শিক্ষার্থীদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যে একটি কঠিন ব্যাপার হবে, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। একজন ছাত্র তার ভুলে যাওয়া মাতৃভাষা শেখার জন্যে আবেগবশতঃ কষ্ট করতে পারে, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত বানানকে পরিবর্তিতরূপে তার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা কঠিন হবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, যদি "বিশ্ববিদ্যালয়" ও "স্বাধীনতা"- এই দুটি শব্দের যথাক্রমে "বিসসবিদদালই" ও "সাধিনতা" এই বানানে ছাত্রদের কাছে পরিচয় ঘটানোর চেষ্টা করা হয় তাহলে তা নেহাতই পরিশ্রম ও সময়ের অপচয় বলে মনে হতে পারে। মনে রাখতে হবে কুড়মালি ভাষাচর্চার উদ্দেশ্য হল এর ক্ষয়রোধ করা এবং বিস্তৃতি ঘটানো। এখনও যাঁরা মাতৃভাষা হিসাবে কুড়মালি ব্যবহার করছেন তাঁদের মধ্যে এ ভাষার চর্চা বজায় রাখা ছাড়াও যাঁরা মাতৃভাষা হিসাবে কুড়মালি ভুলে গেছেন তাঁদের আগ্রহী করে তোলাও কুড়মালি চর্চার একটি বড় উদ্দেশ্য। সুতরাং কুড়মালি ভাষার প্রচার ও প্রসারের মহান কাজটি যাতে পশুশ্রমে পরিণত না হয় সেদিকে দৃষ্টিপাত করাই বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত।

আকাঙ্ক্ষিত পদক্ষেপ:

কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হলেই কুড়মালি ভাষার ব্যাপক প্রসার ঘটবে হবে সেটা মনে করা দিবাস্বপ্ন মাত্র। তবে এতে সমাজের একটা শিক্ষিত অংশ মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি সচেতন হবে এটা ঠিকই। কিন্তু এতে সাধারণ মানুষের তাৎক্ষণিক উপকার হবে না। তাই এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে আরও একটি কার্য্যক্রমের প্রয়োজন। সেটা হল যে সমস্ত সাধারণ মানুষ মাতৃভাষা ভুলে গেছেন কুড়মালির প্রতি তাঁদের আগ্রহী করে তোলা প্রয়োজন যাতে মাতৃভাষার পুনরুদ্ধার হয়। সুতরাং কুড়মালি ভাষাকে জীবনযাত্রার অঙ্গ না করে তুলতে পারলে ক্ষতিপূরণ হওয়া সম্ভব নয়। এজন্যে সামাজিক ও পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানে কুড়মালি ভাষার ব্যবহার ফিরিয়ে আনার জন্যে বিশেষ উদ্যোগ একটি আকাঙ্ক্ষিত পদক্ষেপ। বিবাহ, শ্রাদ্ধ ও পূজার নিমন্ত্রণপত্র দেওয়াল লিখন, পত্রপত্রিকা ইত্যাদিতে কুড়মালির ব্যাপকভাবে ব্যবহার জনমানসে পরিবর্তন ঘটানোর সবচেয়ে ভালো মাধ্যম। কুড়মালি

ভাষা কুড়মি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিমনস্কতা ও স্বাভিমানের প্রতীক।

উপসংহার:

ভাষা কোনও জনসমুদায়ের শুধু যে একটি মূল্যবান সম্পদ তা-ই নয়, সেটা তার আত্মপরিচয় রক্ষার সবচেয়ে বড় অস্ত্রও বটে। কিন্তু মাতৃভাষা নিয়ে যদি কোনও জাতিগোষ্ঠীর ভাবাবেগই নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার অপমৃত্যু রোধ করা কঠিন। সুতরাং সমাজের শিক্ষিত এবং দায়িত্বশীল প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য হল সচেতন হয়ে কুড়মালি ভাষাকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসা। মাতৃভাষা ভুলে যাওয়া কোনও গর্বের বিষয় নয়, বরং সেটা সবচেয়ে বড় আত্মগ্লানির কারণ। মাতৃভাষার পুনরুদ্ধার করে অতীতের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ও সংশোধন করার এটাই সবচেয়ে ভাল সময়।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি:

1. Dalton, E.T. Descriptive Ethnology of Bengal, Calcutta, 1872.
2. Gazettter of India, West Bengal, Puruliya, Government of West Bengal, Calcutta, 1985.
3. Grierson. G.A. On the Kurmis of Bihar, Chutia Nagpur and Orissa, Journal of Asiatic Society of Bengal, Vol. LXH-LXVHI, 1894-1898.
4. Grierson, A. A. Linguistic Survey of India, Vol. V Part-II, Calcutta, 1903.
5. Mahato, P. P. Sanskritization Vs Nirbakization, 2020
6. Risley, H. H. The Tribes and Castes of Bengal, Vol. I, Calcutta, 1891.
7. কপিলামঙ্গল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, বাগলা প্রেস, রাঁচী, ১৯৫৩।
8. কুর্মালি ভাখিক ইতিহাস রূপ চিস, ক্ষুদিরাম মাহাত, পুরুলিয়া, ১৯৮২।
9.কুরমালী কা ভাষাবৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন, নন্দকিশোর সিংহ, যুগলকিশোর মাহাতো ট্রাস্ট, রাঁচী, ২০০৮।
10. কুরমালী লোকগীত, সন্তোষ কুমারী জৈন, কুমার প্রেস, রাঁচী, ১৯৮৭।
11. কুড়মালি রাম কাথা, সুনীল মাহাত, জনবিকাশ মঞ্চ, পুরুলিয়া, ২০১২।
12. কুড়মালি মাহাভারত কাথা, সুনীল মাহাত, জনবিকাশ মঞ্চ, পুরুলিয়া, ২০১২।
13. ঝুমুর পরিক্রমা, সম্পাদক কিরীটি মাহাত, মুলকি কুড়মি ভাখি বাইসি, পুরুলিয়া, ২০১৯।

14. ঝুমুর সমগ্র, কিরীটি মাহাত, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২০।
15. ঝাড়খণ্ডে মহাপ্রভু, সুহৃদ কুমার ভৌমিক, মারাং বুরু প্রেস, মেচেদা, ১৯৯৪।
16. ঝাড়খণ্ডের বিদ্রোহ ও জীবন, পশুপতি প্রসাদ মাহাতো, কলকাতা, ১৯৮২।
17. ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য, বঙ্কিম মাহাত, বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০০ (১৯৭৮)।
18. মহাকবি বিনন্দিয়া সিংহের পদাবলী, সম্পা০ পশুপতি প্রসাদ মাহাতো, কলকাতা, ২০১৪ (১৯৯৪)।
19. লোকায়ত ঝাড়খণ্ড, বিনয় মাহাত, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৪।
20. সাদরি ব্যাকরণ, নেহরু ওরাওঁ, মারাং বুরু প্রেস, মেচেদা, ২০০৪।
21. হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা, রেবারেন্ড এল ও স্ক্রেফসরুড, ১৮৮৭ (পশ্চিমবঙ্গ সাঁওতালি আকাদেমি, ২০১০)।

কুড়মালি ভাষাঃ একটি অন্বেষণ

ড. ক্ষিতীশ মাহাত

জগদীশ চন্দ্র বসু তাঁর ‘ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে প্রবন্ধে লিখেছেন,” নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?” নদী উত্তর করিত মহাদেবের জটা হইতে। এক্ষেত্রে কারো যদি মনে কোনো সন্দেহ হতো, তাহলে সন্দেহ নিরসনের উপায় ছিল। নদীর তীর বরাবর হাঁটতে শুরু করলেই নদীর উৎসের সন্ধান পাওয়া যেত। কুড়মালি ভাষার ক্ষেত্রেও সমস্যাটি একই রকম কিন্তু সমাধান অতি কঠিন। অথচ কুড়মালি ভাষার উৎসমুখ তো থাকবেই। বাংলা, বিহার, আসাম, ঝাড়খন্ড, ওড়িষ্যার কোটি মানুষ যে ভাষায় কথা বলছেন, এই সব অঞ্চলের অন্যন্য সংখ্যালঘু জাতি ভূমিজ, মাহালি, ধোবা খেড়িয়া, শবর, কামার, কুমোর বাগালরা তা মেনে নিয়েছেন অর্থাৎ কুড়মালি ভাষাতেই কথা বলেন। সাঁওতাল, মুন্ডা, কোড়া যারা মুণ্ডারি ভাষা বংশের অধিকারী তারাও দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে কুড়মালি ভাষাকে বহুল পরিমানে ব্যবহার করেন। যে ভাষা শত ঝড় ঝাপটা বিবর্তনের মধ্যেও তার আপন অস্তিত্ব আপন আঙ্গিক বজায় রাখতে সমর্থ হয় তার তো একটা গৌরবময় অতীত থাকবেই। কীভাবে সেখানে পৌঁছানো যায় সেটাই কথা।

অবশ্য ভাষা নিয়ে নাড়াচাড়া করার আগে এই ভাষা যারা বলেন সেই কুড়মি জাতিকে বিশেষভাবে জানতে হয়। কেননা জাতি পরিচয়ের মাধ্যমেই ভাষা পরিচয়ের পথটি সুগম হতে পারে। নৃতত্ত্বের দিক থেকে ভারতবর্ষের মানুষকে তিন-চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ----- প্রটো-অস্ট্রালয়েড, দ্রাবিড়, আলপীয় এবং নর্ডিক, অবশ্য আরো সহজভাবে বলা যায় আর্য্য এবং অনার্য্য। কুড়মিরা প্রটো-অস্ট্রালয়েড তথা অনার্য্য জনগোষ্ঠীর মানুষ তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। মোটামুটি বলা যায় বেদ বিধি পুরাণ শাস্ত্র মোতাবেকে ধর্মীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় তারাই আর্য্য, অন্যদিকে বেদ বিধি বাদ দিয়ে প্রকৃতিশক্তি তথা সারণা ধর্মের মধ্য দিয়ে যাদের ধর্মীয় জীবন গড়ে উঠে তারাই অনার্য্য। এজন্যই একটি প্রচলিত ছড়াতে

বলা হয়েছে। "কোল কুড়মি কড়া/ বেদ বিধি ছাড়া।" অর্থাৎ বেদ বিধান বাদ দিয়েই কোলগোষ্ঠীর মানুষজন, কুড়মি এবং কোড়ারা জীবনযাপন করে। আর্য্য প্রভাবিত যে জীবনযাপন তা কুড়মিদের মধ্যে কোনোকালেই ছিল না, এখনো নেই। অনার্য্য জীবন সংস্কৃতির মূল কাঠামোটি এখনো কুড়মিদের মধ্যে দেখা যায়। তাই কুড়মালি ভাষার মূল অন্বেষণে প্রটো-অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর দৃষ্টিকোন থেকেই করতে হবে। 'কুড়মি'(< কুমি) শব্দটি এসেছে 'কুড়ম্' শব্দ থেকে। 'কুড়ম' অর্থাৎ কচ্ছপ এই জনজাতির আদি টোটেম। মোটামুটি বলা যায় যারা আর্য্য তাদের গোত্র প্রাচীন ঋষি নামবাচক এবং যারা অনার্য্য তাদের গোত্র প্রাণী বা বৃক্ষবাচক শব্দ। কুড়মি জনগোষ্ঠীর টোটেম কুড়ম বা কচ্ছপ কেন? এরও উত্তর আছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে কুড়মিরা কৃষিপ্রধান জাতি হিসেবেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিল। আর সেক্ষেত্রে চাষের জন্য উপযুক্ত জলের প্রয়োজন। বলাবাহুল্য যেসব জলাশয়ে বারমাস জল থাকে সেখানেই কচ্ছপ থাকে। তাই কুড়মিদের কাছে কচ্ছপ খুবই শুভ প্রতীক আদি টোটেম। কচ্ছপই ইঙ্গিত দেয় জলাশয়ের পার্শবর্তী অঞ্চলে চাষবাস শুরু করা যেতে পারে, কেননা চাষবাসের জন্য সেখানে জলের অভাব হবে না। আর সেই থেকে কুড়ম (কূর্ম) অনুসরণকারীরা হল কুড়মি। পরবর্তীকালে জনসংখ্যা যত বেড়েছে, মানুষ এক স্থান থেকে আর এক স্থানে অন্য স্থানে বসতির খোঁজে গেছে এবং ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন টোটেম বা গোত্র হয়েছে। শেষে দেখা গেল কুড়মিদের একাশি (৮১) টি গোত্র। যথাঃ-

১। অখরিআর	২। আঁধিচিপার	৩। চিপার	৪। কাচিআর
৫। কেরআর	৬। কুঁড়িআর	৭। কেশরিআর	৮। কাড়োআর
৯। কাটিআর	১০। কাড়োআর	১১। গাইসরি	১২। গুলিআর
১৩। ঘড়ারিআর	১৪। গসুর	১৫। হাড়আর	১৬। চিলআর
১৭। বিমআর	১৮। চিলবিঁধা	১৯। চিল	২০। জুরআর
২১। টেঁকআর	২২। টিড্ডুআর	২৩। টেটেআর	২৪। কাছুআর
২৫। কাদিমার	২৬। কেটেরিআর	২৭। খারিআর	২৮। গরিআর
২৯। দাগরিআর	৩০। নাগ	৩১। নওআকুড়ি	৩২। নাংটাআর
৩৩। পুনরিআর	৩৪। বানোআর	৩৫। টুডুআর	৩৬। মুতরুআর
৩৭। বঁসরিআর	৩৮। ডুমরিআর	৩৯। ডুংরিআর	৪০। জুমরিআর
৪১। বকাসরি	৪২। ভখআর	৪৩। মগরিআর	৪৪। হইসাসরি
৪৫। মুর্মু	৪৬। মুসু	৪৭। রাজমউড়	৪৮। রাজমউড়
৪৯। শাঁখআর	৫০। সনারিআর	৫১। হেমআর	৫২। হাসোআর

৫৩। হাঁসদা	৫৪। শঁশোআর	৫৫। হেমরামিআর	৫৬। হেম্ব্রম
৫৭। হাস্তআর	৫৮। হিঁদআর	৫৯। হাঁসদাগিআর	৬০। সংঘআর
৬১। মন্দ্রআর	৬২। কানবিঁধা	৬৩। বাঘআর	৬৪। বহেড়াআর
৬৫। বেদিআর	৬৬। বিড়র	৬৭। বিলারিআর	৬৮। বঁসরিআর
৬৯। রিমরিমিআর	৭০। রাহেড়াআর	৭১। লাটআর	৭২। শিখআর
৭৩। শিআর	৭৪। শিংগআর	৭৫। খেরআর	৭৬। গান্ডআর
৭৭। শাঁখআর	৭৮। জালআর	৭৯। হামআর	৮০। হান্ডআর

বলাবাহুল্য এই সমস্ত গোত্রগুলি প্রাণীবাচক, বৃক্ষবাচক কিংবা অরণ্যবাচক যা তাদের অনার্য্য সত্তাকেই স্মরণ করায়। ধর্মের দিক দিয়েও কুড়মিরা অনার্য্য জাতি সত্তাকেই বহন করে। আর্য্যদের ধর্মজীবন ছিল বেদ-বিধি কেন্দ্রিক। পরবর্তীকালে মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণের মধ্য দিয়ে তাদের ধর্মচর্চার স্বাতন্ত্র্যটি বোঝা যায়। ঋকবেদে একাধিক আর্য্যদেবতা আমরা পাই। তাদের যাগযজ্ঞ স্তুতি বেদে খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। অনার্য্যধারার দেবতা রীতিনীতির সাথে তার মিল হয় না। এবং মিল ছিল না বলেই আর্য্য অনার্য্যের সংঘাত অনিবার্য ছিল তখন। অবশ্য শুধু ধর্মনীতি নয়, শারীরিক গঠন, জীবনচর্য্যাতেও পার্থক্য ছিল। আর্য্যরা ফর্সা গাত্রবর্ণ জনতা যাদের রক্ষাকর্তা ইন্দ্র। আর্য্যরা অনার্য্যদের বলেছেন 'অন-আস' অর্থাৎ কুৎসিত এবং 'অ-নাস' অর্থাৎ নাসিকাহীন। বেশ উদ্দীপ্ত আবেগে অনার্য্যদের কালো চামড়ার মানুষ হিসাবে বর্ণনা করা হতো। যুদ্ধে আর্য্যরা যখন অনার্য্য দস্যুদের ধ্বংস করে ফেলছে, তখন ইন্দ্রের সম্পর্কে বলা হয়েছে ----- তিনি তাঁর সাদা চামড়ার বন্ধুদের সহায়তায় ভূমি দখল করে নিয়েছেন'। ঋকবেদে অনার্য্যদের বলা হয়েছে 'দস্যু', 'দাস', 'বুদ্ধিহীন', 'আক্রমনাত্মক'। এ থেকে একটি বিষয় বেশ নিশ্চিতরূপেই মনে হয়, ইন্দো-ইরানীয় ভাষাভাষী এই আর্য্যরা তখনো তাদের শীতলতর উচ্চভূমি বা উচ্চ পার্বত্যভূমি থেকে খুব বেশিদিন বিচ্ছিন্ন হয়নি। সে কারনে উষ্ণ সমভূমির আদি বাসিন্দাদের তুলনায় তাদের গাত্রবর্ণের ভিন্নতার বিষয়টি তখনো তাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অনার্য্যদের ভূমিতে আর্য্যরা কীভাবে ক্রমে ক্রমে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিল ঋক বেদের সপ্তম মণ্ডলে (৮৭.২০-২১) তার একটি চমৎকার নিদর্শন রয়েছে------

"দেবগন, পশুচারণক্ষেত্রহীন এক দেশে আমরা উপনীত।
এ ভূমি যদিও বিস্তৃত, তবু আমাদের ধারণের পক্ষে ক্ষুদ্র।।
বৃহস্পতি, যুদ্ধে (আমাদের) গবাদি পশু দান কর।
তোমার এই বিশ্বস্ত গায়কের জন্য হে ইন্দ্র, পথসন্ধান করো।

দিনের পর দিন, ইন্দ্র, তিনি এই সব কৃষ্ণবর্ণ প্রাণীদের একস্থান থেকে অন্যস্থানে তাড়িয়ে ফিরলেন।

যেখানে জল সঞ্চিত রয়েছে, সেই বীর নায়ক এই নীচ-স্বভাবের দাস, বর্চিন আর সম্বরদের হত্যা করলেন'।।

ঋকবেদ থেকে জানা যায়, আর্য্যরা এদেশে প্রবেশের সময় যদু এবং তুর্বাশা জাতিগোষ্ঠীদ্বয়ের সঙ্গে প্রথম লড়াই করতে হয়েছিল। এবং সেই প্রথম লড়াইএ দুই আর্য্যপ্রধান নিহত হয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। অবশ্য এরপর আর্য্যরা অনেক দাসদের হত্যা করেছিল এবং অনেক দুর্গ ধ্বংস করে সিন্ধু অতিক্রম করেছিল। অনার্য্য প্রধানদের মধ্যে শম্বরকেই সবচেয়ে শক্তিশালী বলা হয়েছে। তার অধিকৃত দুর্গের সংখ্যা ৯০, ৯৯ বা ১০০। কিন্তু সরস্বতী নদীর তীরের যুদ্ধে আর্য্যরা শক্তিশালী দাস শম্বরকে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছিল।

ঋকবেদ থেকেই সেই সংঘাতের কথা বার বার তাদের সাহিত্যে উল্লিখিত হয়েছে। অনার্য্যদের সঙ্গে লড়াইএ জয়লাভের জন্য আর্যরা আর বারবার দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে সাহস, যুদ্ধাস্ত্র, সাহায্য প্রার্থনা করেছে।

১। হে শত্রুতা! এ সোমপান করে তুমি বৃত্র প্রভৃতি শত্রুদের হনন করেছিলে।
যুদ্ধে (তোমার ভক্ত) যোদ্ধাদের রক্ষা করেছিলে।। (প্রথম মন্ডল, সূক্ত ৪)

২। হে ইন্দ্র! তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে আমরা কঠিন অস্ত্র ধারণ করি।
যুদ্ধে স্পর্ধাযুক্ত শত্রুকে জয় করব। (প্রথম মণ্ডল, সূক্ত-৮)

ভারতবর্ষের আদিবাসী সম্প্রদায় মহিষাসুরকে তাদের রাজা বলে মনে করেন। দুর্গার মহিষাসুর নিধন আর্য্যদের এক আদিবাসী রাজাকে হত্যা করার প্রতিচ্ছবিই ফুটে উঠেছে।

ছোটনাগপুর মালভূমিকেন্দ্রিক কুড়মিদের জীবনযাত্রায় আদিবাসী জীবনচর্যার লক্ষণ রয়েছে এসব প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন ব্রিটিশ গবেষকরা। ছোটনাগপুর মালভূমিকেন্দ্রিক কুড়মিরা যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের কুড়মিদের থেকে পৃথক জাতি তাও তারা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। কুড়মিদের বাস ছোটনাগপুর মালভূমি কেন্দ্রিক অঞ্চলে। অন্যদিকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কুর্মিদের বাস। এবং যারা কুর্মি, কুবি, প্যাটেল, পাতিদার ইত্যাদি নামে পরিচিত। সিন্ধিয়া রাজপরিবার মহারাষ্ট্রের কুর্মি প্যাটেলদের উত্তর পুরুষ। ভৌসলা পরিবার দেউরির কুর্মি প্যাটেলদের বংশধর হিসাবে পরিচিত। মারাঠা কুবিরা মারাঠা শাসক রঘুজী ভোঁসলের অনুগামী ছিলেন। ডালটন অভিমত প্রকাশ করেছেন ভারতবর্ষের ভিভিন্ন প্রদেশের কুর্মিরা যে সামাজিক মর্য্যাদার অধিকারী ছোটনাগপুরের কুড়মিদের ক্ষেত্রে

তা খাটে না। বরঞ্চ ছোটনাগপুরের বসবাসকারী উপজাতিদের সঙ্গেই তাদের জীবন-সংস্কৃতির মিল দেখা যায় বেশি- In the marriage arrangements and ceremonies of the Kurmies and the lower castes, there bare several practices which are not common in the rituals enjoyed by the Purana but traced from the costoms and uses followed by the aboriginals tribes. (Descriptive Ethnology of Bengal / Page-318)

১৯১১ সালের জনগননায় ও ম্যালি বিহারের কৈরী এবং কুড়মিদের পরিচয় প্রসঙ্গে "The Koiri and the Kurmi are two great cultivating castes of Bihar but the latter is also the name of an aboriginal tribe in Chotanagpur & Orrissa state, who spell their name withe a harder, where as the Bihari castes, use a soft 'r'. It was impossible to distinguish between the two spelling and they have therefore been grouped together." (Census of India Vol-V, Bihar, Orrissa and Sikim by L.S.S.O' Malley, I.C.S. Superintendent of Census operation, Begal 1911).

স্যার রিজলে সর্বপ্রথম এই দুটি জাতিকে পৃথক বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯৩১ সালে জনগননার দায়িত্বে থাকা ল্যাসি স্যার রিজলের সেই সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিয়েছেন। কুড়মিদের পরিচয় আরো স্পষ্ট হয় তখন---- aftar finding that thesis section in use among the Kurmis of Chotanagpur are purely totemistic and large portions of the totems are being capable of Identified, he came to the conclusion that the Chotanagpur Kurmi are derived from the Dravidian stock and perhaps are the Hindurised branch of Santals.

অবশ্য ভাষা অন্বেষণের ক্ষেত্রে আমাদের নির্দিষ্ট যুগ বিভাজনের মধ্যই অগ্রসর হতে হবে -

১) প্রাগৈতিহাসিক যুগ
২) আদিযুগ
৩) মধ্যযুগ
৪) আধুনিক যুগ

প্রাগৈতিহাসিক যুগে কুড়মালি ভাষাঃ

এই পর্বটিকে দুটি উপপর্বে বিভক্ত করা যায়। যথাঃ-

১। সিন্ধু সভ্যতার যুগে কুড়মালি ভাষা

২। আর্য্যদের আগমন ও কুড়মালি ভাষা

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষে মানব সভ্যতার প্রথম উপস্থিতি আমরা দেখি সিন্ধু সভ্যতায়। এবং এই সভ্যতা যে প্রাক-আর্য্য মানুষের সভ্যতা তাও আজ জানা গেছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আর্য্যরা এদেশে আসার পূর্বে এ দেশের প্রাচীন বাসিন্দারা ভাষা-সংস্কৃতি চর্যার এক সুমহান ঐতিহ্য ছিল। এই হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীরা কারা? বলতে দ্বিধা নেই এরা এ দেশের প্রটো-অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠির মানুষজন। অর্থাৎ কুড়মি, কোড়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওঁরাও, খাড়িয়া, নিষাদ, খন্দ, ভুমিজ, মুসহার, হো, বিরহড়, ভিল, মাহালি, খেরওয়াড়, কোরকু, তুরি, গন্দ, কোলহান আরও অনেকে। হরপ্পা সভ্যতা সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত যেটুকু জানা গেছে অনার্য ভাষা সংস্কৃতির প্রতি তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। 'হরপ্পা' শব্দটি আসলে 'হড়প্পা', ইংরেজি উচ্চারণে 'হরপ্পা' হয়েছে। 'হড়' দের জীবন সংস্কৃতি বলেই হরপ্পা। "হড়" শব্দটি কোলগোষ্ঠীর ভাষা হিসাবে আজও অত্যন্ত জীবন্ত। পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানীরাও হরপ্পা সভ্যতায় "হড়" শব্দের উপস্থিতি ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগ লক্ষ্য করেছেন। যেমন—

হড় — মানুষ

হাড়ু — বানর

হাড়ি — কুকুর (কুড়মিরা এখনো কুকুরকে 'হাড়ি হাড়ি বলেই তাড়ায়)

হেড়া— ছাগল

হেড়া — ভেড়া (ভে + ড়া)

ছেড়ি — ছাগল (ছে + হেড়া)

খেরওয়াড — খের + হড় (খের > খড় অর্থাৎ ধান চাষ করে যে হড় > মানুষরা তারাই খেরওয়াড়)

এছাড়াও হাড়ি, কুড়মি, কোড়া, বিরহুড়, কেসরিহুড়, বানুহড়, গুলিহড় প্রমুখ জাতিবাচক শব্দে হয় শব্দটির বহুল ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করি। হড়প্পা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সিন্ধু নদীর তীরে। কোনো ভাষাবিজ্ঞানী "সিন্ধু" শব্দটির মূলে "সিনি" শব্দটি উল্লেখ করেছেন— সিনি + দ, কুড়মালি ভাষায় 'সিনি' অর্থে 'দেবী' এবং 'দ' অর্থে জল। পাহাড় এবং নদীকে দেবতা মনে করে কুড়মি সাঁওতাল নানা প্রটো-অস্ট্রালয়েড বাংলাগোষ্ঠীর মানুষজন, যেমন দুয়ারসিনি, চাপাইসিনি, দাসাইসিনি, গাড়রাসিনি (এখানে পাহাড় দেবতা) ইত্যাদি। এমনকি "বাংলা" শব্দটিও কোলগোষ্ঠীর ভাষা বলে

আজ পণ্ডিতরা স্বীকার করেছেন। "বাং" মানে "না", আর "লো" মানে সেচ দিয়ে জল তোলা। তার মানে যে দেশে জলসেচের দরকার হয় না, তাই বাংলো, 'বাংলো দিশম' বা বাংলাদেশ। সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে যেটুকু তথ্য জানা গেছে, তাতে বোঝা যায় সিন্ধু সভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক সভ্যতা। তারপরেই অনিবার্য যে প্রশ্নটি আসে এই কৃষিকাজ করত কারা ? তার উত্তরে বলা যায় দ্রাবিড় এবং অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষরাই এই কৃষিকাজ করত। দ্রাবিড় এবং অস্ট্রিকরা কি মিলিতভাবে এই অঞ্চলে ছিল ? নাকি দ্রাবিড়রাই এককভাবে সিন্ধুসভ্যতা নির্মান করেছিল ? কুড়মিরা যে অস্ট্রিকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল কীভাবে জানা যায় ? কুড়মিরা অস্ট্রিকগোষ্ঠীর মানুষ নাকি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষ এই বিতর্ক এখনো চলছে বলা যায়। এক্ষেত্রে দেখা যায়, পৃথিবীর আদিম জনজাতিগুলির পৃথিবী সৃষ্টিতত্ত্ব নিজনিজভাবে ব্যাখ্যা করেছে সভ্যতার আদি কাল থেকেই। এক্ষেত্রে কুড়মিদের পুরাকথা এবং সাঁওতালদের পুরাকথা প্রায় এক।

আর্য্যদের আগমন ও কুড়মালি ভাষাঃ

আর্য্যরা যখন এদেশে আসে তখন তারা প্রটো-অস্ট্রালয়েড অর্থাৎ অনার্য্যদের ভাষা বুঝতে পারত না, আর্য্যরা তা গ্রন্থে স্বীকার করেছে। তাদের গ্রন্থ"ঐতরেয় আরণ্যক'এ লিখেছে........

> *"প্রজাতি তিস্রঃ অত্যায়নীয়ুরিতি যা বৈ তা ইমাঃ প্রজাঃ তিস্রঃ।*
> *অত্যায়নায়ং স্থানীমানী বয়াংসি বঙ্গ বগধাশ্চেরপাদঃ"।*

অর্থাৎ বঙ্গ, বগম (মগধ) আর চেরোপাদ দেশ হল পক্ষীর দেশ। সেখানকার লোকেরা পাখির মতো কিচির মিচির দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলেন। আর্য্যরা অনার্য্যদের দেশভূমিও চিহ্নিত করেছিলেন—'কীকটা নাম দেশ অনার্য্য নিবাস'। মহাভারতে ব্যাসদেব এই 'কীকট'-কে বলেছেন 'কর্কখন্ড', পরবর্তী কালে এই কর্কখন্ডই পরচিতি পেয়েছে 'ঝাড়খন্ড" নামে। সদ্য আসা আর্য্যদের সাথে এদেশীয় মানুষদের কিন্তু বনিবনা হল না। সেটাই স্বাভাবিক। শুধু ভাষাগত পার্থক্য তো নয়, শারিরীক পার্থক্য, জীবন চর্যাগত পার্থক্য ছিল সুবিশাল। কুড়মালি যে কোলগোষ্ঠীর ভাষা তার কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত এখানে রাখতে পারি। এমন কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলো কোলগোষ্ঠির সব ভাষাতেই এক—

বাংলো	সাঁওতালি	কুড়মালি	কোড়া
সিম	মালহান	মালহান	মালহান
মহিষ	কাড়া	কাড়া	কেড়হা
ডিমপাড়া মুরগি	কালট	কাটুল	কালট
তির	কাঁড়	কাঁড়	কাঁড়
পাহাড়	ডুংরি	ডুংরি	ডুংরি

লাঠি	ঠেংগা	ঠেংগা	ঠেংগা
গুহা	খঁগর	খঁগর	খঁগর
কুঁড়েঘর	খুড়পি	খুড়পি	খুড়পি
স্থল	ঘুটু	ঘুটু	ঘুটু
বিল	বাইদ	বাইদ	বাইদ
ঝোপ	লাটা	লাটা	লাটা
লঙ্কা	মরিচ	মরিচ	মরিচ
লাঙ্গল	নাহেল	হাল	নাহেল
ল্যাম্ফ	ডিবা	ডিবা	ডিবা
কলসি	ঠিলি	ঠিলি	ঠিলি
মাঠ	ডাহি	ডাহি	ডাহি

তাই প্রাগৈতিহাসিক যুগে কুড়মালি যে প্রাগার্য্য জনগোষ্ঠীর ভাষাছিল তাতে সন্দেহ নেই। **আদিযুগে কুড়মালি ভাষাঃ** আদিযুগ বলতে আমি আর্য্যরা এদেশে প্রবেশের সময় থেকে অর্থাৎ ২৫০০ খ্রীঃপূঃ থেকে ১০০০খ্রীঃআঃ পর্যন্ত সময়কালকে ধরতে চাই। এই ৩৫০০ বছরের কুড়মালি ভাষার ইতিহাস খুঁজে পাওয়া সত্যি খুব কঠিন, তবে একেবারে অসম্ভবও নয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হল অনার্য্যগোষ্ঠীর মানুষদের লেখ্যসাহিত্যের অভাব। আর্য্যরা এদেশে আগমনের পর থেকেই তাদের ভাষা ব্যাকরণ ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে রক্ষা করে চলেছিল। প্রথমে শুনে শুনে মনে রাখার উপর তারা অত্যন্ত জোর দিয়েছিল। পরে লিপিবদ্ধ করে। কিন্তু খেরোয়াল জনগোষ্ঠীর মানুষদের কোনো লেখ্য সাহিত্য নেই। ফলে ভাষার পরিবর্তনের রূপটি ধরার উপায় নেই। আর্য্যরা এদেশে আসার পর থেকেই অনার্য্যরা ক্রমশ কোণঠাসা হতে থাকে। তারা যেমন ক্রমশ বাসস্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল, তেমনি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হতেই হয়েছিল। আর্য্যদের চাপে অনার্য্যরা ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সরতে থাকল। আর এই বাসস্থান পরিবর্তনের কারনেই কোলগোষ্ঠির মানুষজন থেকে কুড়মিরা ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ক্রমশ এই বিচ্ছিন্নতা স্পষ্ট হয়ে উঠল ভাষাগত ও পেশাগত কারনে। অনার্য্যদের মধ্যে যারা প্রথম চাষ-আবাদের দিকে ঝুঁকেছিল তার অন্যতম কুড়মি। চাষ-আবাদে সমৃদ্ধ হবার ফলে অর্থনীতির নিয়মেই কুড়মিরা আর্য্য জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসে। ফলে এদের ভাষায় আর্য্যভাষার প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়তে থাকে। অবশ্য ধর্মীয় দিক থেকে এরা খেরোয়াল ধর্মীয় রীতি অর্থাৎ বেদ বিধি বাদ দিয়ে সারনা ধর্মীয় রীতিকেই গ্রহন করে থাকলেন। দশম শতাব্দীতে দেখা যাচ্ছে কুড়মালি, মাহালি, ডোম, শবর অপভ্রংশ-

অবহট্ট মিশ্রিত ভাষাতেই মানুষ কথা বলতো। আর এই ভাষাতেই চর্যাপদ লেখা হয়েছে, যে পুঁথিটিকে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন বলা হয়। ওড়িয়া, মৈথিলী, অসমীয়া ভাষারও আদি নিদর্শন চর্যাপদ। একই কারণে চর্যাপদ কুড়মালি ভাষারও আদি নিদর্শন। চর্যাপদে কুড়মালি ভাষার একটা স্পষ্ট অবয়ব বাঁধা পড়ে আছে।

চর্যাপদে আদিবাসী জীবনযাত্রা:-

চর্যাপদে দেখি, সমগ্র আদিবাসী জীবনের বিস্তৃত ছবি। সে চিত্রে দেখা যায় ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে... যার সীমানা রাঁচি, হাজারিবাগ, পালামৌ, ধানবাদ থেকে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূমে এসে ঠেকেছে। বনজঙ্গল ঘিরে হরিণ শিকার, মত্ত হাতিকে পোষ মানানো, নগর প্রান্তের ডোমণির সাথে বটু ব্রাহ্মণের অবৈধ মিলন, পাগলা হাতির গর্জন, ময়ূরের পালক গুজাফুল দিয়ে শবরকন্যার সাজসজ্জা, শুঁড়ি মেয়ের বাকল চুইয়ে মদ তৈরি করা, আদিবাসী জীবন পরিবেশ নির্দেশক। মেয়েদের দলবদ্ধভাবে নাচ আর পুরুষদের বাদ্যযন্ত্রসহকারে নাচ কুড়মি সাঁওতালদের আখড়ার চিত্রকে মনে করিয়ে দেয়। ঢোল-মাদল বাজিয়ে ডোম্বীর বিবাহ যাত্রা, ময়ূর পালক মাথায় পরে উঁচু পাহাড়ের উপর শবর শবরীর প্রনয়লীলা, হরিণকে ধরার জন্য জালের ব্যবহার, উঁচু পাহাড়ি টিলাতে প্রতিবেশীহীন মানুষের কুঁড়ে ঘরে বাস, আজ থেকে হাজার বছর আগের সাহিত্যে যে সমাজজীবনের ছবি আমরা দেখি তাতে কুড়মি সাঁওতাল কোড়া শবর সমাজ ও বাঙালি হিন্দু সমাজ পাশাপাশি মিলিয়ে গেছে।

চর্যাপদে কুড়মালি বাকরীতি:- কুড়মালি ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যুক্ত ব্যঞ্জনের বর্জন এবং স্বরবর্ণের একক স্বতন্ত্র ব্যবহার। এই রীতিটি পূর্ণমাত্রায় রয়েছে চর্যাপদে।

(ক) এক সে শুণ্ডিনিনী দুই ঘরে সান্ধঅ।
    চীঅন বাকলা বারুনি বান্ধা।

(খ) কাঅ নাবডিঅ খান্টি মণ কেড়ুআল।
    সদগুরু বঅনে ধর পাতবাল ।

চর্যাপদে খাঁটি কুড়মালি শব্দঃ চর্যাপদে এমন অনেক শব্দ রয়েছে যেগুলি খাঁটি কুড়মালি শব্দ। এখনো কুড়মি মানুষজন এইসব শব্দ ব্যবহার করেন। যেমন—

(ক) তিন **চ্ছুপই** (< ছুপে যাওয়া, লুকানো) হরিনা **পিবই** (< পি, পান করা) না পানি।

(খ) খুন্টি **উপাড়ি** (< উপড়ে ফেলা) মেলিলি কাচ্ছি।

(গ) তান্তি বিকন অ ডোম্বী অবর না **চঙ্গড়া** (< চাঙ্গাড়ি, বড় ঝুড়ি)।

(ঘ) আলো ডোম্বী তো এ সম করিবে ম **সাঙ্গা** (< বিয়ে করা)।

(ঙ) মাঙ্গত **চড়হিলে** (< চড়হা, উপরে উঠা) চউদিস ছাহঅ।

(চ) বলদ **বিআএল** (< বিয়োল, জন্ম দিল) গবিআ বাঁকে।

(ছ) জাম মরণ ভব **কইসণ** (< কেমন করে) হোই।

(জ) দিবসই **বহুড়ী** (< বৌমা) কাউই ডরে ভাঅ।

চর্যাপদে এমন অনেক শব্দ আছে যেসব শব্দ কুড়মালি ভাষায় এখনো সমান ভাবে ব্যবহৃত হয়।

মধ্যযুগে কুড়মালি ভাষাঃ মধ্যযুগ বলতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কালকে ধরা হয়েছে। মধ্যযুগে পাহাড় ডুংরি ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের সবচেয়ে সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে কুড়মিরা আত্মপ্রকাশ করে। জমি জায়গা এবং চাষ আবাদে এদের প্রায় একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল আর এই মধ্যযুগ থেকেই কুড়মি সমাজব্যবস্থায় দেখা দেয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা। স্বভাবতই কুড়মিদের মধ্যে জমিদার, ভূস্বামীদেরও আবির্ভাব ঘটে। সেজন্য মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে গুজরাট নগরের জাতি বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের সমান মর্যাদায় কুড়মিদের বর্ণনা করেছেন—

"পুইতণ্ডি বৈসে হড় রাইগাঞি কেশরগড়
ঘণ্টেশ্বরী বইসে কুলীডাল
পারীসতি পিতমাণ্ডি ঝিকরাড়ি মালখণ্ডি
পোড়াবি বড়াল কুণ্ডমাল।।"

কুড়মিদের লেখাসাহিত্যের চর্চা ছিল না। মধ্যযুগের গোড়ার দিকে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য প্রায় কোনো জাতিরই লেখ্যসাহিত্যের চর্চা ছিল না। ক্রমশ তা অন্য জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। তাই দেখা যায় ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাস যখন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য রচনা করলেন, তখন তা কুড়মালি ভাষাতেই রচনা করলেন। কেননা বাঁকুড়ার বনবিষ্ণুপুর কেন্দ্রিক সংস্কৃতির সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষা ছিল তখন কুড়মালি। অবশ্য মৌখিক রীতির সাহিত্যচর্চা সমানভাবেই চলছিল।

আধুনিক যুগে কুড়মালি ভাষাঃ

দেশ স্বাধীন হবার প্রাক্কালে হিন্দু মুসলিম ইস্যু ছিল এদেশের এক প্রধান ইস্যু। এবং বলাবহুল্য প্রায় সমগ্র আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের হিন্দু হিসেবই দেখানোর চেষ্টা হল। এই প্রক্রিয়াটি এখনো জারি রয়েছে। এর বিরুদ্ধে ক্রমশ জনমত তৈরি হয়েছে। দেখা দিয়েছে জনজাগরণ যা বর্তমানকালে এক নবজাগরণের রূপ নিয়েছে। ভারতবর্ষের কোন একটি অঞ্চলে যদি এখন রেনেসাঁ অর্থাৎ নবজাগরণ চলছে তবে তা হল ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল। আর এই নবজাগরণ ভাষা ও সংস্কৃতির

নবজাগরণ। সব দেশেই রেনেসাঁস ঘটে দেশভিত্তিক অথবা ভাষাভিত্তিক। ইটালি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড সব জায়গাতেই আমরা দেখি ভাষাভিত্তিক রেনেসাঁস। সেই রেনেসাঁসের অন্যতম লক্ষ্যণই ছিল ভার্নাকুলার (The language or dialect spoken by the ordinary people in a particular country or region) সাহিত্যের সৃষ্টি। ভার্নাকুলার বা দেশীয় ভাষা পূর্বে ছিল অবজ্ঞাসূচক। রেনেসাঁই তাকে মর্যাদা দেয়। জার্মানদের ক্ষেত্রে দেখি রেনেসাঁর প্রাক্কালে তারা তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে ল্যাটিনের জায়গায় জার্মান মাধ্যম প্রবর্তন করে। ঝাড়খণ্ডের ক্ষেত্রেও ঘটেছে তাই। ঝাড়খণ্ডের আদি বাসিন্দারা বাংলা, হিন্দি, অসমীয়া, উড়িয়ারা প্রভৃতি ভাষা ছেড়ে তাদের নিজের ভাষাকে ব্যবহার করতে চায়। ইতিমধ্যেই সাঁওতালদের অলচিকি লিপি স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র চালু হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের আরেক বৃহৎ জনগোষ্ঠী কুড়মি। কুড়মিরা তাদের নিজের ভাষা কুড়মালিকেই গ্রহন করতে আগ্রহী। কুড়মালি ভাষার লিপি 'চিসই' তৈরি হয়েছে। প্রথম চিসই তৈরি করেন হরিপদ মাহাত। পরে আরও দশজন তাঁদের উদ্ভাবনী কৌশলে চিসই তৈরি করেন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুরুলিয়ার স্বপন মাহাত এবং ঝাড়গ্রামের জয়ন্ত মাহাত। কুড়মালি সাহিত্যের বিশাল ভান্ডার ক্রমশ লিপিবদ্ধ হচ্ছে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কুড়মালি পঠন পাঠন শুরু হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের সংস্কৃতি ও সাহিত্য নিয়ে গবেষকরা নানান অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ শুরু করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে কুড়মি উন্নয়ন পর্ষদ (Kudmali Development Board) তৈরি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কুড়মালি মাধ্যম স্কুল চালু করার কথা ঘোষণা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের একাধিক কলেজে আন্ডার গ্রেজুয়েট লেভেলে কুড়মালি পঠন পাঠন শুরু হয়েছে। ২০২১ সালে সিধু কানু বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে কুড়মালিতে পোস্ট গেজুয়েট কোর্স চালু হয়েছে। তবু বলতেই হবে ভাষার এই পুনঃপ্রতিষ্ঠা পর্বের কালটি নানান চড়াই উৎরাই-এর মধ্য দিয়ে অতিক্রম হবে। কিন্তু কুড়মালির মৌখিক রীতিটি বিভিন্ন জায়গাতে এখনো প্রচলিত রয়েছে বলে কুড়মালি কবি সাহিত্যিকদের পথ খোঁজা খুব কঠিন হবে না। বর্তমানে কুড়মালির দুটি রূপ চালু রয়েছে --- ঝাড়খন্ডি কুড়মালি রূপ এবং শুদ্ধ কুড়মালি রূপ। ঝাড়খণ্ডি কুড়মালি রূপটিই বহুল পরিমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রাত্যহিক জীবনচর্যার কথ্য ভাষায় এবং সাহিত্য সৃজনে। ঝাড়খন্ডি কুড়মালির সজীবতা ও স্বাতন্ত্র্যের কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত রাখতে পারি কবি ভূপেন মাহাত'র 'হামদের স্বাধীনতা' বই থেকে—

"তরহা এ্যামন কেনে আছু
কুত্তার লেখেন খেদেএ দিছে
জুঁঠা দিলে পাছু।

ইটা স্বাধীন ভারত বঠে
সকল লকের সমান ভাগ
অধিকার আছে।
হেঁ বাবু স্বাধীনতা কি
উটা কুথায় আছে
দেইখ্‌তে কেমন, শুইনতে কেমন
কে মাথা ঘামাছে।
শুন তবে...
কত মজার রঙ বেরঙের গাড়ি
একলকে ভোগ করে
লক্ষ লোকের হাঁড়ি।
টাকা পইসা মুঠা মুঠা
ডিঙ্গানা আছে
লক্ষ লকের চুস ঘন
একলকে ফুটাছে।
হেঁ বাবু আর লকগা
কুথায় থাকে কি খায়
অদের স্বাধীনতা নাঞ।
কেনে নাঞ...
অরহায় সোউব
খাইট্‌ছে চাষে, বনে বাদাড়ে
কলকারখানা দ্যুইনার মিলে
তবে ন পাবেক, আইন্‌লে খাবেক
রকত্‌ জলের ধন
তবু কি আর ঢড়্হা ভরবেক
দরমরা জীবন।
ফিটিক ফিটিক জল পৈড়ছে
গায়ে আধড় টেনা
উটাই কাপড় উটাই লাউজ
মাথায় বঝা কাঠ
কলে দুধের ছানা

যাদের আছে দাম ক্যইষছে
না-পাহ্যত্ দিঞে দিছে
এক আনা দু আনা
নিখ্রাঞ্ নিখ্রাঞ্ দরা বাছে
অদের খাবার অভাব নাঞ
অর্হা আইনতে পারে স্বাধীনতা
হতে পারে ভারত স্বাধীন
অদের স্বাধীনতা নাঞ।

কিন্তু একই সঙ্গে শুদ্ধ কুড়মালি ভাষাও আজ সমানভাবে চর্চা হয়ে চলেছে। শুধু যে বাংলা হরফে চর্চা চলছে তা নয়, কুড়মালি হরপেও চর্চা চলছে। কুড়মালি ভাষার এক শক্তিশালী কবি মঙ্গল মাহাত'র 'গরাম ঠাকুর" ঠাকুর থেকে কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত দিতে পারি—

"গরাম ঠাকুর গরাম ঠাকুর তর শিকড়ে পূজা,
তহর পাত তহর ফর তহর ফুরেক ধজা।
তহর লাগি আওয়াচাল ওহর গায়েক ধুন,
তহরপেই লাল ঝিঁঝরা নি গুনা নি গুনা।
তহরু লাগি গেইয়াধনি ধুনাই লাহি হিঁয়া,
তহর লাগি দুধ কলা তহরু পাখি ঘিয়া।
তহর লাগি রাঁগা সিঁদুর দুব্‌লা হেলা হালি,
তহর লাগি হালি বন পিড়িক পিড়িক পালি।
তহর হালি হালি পাত বাসাত খরা ঝড় আই্ল,
পিরথিমিটা শিতল কেরয়্ তহরু বন জাঁগাল।
তহর লাগি গরম ধরম তহর লাগি শরম,
তহর লাগি গরব হামার তহর লাগি জীবন।
তহর লাগি খাম হাম তহর লাগি দড়হ,
তহর লাগি হামরা সভে ঘড়াক পিঠি চড়হ।
তহর সিরজন এই হালি বন তহরে কেরয় সৈঁউরন,
তহর লাগি জীবন মরণ হামার ভরণ পসন।'

কুড়মালি কবির কবিতার আশার বাণী দিয়েই শেষ করতে হয় -

"কুড়মালি ভাখিক পুঁথি হেলা
কুড়মিক আঁইখ উঘরলা
চিসআই হড়প ভাখিকে চিসলি

মাঁই ভাখি হেকেক কুড়মালি”। (মঙ্গল মাহাত)

উল্লেখপঞ্জি (Bibliography & References)

পুস্তকঃ-

১. কিরীটি মাহাতো, সিন্ধু সভ্যতার ভাষা ও কুড়মালি; মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি. পুরুলিয়া, ১ম প্রকাশ ২০১৪

২. ক্ষিতীশ মাহাতো, ঝাড়গ্রামঃ জঙ্গলমহলের সংস্কৃতি পরিচয়, ১ম খন্ড; রিডার সার্ভিস, কলকাতা, ১ম প্রকাশ,

৩. ইরফান হাবিব ও বিজয় কুমার ঠাকুর, বৈদিক সভ্যতা; ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, সং ২০০৩, কলকাতা-৯০

৪. সুজিত দাশ, আর্য্যতর্কঃ একটি তাত্ত্বিক ক্রীড়াভূমি; আমি আর লীনা হেঁটে চলেছি, ১ম প্রকাশ, ২০১৭,তারকেশ্বর হুগলি)

৫। সুহৃদকুমার ভৌমিক, আদিবাসীদের ভাষা ও বাংলা; মারাংবুক প্রেস সং ১৯৯১, মেছেদা, মেদিনীপুর।

৬। মনোরঞ্জন মাহাতো, কুড়মি কুড়মালি; ফুরং প্রকাশনী, মুনিয়াদা ঝাড়গ্রাম।

৬। মঙ্গল মাহাতো, কুড়মালি চারিদিসা, চিসইসারি ফাউন্ডেশন, সং ২০১৬, ঝাড়গ্রাম।

৭। দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো, জঙ্গলমহলের কুর্মিদের অব্যক্ত জীবনযন্ত্রণা ও বঞ্চনার এক অনালোচিত ইতিবৃত্ত; ১ম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২১কবিতিকা, মেদিনীপুর।

জার্নালঃ-

১. অরণ্যের কথা, সম্পাদক- অর্জুন মাহাত, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ।

মানভূম-পুরুলিয়া : কুড়মি জনজাতির সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকা

বিশ্বজিৎ মাহাত

বৃহত্তর ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত মানভূম তথা বর্তমান পুরুলিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী জনগোষ্ঠী হল কুড়মি জনজাতি। এ জেলার রুক্ষ মাটিতে কৃষি ব্যবস্থায় প্রথম স্থিত হয়েছিলেন তাঁরা। বিহার জেলা গেজেটিয়ারে, পাটনা ১৯৬০ সালে কুড়মি সম্পর্কে বলা হয়েছে, "The Kurmis are essentially cultivators and as a class are industrious and peaceful. They from the back-bone of the agricultural economy." কৃষিকার্য করতে হলে পরিশ্রম অবশ্যই করতে হবে। হিন্দিতে প্রবাদ আছে-"শ্রম করণে মে শর্ম নেহি।" (শ্রম করতে শরম কিসের?) এই নীতি মেনে চলে। পরিশ্রমের বিকল্প নেই। শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক পরিশ্রমের মধ্যে প্রথমটাই এদের কাছে প্রিয় ও বৃহত্তর। শ্রম করতে ভালবাসে। জমির সঙ্গে এদের আত্মিক সম্পর্ক। প্রাণটাই যেন মাটির সঙ্গে যুক্ত। এখানকার ভূমিপুত্রদের মধ্যে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি এমনকি আদিবাসীদের উপর প্রভাব বিস্তারের দিক থেকেও এরা অগ্রণী। বর্তমানে অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ব্যবসা, রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি জেলার জনজীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে এদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ঘর-গেরস্থালির কাজে এবং পরিবারের অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কুড়মি মহিলাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্যিক, গবেষক ডঃ সুধীর করণ মন্তব্য করেছেন "এদের বাদ দিলে সীমান্ত বাংলাও থাকে না, সীমান্ত সংস্কৃতিও থাকে না।"

দীর্ঘদিন ধরে মানভূম তথা পুরুলিয়াকে সমৃদ্ধ করেছে ঝুমুর, টুসু, ভাদু, করমের সঙ্গীতগুলি। গীতিকবিতা ও লোকগানেই সমৃদ্ধ ছিল মানভূমের সাহিত্য সংস্কৃতির পরিমন্ডল। কারও কারও লেখায় রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী যেমন ছিল তেমনই কোনও কোনও লেখার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহ-ভালোবাসা ইত্যাদি। ঝালদার তুলসীর মাহাতোর "দ্রোণপর্ব" (১২৫৮ মতান্তরে ১২৭২) ও ধনু

মাহাতোর স্বর্গারোহন পর্ব (১২৫৮), জয়পুরের লড়কু মাহাতোর "সুন্দরাকান্ড রামায়ণ" (১২৬৮ মতান্তরে ২৭ বৈশাখ ১২৭৪ সন), ব্রাহ্মণপুরের সিদাম মাহাতোর লেখা "মহাভার-বিশ্বরূপ পাঠ" (১২১৫) কুড়মাশোল গ্রামের ধনু মাহাতো এবং প্রেম মাহাতোর লিপিকৃতি "মহাভারত, স্বর্গারোহন পর্ব" (১২৬০), বরাভূমের তুলসী রায় মাহাতো (১২৭২)। ষটপদী ব্যাকরণের অনুলিপি করেছিলেন ইপুরের রবি মাহাতো (১২৮৫)। চেল্যামার বুধু মাহাতো একটি পুঁথি রচনা করেছিলেন। পুঁথিটির নাম ও রচনাকাল দুর্বোধ্য। এছাড়াও মানভূম তথা পুরুলিয়ায় মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল "কপিলামঙ্গল"। একাধিক কবি গো-বন্দনা সূচক এই পালা লিখেছেন মঙ্গলকাব্যের ধাঁচে। কবিদের মধ্যে সুজন মাহাত (১২৪০) উল্লেখযোগ্য।

মানভূম জেলায় প্রথাগত শিক্ষা শুরু হয় ১৮৫৩ সালে মানভূম জেলা স্কুল নামে এক সরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠার পর। এরপর ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মানভূম ভিক্টোরিয়া স্কুল। ১৯১৯ সালে মানভূমের দুই ভূমিপুত্র মদনমোহন মাহাতো মানভূম জেলা স্কুল থেকে এবং রাজকিশোর মাহাতো মানভূম ভিক্টোরিয়া স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। মানভূমের প্রশাসক কেরাণীসহ অন্যান্য বাংলাভাষী মানুষদেরজন্য এই দুটি বিদ্যালয় শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। এরপর থেকে বহু কুড়মি সন্তান শিক্ষার আঙিনায় নিজেদেরকে তুলে ধরলেন। মানবাজারের নলকুড়ি গ্রামের রাইমোহন মাহাত, হুলকা গ্রামের ক্ষুদিরাম মাহাত, ঝালদার ইচাগের দেবেন্দ্রনাথ মাহাত ও বৈদ্যনাথ মাহাত, হুড়া থানার মাগুড়িয়া গ্রামের দেবীপ্রসাদ মাহাত, কাশিপুর থানার আগরডি গ্রামের বঙ্কবিহারী মাহাত, হুড়া কেশবপুরের পার্বতীচরণ মাহাত, বালকডি গ্রামের রামকিঙ্কর মাহাত, মানবাজারের কাশীডি গ্রামের প্রমথনাথ মাহাত, বাড়েদা গ্রামের গয়াসুর মাহাত, চাটুমাদার গ্রামের গৌর চন্দ্র মাহাত, বরাবাজার সিন্দরীর সাগর মাহাত, পুরুলিয়া ডাবর গ্রামের রবীন্দ্রনাথ মাহাত ও অনিল মাহাত, প্রমুখদের নাম উল্লেখযোগ্য। পুরুলিয়ার আনাই জামবাদ গ্রামের অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান মনোহর মাহাতো ১৯৪১-৪২ সালে মানভূম ভিক্টোরিয়া স্কুল থেকে বিহারের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাতে ১৩ তম স্থান অধিকার করেন এবং পরে তিনি ধানবাদ স্কুল অফ মাইনসে ভর্ত্তি হন এবং ধানবাদে মদনমোহন মাহাতোর বাসা বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করেন। এই সময় মানভূমের জেলাশাসক রবীন্দ্রনাথ মাহাত, জগন্নাথ মাহাত, হাড়িরাম মাহাত এবং ভজহরি মাহাত সহ বেশ কিছু দেশজ মূলবাসী সন্তানদের কেরাণী পদে নিয়োগ করেন। দেবেন্দ্রনাথ মাহাত তখন রেন্ট রিডাকসন ক্লার্ক ছিলেন। হুড়া পলমা নিবাসী মানভূম জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মহেশ্বর মাহাতোর ভ্রাতা পার্বতীচরণ মাহাতো স্কুল সাবইন্সপেক্টর হিসেবে কাজ শুরু করে পরবর্তীকালে জেলা স্কুল পরিদর্শক পদে উন্নীত হন। পরবর্তীকালে পুরুলিয়া জে.কে.

কলেজ প্রতিষ্ঠা হবার পর হাজীপুর কলেজে অধ্যাপনারত শ্রী অনিলকুমার মাহাতো অঙ্ক শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। সমগ্র মানভূম জেলাতে পুলিশ, প্রশাসক, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, অধ্যাপক, মুহুরী, কেরাণী সমস্ত ক্ষেত্রে ছিল বাংলাভাষী উচ্চবর্ণ ও উচ্চ জাতির মানুষের নিরঙ্কুশ আধিপত্য।

বাঁকুড়া জেলার ছাতনা মহকুমার ব্রজকুমার মাহাতো বি.এ. পাশ করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। পুরুলিয়াতে তাঁর পোস্টিং হয়। কিন্তু বাঙালী উকিল মোক্তাররা তাঁর কোর্টে ওকালতি করতে অস্বীকার করায় রাঁচীতে তাঁকে বদলি করা হয়। রাঁচীতে থাকাকালীন অবস্থাতে ১৯৩০সালে 'মানভূমের কুর্মি জাতি' বলে একটি বই লিখেছিলেন।

মানভূমের বিশিষ্ট লোককবি ও দার্শনিক সৃষ্টিধর সিংহদেও কাটিয়ার (১৮৯৮-১৯৭৫)। তাঁর বহু রচনা কুড়মালি ভাষায় রচিত। ঝুমুরের মাধ্যমেই তিনি কৃষ্ণলীলা ও জঙ্গলমহলের মানুষদের জীবনযাত্রার ওপর পালাগান রচনা করেন। তাঁর রচিত পালাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল 'মানভূমেক ধঁধোউরা'। এছাড়াও আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পালা হল:- 'ভাত ভগবান', 'বংশীবর্ষণ পালা', 'লেঠা পালা', 'পীরিত পালা', 'সাধন সংগীত প্রভৃতি। তাঁর বহু রচনা রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের কুড়মালি ভাষা বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলা ভাষাতেও তিনি বহু ঝুমুর লিখেছিলেন। ঝুমুরের ভনিতায় তিনি 'সৃষ্টি', 'সৃষ্টিধর', 'দীন সৃষ্টিধর' প্রভৃতি নাম ব্যবহার করেছেন।

মানভূমের আরেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা কুড়মালি ভাষার অন্যতম ভাষাবিশারদ, স্বনামধন্য উকিল ও সাংসদ ক্ষুদিরাম মাহাত লিখেছেন 'কুর্মালি ভাষাতত্ত্ব', 'কুর্মালি শব্দ কোয' নামের দুটি অসাধারণ বই। এছাড়াও তিনি কুড়মালি লিপিও তৈরি করেছিলেন।

মানভূম জেলার অবিভক্ত মানবাজার থানার মেট্যালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন গিরীশচন্দ্র মাহাতো। স্বাধীনতা সংগ্রামী এই মানুষটি বাড়িতে বসেই জীবনস্মৃতিচারণার বই 'নবভারত ও মানভূমের সংগ্রাম' লিখে নিজেই ছেপে প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীগিরীশচন্দ্র মাহাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও প্রাক্তন এম.এল.এ লিখিত ওই বইতে পাওয়া যায় তাঁর জীবন সংগ্রাম এবং আনুপূর্বিক সময়ের নিখুঁত চিত্র।

মানভূম জেলায় বিয়াল্লিশের আন্দোলনের অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী পদক চন্দ্র মাহাত বরাবাজার থানার হেরবনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে রক্তে রাঙা মানভূম' শীর্ষক একটি অতি মূল্যবান ও ঐতিহাসিক গ্রন্থের জন্ম দিয়েছেন ভজহরি মাহাত এবং তিনি।

মানভূম জেলার মানবাজার থানার মাঝিহিড়া গ্রামে জন্ম যতীন্দ্রনাথ মাহাত-র।

তাঁর লেখা একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'মানভূমের শহীদ'। বাগডেগা (মাঝিহিড়া) থেকে অত্যন্ত মূল্যবান এই পুস্তকটি প্রকাশ করেন জগদীশচন্দ্র মাহাত ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে।

মাহাত পরিবারের যে ব্যক্তিটি মানভূম থেকে পুরুলিয়ার বিবর্তন পরম্পরায় আপামর জনমানসে এখনও অম্লান ভাবে স্মরণ ও শ্রদ্ধার আসনে আসীন তিনিই হলে পুরুলিয়ার সংগ্রামী যোদ্ধা তথা জননেতা, Fight For Purulia- র প্রবক্তা দেবেন্দ্রনাথ মাহাত। এই দেবেন্দ্রনাথ মাহাত বিহার সরকারের পার্লিয়ামেন্টারি সেক্রেটারি এবং এম.এল.এ ও লোকসভার সদস্য হয়েছিলেন। 'আহ্বান' পত্রিকার (পরে 'জন আহ্বান') তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সাংসদ ভজহরি মাহাতো এবং পদক মাহাত মিলে লিখেছিলেন 'রক্তে রাঙা মানভূম' নামের ইতিহাস সমৃদ্ধ গ্রন্থটি। সাংসদ ভজহরি মাহাত জন্মগ্রহণ করেছিলেন তদানিন্তন মানভূম জেলার বান্দোয়ান থানার জিতান গ্রামে।

পুরুলিয়ার বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিক, গবেষক ও বিশিষ্ট লেখক হলেন ডঃ পশুপতি প্রসাদ মাহাতো। তিনি জন্মগ্রহণ করেন পুরুলিয়া মফঃস্বল থানার অন্তর্গত ডাবর গ্রামে। ড. পশুপতিপ্রসাদ মাহাতো হলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানববিজ্ঞানী ও লোকসংস্কৃতিবিদ। তাঁর গবেষণা "Sanskritization Vs Nirbakization" থিসিসের জন্য রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. উপাধি প্রাপ্ত হন। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি নৃতত্ত্বের ওপরে বক্তৃতা দিয়েছেন। ড. মাহাতো ২০০৩-২০০৪ সালে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ইংল্যান্ডের সাসেক্স, ব্রাইটন ও হোভ-এ বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন। ২০০৪-২০০৫ সালে ব্রাইটন উৎসবে ঝুমুর গাইতে আর বক্তৃতা করতে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। এছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইংল্যান্ডের কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি এবং পিকিং ইউনিভার্সিটিতে আমন্ত্রিত হন। এমনকি তিনি জার্মানী, মস্কোতেও গিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত বইগুলি হল 'আদিবাসী অর্থনীতি ও ভূমিব্যবস্থা', 'ঝাড়খন্ডের বিদ্রোহ ও জীবন', 'ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ', 'মূল শিকড়ের খোঁজে', 'ঝাড়খণ্ডী লোকদর্শন', 'সংগ্রামী জঙ্গলমহল-মানভূম ঝাড়খন্ড বঞ্চিত পুরুলিয়া', Sanskritization Vs Nirbakization : A Study Ethnic Memocide and cultural silence in Jharkhand. 'The performing Arts of Jharkhand'., 'ঝাড়খণ্ডী লোকদর্শন', 'হড়-মিতান সামাজিক সভ্যতা ও জীবন রসবোধ' ইত্যাদি। এছাড়াও তাঁর সম্পাদনায় 'পুরুলিয়া' পত্রিকার আবির্ভাব পুরুলিয়ার সাহিত্যসেবীদের উৎসাহিত করেছিল। বহু নতুন লেখকদের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে 'পুরুলিয়া' স্বল্প দিনেই পরিচিতি

লাভ করে।

ঝালদা সত্যভামা বিদ্যাপীঠের বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রী ভগবানদাস মাহাত ঝালদা থেকে কুড়মালি পত্রিকা 'মানভূম এক্সপ্রেস' ১৯৮২ তে প্রকাশ করেন। এছাড়াও তাঁর কিছু মূল্যবান রচনা ভরত মাহাতো সম্পাদিত 'লোকসংস্কৃতি মানভূম'-এ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত 'কুড়মালি ভাষা সন্ধান' বইটি একটি অমূল্য সম্পদ। পুরুলিয়া জেলায় 'মানভূম এক্সপ্রেস' প্রথম কুড়মালি পত্রিকা হিসেবে স্থান লাভ করেন।

কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতির জগতে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলেন অনন্ত কেশরিআর (মাহাত)। একাধারে ঝুমুর কবি, ভাষাবিদ, গল্পকার, নাট্যকার ও সংস্কৃতি সংগঠক হিসাবে তাঁর খ্যাতি সর্বজন স্বীকৃত। আশির দশকের শুরুতেই কুড়মালি নাটকের দল গঠন করেন। যা "জাহলি দঁহগি" নামে খ্যাতিলাভ করে। ১৯৮৩ -তে পুরুলিয়া যুব উৎসবে এম.এস.এ ময়দানে প্রথম কুড়মালি যাত্রা পরিবেশন করেন যা কুড়মালি নাটকের ক্ষেত্রে প্রথম মঞ্চ উপস্থাপন। তিনি এখনও পর্যন্ত ৭টি কুড়মালি নাটক রচনা করেছেন। অনন্ত মাহাতোর বিখ্যাত কবিতার বই "সপন আপন" রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ ক্লাসের পাঠ্যতালিকায় স্থান পেয়েছে। এছাড়াও তাঁর 'কুড়মালি ভাঁউঅর' (ব্যাকরণ), 'সাতুল' (গল্প সংকলন), 'পিয়াসী' ও 'সিঁদুর কাজর' (ঝুমুর গ্রন্থ) প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় তিন শতাধিক ঝুমুর গান রচনা করেছেন। ঝুমুরে যিশুর জীবনালেখ্য রচনা করেছেন ও বাইবেলের বহু গল্প কুড়মালিতে অনুবাদ করেছেন। শ্রীমান অনন্ত মাহাতকে আধুনিক কুড়মালি কবিতার জনক বললেও অত্যুক্তি হবে না, বলেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ভগবানদাস মাহাত। তিনি মানভূম এক্সপ্রেসের সম্পাদনার কাজে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন ও নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। তার অনন্য সাহিত্য কৃতির স্বীকৃতি স্বরূপ মানভূম দলিত সাহিত্য পরিষদ, আদিবাসী লোক সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক পুরস্কৃত ও সংবর্ধিত হয়েছেন।

বিশিষ্ট কুড়মালি ভাষাবিদ পদ্মলোচন মাহাত ও শশাঙ্ক মাহাতর নেতৃত্বে সত্তর ও আশির দশকে কুড়মালি ভাষা আন্দোলন গড়ে ওঠে চাষরোড সিন্দরীকে কেন্দ্র করে। এইসময় 'হুব' পত্রিকা শুরু হয়। 'সাহরুল' পত্রিকারও আত্মপ্রকাশ ঘটে। সংবাদধর্মী কুড়মালি পত্রিকা 'আনার-বানার'এর প্রকাশ হয়। কুড়মালি ভাষায় বইপত্র প্রকাশের কাজকর্ম শুরু হয়ে যায় পুর্নোদ্যমে। রাঁচী থেকে 'কুড়মালি' ধানবাদ থেকে 'বনফুল' নামে কুড়মালি ভাষাতে পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে।

অবশেষে ১৯৮০ সালে লক্ষীকান্ত মুতরুআর, শ্রীপদ মাহাত, আনন্দ খুঁটদার, শশীভূষণ মাহাত প্রমুখদের চেষ্টায় রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ে কুড়মালি ভাষায় পঠন-পাঠন শুরু হয়। ভাষা সংস্কৃতি চর্চায় কোমর বেঁধে নেমে পড়েন অনন্ত কেশরিয়ার, সুনীল

মাহাত, কিরীটি মাহাতর মতো মানুষেরা। বর্তমানেও যা অব্যাহত রয়েছে।

স্বনামধন্য কুড়মালি ভাষাবিদ তথা শিক্ষক পদ্মলোচন মাহাত লিখেছেন কুরমালি (কুড়মালি)/সাদানি ভাষার (ভাখিক) ব্যাকরণ (বেউরা)। যা পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছিল এবং তার প্রকাশক ছিলেন শশাঙ্কশেখর মাহাত।

পুরুলিয়ার পাড়া থানার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের বিশিষ্ট ঝুমুর শিল্পী, লোকসংস্কৃতিবিদ ও কুড়মালি লেখক এবং গবেষক হলেন কিরীটি মাহাত। তাঁর রচিত 'ঝুমুর সংগীত ও সাহিত্য', 'আদি চর্যাপদ', 'ঝাড়খন্ডী ব্লু বুক', রিঝামাঠা (কুড়মালি গীত সংকলন), 'কুড়মি জাতি ও কুড়মালি ভাষা আন্দোলন', 'ঝুমুর ও চর্যাপদ', 'ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার আন্দোলন কি ও কেন?' ইত্যাদি। কিরীটি মাহাত তাঁর 'সিন্ধু সভ্যতার ভাষা ও কুড়মালি' গ্রন্থে বহু অজানা তথ্য তুলে ধরেছেন। যৌথ সম্পাদনায় তিনি প্রকাশিত করেছেন 'লোকভূমি মানভূম', 'মানভূমের সংস্কার বিচিত্রা', 'নির্বাচিত মানভূমি কবিতা', 'কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি' প্রভৃতি গ্রন্থ। করম পরবের গানগুলি নিয়ে তাঁর বিশেষ গ্রন্থ 'জাওয়া ডালি' এবং বাঁদনা পরবের গীতগুলি নিয়ে সংকলন 'অহিরা' প্রকাশিত হয়েছে। সিধু-কানহু-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'ঝুমুরঃ লোকজীবনের সন্ধান' একটি অসাধারণ ও অনন্য গ্রন্থ। বর্তমানে তিনি 'মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি' নামে একটি সংগঠনের সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেছেন। কুড়মালি পত্রিকা 'মুলুক' প্রকাশেও তাঁর ছিল ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। তাঁর বহু আলোচিত 'ঝুমুর ও চর্যাপদ' এবং 'আদি চর্যাপদ' গবেষণামূলক গ্রন্থখানির জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে 'চর্যাপদ' বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার বিশেষ আমন্ত্রিত ব্যক্তি ছিলেন।

কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে কয়েকটি সংস্থা গঠিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য হলো- "মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি"। এই সংস্থার একজন বিদ্যোৎসাহী ও বিদগ্ধ ব্যক্তি হলেন শ্রীপদ বঁসরিআর। তিনি রচনা করেছেন 'কুড়মালি সংস্কৃতি ও তন্ত্র ধর্ম' নামে একখানি বই। কুড়মালি কবিতার বই 'টুসু' প্রকাশ করেছেন শশাঙ্ক শেখর মাহাত। বিশিষ্ট কবি শক্তিপদ বঁসরিআর রচনা করেছেন 'ভিনসার', 'রিমিঝিমি', 'সেঁউরনি জাগরন গিত', 'মাঞেক হাথে বেটিক জিবন'(নাটক) প্রভৃতি গ্রন্থ। 'মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি'-র অন্যতম সদস্য শিক্ষক, লেখক ও গবেষক হলেন সঞ্জীব মাহাত। তাঁর গবেষণাধর্মী লেখা দেশের এবং বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। কুড়মালি ভাষাকে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি বদ্ধপরিকর। ছত্রমোহন মাহাত রচনা করেছেন 'মহুল কঁড়ির মহক', 'মায়ামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থ ও 'আহনা কুড়মালি দাঁতকথা'। মনোরঞ্জন মাহাত লিখেছেন-'কুড়মি কুড়মালি', 'সেদিন ঝাড়খন্ড রাজ্য হল না কেন?' প্রভৃতি অসাধারণ

পুস্তক। ঝুমুর গবেষক ও শিল্পী ড. বীণাপানি মাহাত তাঁর লেখনীর মাধ্যমে দেশের নানা পত্র-পত্রিকায় দীর্ঘদিন যাবৎ ঝুমুর গান সম্বন্ধে লিখে চলেছেন। তাঁর মূল্যবান লেখাগুলি 'ঝাড়খন্ডের ঝুমুর সঙ্গীত' নামে 'শিলালিপি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে পুরুলিয়ার আঞ্চলিক কবিতার অন্যতম প্রতিভাবান কবি হলেন শশধর মাহাতো। তাঁর বিখ্যাত কবিতার বই 'তাও পুরুল্যাকে নেদাড়িয়েই বলে' এবং 'রাঙামাটিয়ে চেঙা'। এছাড়াও তিনি নিয়মিত 'ডি-ডাহাল' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করে চলেছেন।

পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক ড. ক্ষীরোদ চন্দ্র মাহাতো এবং হংসেশ্বর মাহাতো লিখেছেন 'নাচনি শিল্পী সিন্ধুবালা' নামে একটি অসাধারণ বই। এছাড়াও ক্ষীরোদ বাবুর ঝুমুর ও তার নানা প্রসঙ্গ ও মানভূঞ্রা ছৌ নামে দুটি গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

তরণী তারণ মাহাত লিখেছেন করমতত্ত্ব নামে একখানি বই যা পুরুলিয়ার শিব সাধনা প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

এ জেলার বিশিষ্ট ঝুমুর গান সংগ্রাহক ও গায়ক শিল্পী শ্রীভুক্ত মাহাত রচনা করেছেন। 'পুরুলিয়া বার মাইসা সংগীত' নামে ঝুমুর গানের এক অনন্য সাধারণ গ্রন্থ।

লোকসংস্কৃতির জগতে যে কয়জন বিদগ্ধ পন্ডিত মানুষ এখনও লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত আছেন তার মধ্যে সৃষ্টিধর মাহাতর (বঁশরিআর) নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সৃষ্টিধর মাহাত-র জন্ম কুলডি গ্রামে। বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প, নাটক, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কয়েকটি মহামূল্যবান গ্রন্থ হল- 'মানভূমের লোককথা', 'আমার টুসু তোমার টুসু', 'লেখাপড়া শিখ', 'ফিরে দেখা মহাপ্রাণ সীতারাম মাহাত', 'কুড়মালি নেগ-নীতি নেগাচার' ও 'মানভূমের রূপকথা' প্রভৃতি। এছাড়াও তিনি 'আখড়া' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তাঁর পরিচালিত সামাজিক-সংস্কৃতিক সংগঠন হল 'মিলন আখড়া'।

বিশিষ্ট গ্রন্থকার ও চাষ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক অনাদি নাথ নাহাত (কইড়আর) লিখেছেন 'কুড়মালি ভাষার উৎস ও বিকাশের ইতিহাস' (সংক্ষিপ্ত) নামে অসাধারণ একটি বই। কুড়মালি ভাষার উৎস ও তার বিকাশ সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যায় এই বইটি থেকে। কুড়মালি ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধীয় বইটি একটি আকর গ্রন্থ।

পুরুলিয়া জে.কে. কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালে। সেই সময় পুরুলিয়া শহরের বুকে নডিহা নামক স্থানে কুড়মি ছাত্রদের বৈঠক বসত। সেখানে সমাজকে কি করে উঁচু স্তরে নিয়ে যাওয়া যায়, তার চিন্তাভাবনা করা হত। এই সময় তারা সবাই মিলে 'তুফান' নামে একটা পত্রিকা বার করত। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন করণডি

নিবাসী নকুল মাহাত।

হুড়া বিধানসভা এলাকার একদা বিধায়ক তথা লক্ষণপুর হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সমাজকর্মী শতদল মাহাত-র আত্মকথা নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন ব্রহ্মচারী সুবোধানন্দ। গ্রন্থটির প্রকাশক হলেন ভূষণ চন্দ্র মাহাত।

'মানভূম কেইসন সুন্দর', পিঁদাড়ে পলাশের বন' খ্যাত মানভূম তথা বর্তমান পুরুলিয়ার সবথেকে প্রতিভাবান রচনাকার হলেন সুনীল মাহাত। 'অতিথি', 'সারহুল', 'পুরুলিয়া এক্সপ্রেস', 'আনার-বানার', ইত্যাদি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। বর্তমানে 'করমতীর্থ' পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর রচিত করমকাথা (কুড়মালি কাব্যগ্রন্থ), সাতুল (সম্পাদিত কুড়মালি গল্প সংকলন), কবিতা, গল্প রাঁচী , কোলহান, হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগনা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর, স্নাতক ও মাধ্যমিক স্তরে দীর্ঘদিন যাবৎ পঠিত হচ্ছে। সুনীলবাবুর লেখা কতকগুলি বই এর নাম হল-কুড়মালি মহাভারত কাথা (কাব্য), কুড়মালি রাম কাথা (কাব্য), পিঁদাড়ে পলাশের বন (ঝুমুর কাব্য), মানভূম কেইসন সুন্দর (ঝুমুর কাব্য), রবি ঠাকুরেক গীত (রবীন্দ্রসংগীতের অনুবাদ), ঝাড়খন্ডের যীশু (জীবনীগ্রন্থ), জল ও রক্ত (নাটক), ধূসর ভূমির কাব্য (কবিতা), ডহনডালি (কুড়মালি উপন্যাস), টেসারাজাক পাঁখা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কবি ও সাহিত্যিক গবেষক সুনীল মাহাতোকে 'সুধী প্রধান' পুরস্কারে ভূষিত করে তার অনন্য সাধারণ সাহিত্য সাধানার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ কুড়মালি একাডেমি থেকেও বেশ কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তার মধ্যে 'লতে লতে বিহা গীত' একটি উল্লেখযোগ্য বই।

বিশিষ্ট গ্রন্থকার শ্রী জ্যোতিলাল মাহাত'র উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই হল-'সিন্ধু থেকে সুবর্ণরেখা', 'কিরাৎভূমি', 'জম্বুদ্বীপের কথা', 'মানুষের সৃষ্টি ঈশ্বর ও দেবদেবী, ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষ নই' ইত্যাদি।

সমভুনাথ মাহাতঅ (বঁসরিআর) লিখেছেন 'ভাঁউঅর' নামে একটি কুড়মালি ব্যাকরণ বই।

এছাড়াও শিশির কুমার মাহাতোর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'অগ্রদূত' (১৯৬৭) নামে পত্রিকা, 'গৈরিক পতাকা' সম্পাদনা করেছেন ললিত মোহন মাহাতো। 'ধূসরভূম' (১৯৮০) সম্পাদনা করেছেন সুনীল মাহাতো, 'ঝাড়খন্ড' (১৯৭৯) সম্পাদনা করেছেন পার্বতীচরণ মাহাতো, বিখ্যাত 'সারহুল' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন সুনীল মাহাতো, 'করমতীর্থ' (১৯৮০) পত্রিকাটি বার হত নিত্যানন্দ মাহাতো এবং পার্বতীচরণ মাহাতোর সম্পাদনায়। 'আখড়া' (১৯৮২-৮৩) পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন সৃষ্টিধর মাহাতো।

পুরুলিয়া জেলার দলিত মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম জনহিতৈষী ব্যক্তি হলেন চারিয়ান মাহাতো। তিনি 'কুড়মি জাতির বিকাশের উদ্দেশ্যে' একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়াও 'লয়া সুরজ' (১৯৯৫) নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

বিশিষ্ট অধ্যাপক জয়দেব মাহাতো রচনা করেছেন "আম্বেদকরের জীবন দর্শন ও ব্রাহ্মণ্যবাদ" নামে একটি অসাধারণ বই।

জেলার অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী পুঞ্চা থানার ভূতাম গ্রামের বৈদ্যনাথ মাহাত। তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামে মানভূম' বইতে সেই অগ্নিক্ষরা দিনের ইতিহাস লিখে গেছেন কবিতায়। 'পুরুলিয়ার সংগ্রামী যোদ্ধা দেবেন্দ্রনাথ মাহাত'-র স্মরণে তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশ করেছেন ভূপাল চন্দ্র মাহাত।

তরুণ প্রতিভাবান লেখকদের মধ্যে সাধন মাহাত একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর বেশ কয়েকটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল- বাঁদনা (প্রবন্ধ সংকলন), টুসু (প্রবন্ধ সংকলন) ও করম (প্রবন্ধ সংকলন)। এছাড়াও কিরীটি মাহাত-র সহিত বার করেছেন বিহা গীত সংকলন 'আমপাত চিরিচিরি'। কুড়মালি 'মুলুক' পত্রিকা প্রকাশ করেছেন।

বিশিষ্ট সাংবাদিক, কুড়মালি কবি অভিমন্যু মাহাত প্রকাশ করেছেন 'জহার' নামে কুড়মালি কবিতার অনন্য গ্রন্থখানি।

বর্তমানে বহু কুড়মি নর নারী সাহিত্য রচনার দিকে এগিয়ে এসেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল- অভিমন্যু মাহাত, স্বপন মাহাত, সাধন মাহাত, প্রদীপ মাহাত, প্রভাস মাহাত, রাখহরি মাহাত, রাধানাথ মাহাত, করুণাময়ী মাহাত ইত্যাদি। কুড়মি জনজাতির মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে এদের অবদান অনস্বীকার্য। কুড়মি জনজাতিকে গোটা বিশ্বের সামনের সারিতে এগিয়ে নিয়ে চলুক ও তার সাহিত্যধারা আরও বিকশিত হয় তার প্রচেষ্টা নিরন্তর থাকুক।

তথ্যসূত্র:

১। জঙ্গলমহল ও ঝাড়খণ্ডী লোকদর্শন - পশুপতি প্রসাদ মাহাত

২। Sanskritization Vs Nirbakization - পশুপতি প্রসাদ মাহাত

৩। জঙ্গলমহল - রাঢ়ভূম ও ঝাড়িখন্ডের ভূমিব্যবস্থা সংস্কৃতি ও সংগ্রামী ইতিহাসের রূপরেখা - পশুপতি প্রসাদ মাহাতো

৪। কুড়মালি ভাষা সন্ধান - শ্রী ভগবান দাস মাহাত

৫। মানভূমের স্মরণীয় যাঁরা - অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

৬। পশ্চিমবঙ্গ, পুরুলিয়া জেলা সংখ্যা
৭। সগড় স্মারক গ্রন্থ
৮। পুরুলিয়া - তরুণদেব ভট্টাচার্য
৯। অহল্যাভূমি পুরুলিয়া - দেবপ্রসাদ জানা
১০। আবার যুগান্তর সংবাদপত্র
১১। রাঙামাটি সংবাদ পুরুলিয়া উৎসব সংখ্যা-২০২১
১২। পুরুলিয়ার সাহিত্য সংস্কৃতি ও রাজন্য অবদান - প্রবীর সরকার
১৩। ডহনডালি - সুনীল মাহাত
১৪। শতদল মাহাত-র আত্মকথা
১৫। বিশেষ তথ্য সহায়তা - কিরীটি মাহাত (রামকৃষ্ণপুর), নন্দলাল মাহাত (চাটুমাদার)
১৬। ঝুমুর ও চর্যাপদ - কিরীটি মাহাত
১৭। মানভূমের রূপকথা - সৃষ্টিধর মাহাত
১৮। নির্বাচিত ঝুমুর সমগ্র - কিরীটি মাহাত ও শ্রমিক সেন
১৯। ফিরে দেখা মহাপ্রাণ সীতারাম মাহাত, সৃষ্টিধর মাহাত
২০। কুড়মালি ভাষার উৎস ও বিকাশের ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত) - অনাদিনাথ মাহাত

সংস্কৃতি

কুড়মালি সমাজ দর্শন

সৃষ্টিধর মাহাত (বঁসরিআর)

ভূমিকা:

কুড়মালি সমাজ অতীব বৃহৎ সমাজ। এই সমাজের বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা বিপুল এলাকা জুড়ে। বলা যায় গোটা ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বর্তমান সীমানার বাইরেও এর ব্যাপ্তি আছে। এই সমাজের সমাজ দর্শন অনেক গভীর ও সুক্ষ্ম। গভীর ও সুক্ষ্মাতি সুক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনা বিশেষজ্ঞ পন্ডিত গবেষকগণই সুচারুরূপে করতে পারেন বলে আমি মনে করি। আগাম বলে নেওয়া ভাল, আমি পন্ডিত কিম্বা গবেষক এমনকি তেমন উচ্চ শিক্ষিতও নহি। একেবারে সাধারণ মানুষ। আমার পক্ষে এই রকম দুরুহ ও কঠিন কাজ করা একরকম অসম্ভবই বলা যায়। তবু কেন জানিনা আমার ভাতৃপ্রতীম কিরীটি মাহাত আমাকে এই বিষয়ে লিখবার জন্য অনুরোধ জানাল। কিরীটি ভাইয়ের অনুরোধটি এতই আন্তরিক ছিল সেই কারণে যেমন পারি লিখবার চেষ্টা করব বলে কথা দিয়ে ফেলি।

আমার লেখার মূলধন বলতে আমি কুড়মি সমাজে জন্মেছি। বাল্যকাল থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত আমার সমাজ-সামাজিকতা বিষয়ে জানা-বোঝার আগ্রহ আজও বেড়েই চলেছে। সর্বদা অন্তরের টান অনুভব করেছি। শ্রদ্ধা-ভালবাসায় দিনে দিনে আপ্লুত করেছি। তবু দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমার পূর্ব পুরুষ ও পিঢ়ি জননীদের কাছ থেকে এবং সমাজের অন্যান্য বু-হড় = বুঢ়া-পুরখাদের কাছ থেকে যেটুকু শুনেছি, জেনেছি, বুঝেছি সেইটুকু সম্বল করে বলার প্রয়াস করছি। আরও বলা ভাল বলে মনে করি, কুড়মি সমাজের তো বটেই অন্যান্য অনেক জাতি গোষ্ঠীর সমাজ নেতা-কর্মীদের সাহচর্য পাওয়ার সুযোগ আমি পেয়েছি। তাঁদের কাছ থেকেও তাঁদের অভিজ্ঞতার জ্ঞান আহরণ করার সতত সচেষ্ট থেকেছি। পাঠক সাধারণের কাছে আগাম একটি সানুনয় অনুরোধ জানিয়ে রাখি গল্পজ্ঞানে যা লিখছি- আপনার মত করে সংযোজন বিয়োজন করে নিবেন। মনে রাখবেন, লেখাটি শেষ কথা নহে, এর

বাইরে আরও অনেক কিছু অতি অবশ্যই আছে। যেখানে আমি পৌঁছাতে পারিনি।

আদি সমাজ গড়ার গোড়ার কিছু কথা:

কোন নূতন কথা নয়। সবারই জানা কথা। কিছু কথা আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি। কিছু কথা লোকের মুখে মুখে প্রচারিত লোক শ্রুতির দ্বারা জানতে পারি। আদিমকালে বন্য মানুষ বনের পশু-পাখি শিকার করে বনের অন্যান্য পশুর মতই কাঁচা মাংস খেয়ে এবং ফল-মূল-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করত। গাছের কোটরে পাহাড়-পাথরের গুহায় বাস করত। ঘর তৈরী করতে পর্যন্ত জানত না। এমনিভাবে হাজার হাজার বৎসর কাল ধরে মানুষ বন্য, বর্বর, অর্ধবর্বর, যাযাবর অবস্থায় থাকতে থাকতে ক্রমে ক্রমে ঘর বাঁধতে শিখল। আগুনের ব্যবহার জানতে পারল। অনেক কাল পরে শিকার করার সাথে সাথে কিছু কিছু চাষ করতে শিখল। কালে কালে ক্রমে ক্রমে মানুষ আপন প্রয়োজনের তাগিদে আরও অনেক কিছুর ব্যবহার জানল। আস্তে আস্তে যাযাবর জীবন ত্যাগ করে এক জায়গায় বসবাস আরম্ভ করল। পরে পরে একই জায়গায় স্থায়ীভাবে পাশাপাশি কাছাকাছি বসতি গড়ে গাঁ-ঘর স্থাপন করল। এক সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে নিজেদের মধ্যে যেমন সখ্যতা গড়ে উঠল অপর দিকে তেমনি নানান বিষয় নিয়ে বিবাদ-ঝগড়া হতে লাগল। অনেক সময় ঝগড়া-ঝাঁটি ভয়ানক আকার ধারণ করত। অনেক মানুষ ও সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি হতে লাগল। দলের মধ্যে অনেক ভাবুক মানুষ চিন্তা-ভাবনা করে এর থেকে পরিত্রাণের উপায় খোঁজার চেষ্টা করল। নিজেদের বাঁচার প্রয়োজনে দীর্ঘ চিন্তাভাবনা, যুক্তি-পরামর্শ করে উপায় বার করল। নিজেদের মধ্যে নিয়ম-নীতি তৈরী করল। তারপর সমাজ গঠন করল। সমাজ গঠন করে হিংস্র পশুর, বহিঃশত্রুর, রোগ-ব্যাধির আক্রমন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে যৌথভাবে মোকাবিলা করার উপায় খুঁজতে পারল। এইভাবেই বহু প্রাচীনকালে মানুষের সমাজ গঠন হয়েছিল।

কুড়মালি সমাজ:

আদিমকালে মানুষ বাঁচার প্রয়োজনে সুস্থভাবে, নিরাপদে, সুখে-শান্তিতে বসবাস করার তাগিদে যে সমাজ তৈরী করেছিল কুড়মালি সমাজ গঠনও তারই ধারাবাহিক রূপ মাত্র। কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কুড়মি একটি জাতি গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায় নামে পরিচিত। কুড়মি জাতির একটি নিজস্ব সমাজ আছে। তার সামাজিকতা আছে। সমাজের দর্শনও আছে । এই দর্শনই সমাজের প্রাণ স্বরূপ। কুড়মি সমাজ মূলতঃ কৃষক। এই সমাজের মানুষ কৃষি সংস্কৃতির মানুষ। এঁরা গোষ্ঠীগত ভাবে বসবাস করতে ভালবাসে। কথা বলে পানিক লক্ষ্যে চাষ আর কুটুম লক্ষ্যে বাস। এখানে বলে নেওয়া যেতে পারে কুড়মালি সমাজ কিন্তু একা কুড়মি জাতিরই নহে। কুড়মি

একটি জাতি হলেও কুড়মি ভাবাপন্ন গোষ্ঠী সমূহের সমাহারে গঠিত কুড়মালি সমাজ। বলা যায় কুড়মালি একটি "কুড়"। ভুলে গেলে চলবে না এই সমাজ অবচীন সমাজ নহে। বহু প্রাচীন কালে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন এই সমাজ গঠিত হয় তখন মানুষকে মানুষ নামে অভিহিত করা হত না। মানুষকে বলা হত 'হড়'।

কুড়মালি সমাজ কেমন একটি অতি সাধারণ উদাহরণ দিয়ে সহজে বোঝা যায়। আমরা সকলেই লাউ মাচা দেখেছি। অনেকগুলি লত নিজস্বভাবে প্রাকৃতিক গুনে আকর্ষ পেয়ে মাচাটিকে ধরে থাকে। তারপর নিজের শাখা প্রশাখা বিস্তার করে মাচাটিকে ছেয়ে ফেলে। নিজ নিজ বংশ রক্ষার তাগিদে ফুল-ফল সৃষ্টি করে থাকে। কৃষকের বাড়ীর ঐ লাউ মাচাটিকে দূর থেকে দেখলে মনে হবে একটি লতাই মাচাটিতে আছে। কিন্তু নীচের গোড়াগুলি কাছ থেকে দেখলে বোঝা যাবে অনেকগুলি লতাই মাচাটিতে উঠেছে। ব্যক্তি নিয়ে সমাজ। এক একটি পরিবার সমাজের একক। এই এক একটি পরিবারকে যদি ধরা যায় মাচার একটি লতা যদি একটি পরিবারের কোন এক জন সদস্যকে ধরে হিসাব করা যায় তা হলে দেখা যাবে পরিবারে মা আছে, বাবা আছে, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে আছে। স্বামী-স্ত্রী আছে। তাদের আত্মীয় স্বজন, মামাবাড়ী, শ্বশুরবাড়ী, মাসী-পিসি বাড়ী আছে। আত্মীয়দেরও প্রত্যেকের এমনতর শ্বশুরবাড়ী, মামাবাড়ী, মাসী-পিসী বাড়ী আছে লতের লত তারও আবার লত। এইভাবে লতে লতে লাউ লতের আকর্ষর মত পরস্পর পরস্পরকেজড়িয়ে ধরে আছে। তাদের ভাল থাকা, মন্দ থাকা, নাম-সুনাম, বদনামের ফল আংশিকভাবে হলেও আমাকে জড়িয়ে ফেলবে। মাচা ভেঙে গেলে লাউ লতের সমূহ ক্ষতি হবে। সমাজ ঠিক এমনি লাউ মাচার মত। এই মাচাটাই সমাজ। সমাজ ভাল থাকলে সমাজ ধরে আমরা সকলেই ভাল থাকতে পারি।

যাইহোক, আমাদের মনে রাখতে হবে হড় জনগোষ্ঠীর দলপতি ও অভিভাবক মহাহড় বুঢ়াবাবা শিব হড়জনের সমাজ তৈরী করেন। তিনি সৃষ্টিকর্তা নহেন, তিনি ঈশ* হড় ঈশ্বর। নবীস্বরূপ। তিনিই জগতের প্রথম ঈশ্বর মহেশ্বর। বুঢ়াবাবা শিব হড়জনের আদি ধরম গুরু। তিনিই সত্য > সারি ধর্মের প্রবক্তা। বর্তমানে হড় জনগোষ্ঠীর মানুষেরাই হল ভারতবর্ষের মুলবাসী আদিবাসী মানুষ। এই আদিবাসী মানুষ বুঢ়াবাবা শিবের অনুগামী ও ভক্ত। কালে কালে হড় জনের বংশবৃদ্ধি ঘটে। এবং জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। জানা যায়, এক সময় কাল অবধি ছড়িয়ে পড়া দলগুলির কুরম পাহাড়, হিহিড়ি পিহিড়ি, চাই চম্পা অংশের জনগোষ্ঠীর পরিচয় হয় "খেরওয়াল" বলে।

পরবর্তীকালে এই 'খেরওয়াল' গোষ্ঠী চাইচম্পা প্রদেশ থেকে কল, কুড়মি, কড়া, সাঁওতাল, ভূমিজ, বেদিয়া, মাহালি, শবর, বিরহড়, মুন্ডা, গন্ড, ভীল ইত্যাদি নামে বিভক্ত হয়ে নানা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। লোকশ্রুতি থেকে জানা যায় এই চম্পাগড় পর্যন্ত সকলে এক সঙ্গেই ছিল। খেরওয়াল জনগোষ্ঠী অনেক দলে ও গোষ্ঠীতে ভাগ হয়েছে ঠিকই কিন্তু সকলেরই সেই আদি কালের সমাজ-সামাজিকতা এবং ধর্মের মূল কাঠামো একই থেকে গেছে। এই চম্পাগড় হরপ্পা-সিন্ধু সভ্যতার একটি প্রদেশ বলে জানা যায়। আরো জানা যায় আর্যরা সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস করে দিলে এবং অসহনীয় অত্যাচার সইতে না পেরে জীবন ও ধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষার জন্য 'খেরওয়াল' জনগোষ্ঠীর মানুষ সিন্ধু সভ্যতা ছেড়ে বনে-জঙ্গলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কুড়মি তথা কুড়মালি সমাজ ও সামাজিকতা সেই খেরওয়াল জনগোষ্ঠীর সমাজ সামাজিকতারই অংশ বিশেষ। এই সমাজ ও সামাজিকতায় বর্তমান কাল অবধি এসে সময় কাল ও পরিস্থিতির সাথে সাথে কিছু কিছু সংযোজন বিয়োজন হয়েছে একথা মানতেই হয় কিন্তু মূল সুর, কাঠামো বা শিকড় একই থেকে গেছে। কুড়মি তথা কুড়মালি সমাজের বাইরের অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর যে সমাজ আছে তাঁদের সমাজ-সামাজিকতার সঙ্গে কুড়মালি সামাজিকতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সেই কারণে কুড়মালি সমাজ দর্শনকে আলোচনা করলে অন্যান্য আদিবাসী সমাজের দর্শনকেও বোঝা যায়। দেখা যাবে, কুড়মালি দর্শনের সাথে অপরাপর আদিবাসীদের সমাজ দর্শন ও মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। অতি সামান্যই ব্যবধান খুঁজে পাওয়া যাবে। তাই কুড়মালি সমাজ দর্শনকে কুড়মালি সমাজ দর্শন না বলে আদিবাসী দর্শন বললে অধিক যুক্তিপূর্ণ হতে পারে। অনেক কথা হল, আর নয়; আসি কুড়মালি সমাজ দর্শনের কথায়।

কুড়মালি সমাজ দর্শনের কথা:

কুড়মালি তথা আদিবাসী সমাজ দর্শন পৃথিবীর প্রাচীনতম দর্শন। দর্শন কথার সাধারণ অর্থ নীতি-নিয়ম। সমাজ কেমন হবে, কেমন ভাবে চলবে তারই রূপরেখা মাত্র। কুড়মালি সমাজ দর্শন সাম্যবাদী, মানবতাবাদী, বাস্তববাদী, যুক্তিবাদী ও নেগাচারি দর্শন। জগৎপিতা সূর্যদেব যেমন তাঁর সৃষ্ট জীবকূল, উদ্ভিদকুলকে সমানভাবে আলো ও উত্তাপ দান করেন এবং জগৎমাতা ধরতি মাঞ পৃথিবী সকলকে বসবাসের জন্য ভূমি ও খাদ্যের যোগান দিয়ে লালন পালন করেন এই নীতি-নিয়মের সূত্র ধরেই কুড়মালি সমাজ দর্শন গঠন করা হয়েছে বা রচিত হয়েছে। বলা যায়- বাঁধা হয়েছে। কেমন সেই নীতি-নিয়ম তথা দর্শন বাঁধা হয়েছে একবার উলটে-পালটে দেখে নি। সবিই পুরাতন একরকম সকলেরই জানা কথা তবুও ঘুরে ফিরে দেখে নিলে লাভ ছাড়া ক্ষতির তেমন আশঙ্কা কিছু নেই।

১। কুড়মালি সমাজ দর্শন সাম্যবাদী দর্শন:

বুঢ়াবাবা শিব জগৎ পিতা সুর্যদেব ও জগৎ মাতা পৃথিবীর এবং অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রের নীতি নিয়ম অনুধাবন করে সেই নীতি নিয়মকে অবলম্বন করেই আদিবাসী তথা কুড়মালি সমাজ দর্শন তৈরী করে দিয়ে গিয়েছেন। সূর্য-পৃথিবী-চাঁদ, গ্রহ-নক্ষত্র তাঁদের আলো উত্তাপ বিতরণের ক্ষেত্রে যেমন কোনরূপ ভিন্নতা করে না সবাইকে সমানভাবে বিতরণ করে থাকে। কে ছোট, কে বড়, কে ভাল, কে মন্দ, কে ধার্মিক, কে অধার্মিক, কে সবল না দুর্বল তার কোন কিছুরেই বাছ-বিচার করে না। সকলকে সমান সমান ভাবে ভাগাভাগি করে দেয়। সেই নীতি অনুযায়ী যাতে করে সকল মানুষ উৎপাদিত ফসল সম্পদ সমানভাবে উপভোগ করার সুযোগ পায় এই দর্শনে তার জন্য সম 'অজ' -এর নীতি তৈরী করা হয়েছে। "অজ" অর্থে সমান ভাগ। সম অজ নিয়েই কুড়মালি সমাজ। কেবলমাত্র ধন-সম্পদেই নয়, সমানভাবে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, মান-মর্যাদা, দায়-দায়িত্ব এমনকি কুটুম-কুটমালি সবকিছুরই সমান সমান ভাগ। শক্তিমান, বুদ্ধিমান, সবল ব্যক্তি বেশী বেশী ভোগ দখল করবে এমন কিন্তু নয়। দুর্বল ব্যক্তিও সমান ভাগের ভাগিদার হবে।

সম অজের নীতিকে জাগরুক রাখার জন্য কুড়মালি দর্শনে কিছু প্রথার প্রচলনের কথা বলা হয়েছে। প্রথাগুলি হল- যেমন ভাগ, ভোগ, ভেজা, ভোজ ইত্যাদি ইত্যাদি। উদাহরণ সহযোগে এইগুলি ব্যাখ্যা করলে সহজেই বোঝা যাবে। অতি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি।

ভাগ:

কুড়মালি সমাজ দর্শনে ভাগ কথার অর্থ অংশ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম অজের ভিত্তিতে কেমনভাবে ভাগ হবে এই দর্শনে সেই কথা পরিষ্কার বলা হয়েছে।

(ক) পারিবারিক ক্ষেত্রে: যৌথ পরিবারে আয় উপায় যে যেমনভাবে যতটুকু করুন না কেন তাকে পরিবারের আয় হিসাবে ধরতে হবে। সময় অনুসারে কেউ কম কেউ বেশী উপার্জন করতেই পারে কিন্তু খাওয়া-পরা-মাখার ক্ষেত্রে পরিবারের সকলের জন্যই হবে সমানভাবে বাঁটুয়ারা। কারু জন্য ভাগে বেশী খাবার আর কারুর জন্যে কম এমনটি কিন্তু কোন অবস্থাই হবে না। কম-বেশী দেওয়ার কোন রীতি-নিয়ম নেই।

এক অন্ন থেকে পৃথক বা আলাদা হওয়ার সময় পরিবারের যত ভাই থাকবে সেই অনুসারে স্থাবর-অস্থাবর জমি-সম্পত্তি সমানভাবে ভাগ করা হবে। কথায় বলে-"কানা ভাই ভাগের ঠাকুর।" ঘরের থালা-বাসন, আসবাব পত্র, চাল-ধান, গাই-গরু, গৃহপালিত পশু-পাখীকেও সমানভাবে ভাগ বাঁটোয়ারা করা হবে। যদি

ভাগ করার ক্ষেত্রে সংখ্যার গরমিল ঘটে তাহলে মূল্য ধরে সম অজের ভিত্তিতে ভাগ হবে। এখানে একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের নীতি আছে। জমি-সম্পত্তি ভাগের সময় মান্যমান হিসাবে সম্মান স্বরূপ বড় ভাইকে কিছু পরিমান জমি বড় অংশ হিসাবে দেওয়ার কুড়মালি দর্শনে বলা আছে। সেটি সকল ভাইয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে হবে। কোন এক ভাইয়ের মত না থাকলে এই অংশ দেওয়া যাবে না। পাঁচ ভদ্রান অমতকারীকে বোঝানোর প্রচেষ্টা করবেন। এটা সামাজিক বিধান সে কথা তাঁরা ব্যাখ্যা করে বলবেন।

(খ) দলগতভাবে কাজ করতে গেলে: দলগতভাবে যুক্তির ভিত্তিতে অর্থ ও দ্রব্য উপার্জনের জন্য যদি কাজ করতে যাওয়া হয় কুড়মালি সমাজ দর্শনে কাজের শেষে যে অর্থ বা দ্রব্য উপার্জন হবে তা সমানভাবে বন্টন করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। দেখা গেছে কারো বাড়ী তৈরী মাটি কাট, কাঠ কাটা, ধান ঝাড়াই-মাড়াই করা ইত্যাদি কাজ ঠিকা যুক্তির নিয়মে দলগতভাবে কাজ করা হয়ে থাকে।

(গ) দলগতভাবে শিকার করতে গেলে: কুড়মালি নেগাচারি মানুষ অনেক সময় দল বেঁধে বনে পশু-পাখি শিকার করতে যায়। যার বাড়ীতে যেমন অস্ত্র ও সরঞ্জাম থাকে সেই সকল হাতে নিয়ে শিকারে যায়। কারো কোন অস্ত্র বা সরঞ্জাম থাকে না সে খালি হাতেই যায়। বনের শিকার করার পর বাড়ী ফেরার সময় কোন গাছের তলায় কিংবা বড় চাটানের (পাথরের) উপর বসে মাংস ভাগ করা হবে এই সমাজ দর্শনে কেমন ভাবে মাংস ভাগ হবে সেই কথা বলে দেওয়া আছে। দলে মুড় গুনতি যতজন শিকারী বা লোক থাকবে, সঙ্গে যদি কুকুর থাকে তাকেও একটি একক হিসাবে ধরে নিয়ে মাংস ভাগ করা হবে। কে দক্ষ, কে অদক্ষ, কিন্তু যদি শশা (খরগোস), বরা (শূকর) শিকার করার জাল থাকে সেই জালটিরও ভাগ দেওয়া হবে। জালের মালিক যদি না এসে থাকে, তার বাড়ীতে মাংস পৌঁছে দেওয়া হবে। দক্ষ শিকারীও ভাগের ভাগ অর্থাৎ যোগ্যতা অনুসারে কম মাংস পেয়ে থাকে তবুও শিকারের উৎসবে কোন ঘাটতি পড়ে না।

(ঘ) দলগতভাবে মাছ ধরতে গেলে: অনেক সময় মানুষ যৌথভাবে নদী, জোড় (ছোট নদী) পুকুরে মাছ ধরতে যায়। পশু-পাখী শিকারের মত দলের মুড় গুনতি হিসাবে মাছ ভাগ করার নীতি-নিয়ম আছে। জালের ভাগ দেওয়ার রীতি আছে। এই ক্ষেত্রে বাড়তি একটি নিয়ম বলে দেওয়া আছে মাছ খেজা-বাখরা করা হবে। অজ সমান হয়েছে কিনা, কম-বেশী হয়ে থাকলে দলের সবাইকে বলতে বলা হবে। তারপর দলের সঙ্গে দুর্বল, বয়সে ছোট অথবা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে প্রথমে ভাগের অংশ নিজের জন্য নিতে বলা হবে।

(ঙ) নাচ-গীত করতে গেলে: দলগতভাবে কোন অনুষ্ঠানে কোন সাংস্কৃতিক দল নাচ-গীত করতে যায়। অনুষ্ঠান শেষে দলগতভাবে সাম্মানিক এবং পুরষ্কারের পাওনা হবে তা প্রতিটি শিল্পী সমান ভাবে পায়। এই দর্শনে সেই কথায় বলা আছে।

উপরোক্ত অতি সাধারণ ঘটনাবলী কুড়মালি সমাজ দর্শন সাম্যবাদী দর্শন। এই দর্শন সমাজের সকলের জন্য সম ভাবে সুখ, শান্ত, সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করে। এমনকি সমাজের সব চাইতে দুর্বলতার ব্যক্তিটির কথা বেশী মাত্রায় চিন্তা করা হয়েছে।

ভোগ:

কুড়মালি কোন দেবতা বা দেবীর পূজায় গ্রামের পূজারী থাকেন 'লায়া'। তাঁকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য সহকারী হিসাবে নিযুক্ত থাকেন সুসারি ও চাটাদার। দেব/দেবীর পূজায় পূজা স্থলে ফল-মূল, মিষ্টান্ন ও অন্যা্য যা কিছু জমা হয় তার সামান্য অংশই উৎসর্গ করা হয়। পূজারী দেব/দেবীকে উৎসর্গ করার সময় ঐ ফল মিষ্টান্নকে 'ভোগ' বলা হয়ে থাকে। পূজা শেষে বাড়তি ভোগ দর্শক সাধারণকে বিতরণ করার রীতি-নিয়ম আছে। দেব/দেবী অনুসারে ভোগ ভিন্ন ভিন্ন হতেই পারে কিন্তু ভোগ বিতরণের ক্ষেত্রে সবাইকে সমানভাবে চালানোর বিধান দেওয়া আছে। ভোগ বিতরণ দুই ভাবে হয়ে থাকে। কোথায় দর্শক সাধারণকে সারিবদ্ধভাবে বসতে হয়। আবার কোন খানে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে হাত পেতে নিতে হয়। হাত পেতে যারা ভোগ নেয় দ্বিতীয়বার অর্থাৎ একাধিক বার ভোগ নেওয়ার রীতি নেয়। সকল দেওয়া হয়ে গেলে পর যদি অবশিষ্ট থেকে যায় তাহলে পুনরায় বিতরণ কারা যেতে পারে কিন্তু পরিমানে গরমিল কখনো করা চলবে না। ভোগ বিতরণের ক্ষেত্রে কোন অবস্থায় কোন পক্ষপাত হবে না।

ভেজা:

গ্রামের জনসাধারণের কোন কাজের জন্য, নেগে-যোগে, পরব-পালিতে অর্থ-দ্রব্য দিয়ে কার্য সমাধা করা হয়ে থাকে। খরচ-খরচার অর্থ গাঁয়ের সকল পরিবারকে এবং কোন গোষ্ঠীর কাজ হলে সেই গোষ্ঠীর পরিবারকে সমান হারে বহন করতে হয়। এই ব্যায়ভার সমভাবে দেওয়ার যে নীতি-নিয়ম তাকে বলা হয় "ভেজা"। গাঁয়ের মাহাত ও দশ জন সলহা করে ভেজা নির্ধারণ করাই রীতি। এই রায় প্রত্যেকটি পরিবারকে মানতে হয়।

ভেজা সাধারণতঃ দুইভাবে নির্ধারিণ হয়ে থাকে। এক "চুলহাভেজা"। দুই "হাল ভেজা"। পরিবারের সংখ্যা অনুযায়ী যে ভেজা ধরা হয় তাকে বলা হয় "চুলহাভেজা"। একই পরিবারে যদি এক বা একাধিক লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে থাকেন

তাহলে সেই পরিবারের ততগুলি গুনতি অনুসারে ভেজা বা চাঁদা আদায় করার রীতি আছে। এখানে কোন পরিবারের অবস্থা কেমন স্বচ্ছল না অস্বচ্ছল তা ধরার কোনরূপ নিয়ম নেই।

ভোজ:

এক বা একাধিক পরিবারের কোন সামাজিক নেগ যোগ কিম্বা কাজ যোগে গোষ্ঠী কিম্বা গ্রামের সকলে মিলে এক সঙ্গে বসে খাওয়াকে বলা হয় "ভোজ"। সামর্থ্য বা অবস্থা গুনে ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। সমাজের পাঁচ জনকে ডেকে দায়দায়িত্ব দেওয়া হয়। সময় নিয়ে আগাম জানান দিতে হয়। সারাদিনের খাবার বন্দোবস্ত হলে "হাঁড়ি বন্ধ" ভোজের ডাক দিতে হয়। একবেলা বা এক সন্ধ্যার ভোজ হলে সেই মত আগেই জানাতে হয়। চুক্তিমত ভোজের কোন পরিবর্তন করতে হলে গৃহকর্তাকেও ভোজের মালিক পক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়।

ভোজের রান্না হয়ে যাওয়ার পর বাড়ী বাড়ী খেতে আসার ডাক দিতে হয়। খেতে বসার স্থান সংকুলান অনুসারে যত লোক এক সঙ্গে খেতে বসবে সকলকে সমানভাবে খাবার পরিবেশন করা হবে। সবাইকে খাবার দেওয়া হলে পর খেতে শুরু করাই নিয়ম। আবার সকলের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারো উঠে পড়া বারণ। নিয়ম-নীতি বাঁধা থাকার কারণে ভোজ ও কাজ সুশৃঙ্খল, শান্তিপূর্ণ ও সুচারুরূপে সমাধা হয়। খেয়ে-খাইয়ে তৃপ্তি লাভ হয়ে থাকে।

২। কুড়মালি সমাজ দর্শন মানবতাবাদী দর্শন:

কুড়মালি সমাজ দর্শনের মূল কথা, সমাজের জন্যই হড়/মানুষের জন্ম। বারেবারে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রতি পদক্ষেপে স্মরণ করতে নির্দেশ কার হয়েছে হড়ের জনম ব্যক্তি মানুষের জন্য নহে। সমাজের জন্য। ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থ ত্যাগ করে দশ জনের হিতার্থে কাজ করতে বলা হয়েছে। আত্মবিসর্জন দিয়েও পাঁচ জনের কাজ অর্থাৎ করম করতে বলা হয়েছে। অপরের ক্ষতি হবে এমন কাজ কখনোই কোন অবস্থাই করা যাবে না। সৎপথে থেকে সদা সর্বদা অন্যের উপকার করে যেতে হবে। কখনো ঠকানো যাবে না। কাউকে শোষণ করবে চলবে না। একা একা ধন ও অর্থ অধিক মাত্রায় জমানো যাবে না। উপার্জনের অর্থ-সম্পদ শতকরা দশ ভাগ সমাজ উন্নয়নের কাজেই অতি অবশ্যই দিতে হবে। কেউ কখনো অসুবিধায় পড়লে, সাহায্য চাইলে কিম্বা না চাইলেও জানতে পারলে নিজে উদ্যোগী হয়ে সহযোগিতা করতে হবে। এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। লোকের বিপদে-আপদে পালিয়ে না গিয়ে নিজের অসুবিধা বুঝেও যথাসম্ভব সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। দুর্বল, দুঃস্থ, অন্ধ, খঞ্জ, আতুর এদের অবজ্ঞা অবহেলা করা যাবে না। তাদের

সুখে-দুঃখে সহমর্মী হতে হবে। তাদের মনে কোন আঘাত লাগবে এমন আচরণ করা চলবে না। যাতে আনন্দ পায় এমন কথা ও কাজ অবশ্যই করতে হবে।

আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীদের সামাজিক কাজে যথাসম্ভব দায়ভার নিয়ে তাদের দায়ভার হালকা করার মানসে পাশে দাঁড়াতে হবে। সদা সত্যবাদী, সদাময়ী, সাহসী ও অন্যায়ের প্রতিবাদী হয়ে জীবনভর চলতে হবে।,

৩। কুড়মালি সমাজ দর্শন বস্তুবাদী-বাস্তববাদী সমাজ দর্শন:

কুড়মালি সমাজ দর্শনে বস্তুবাদ ও বাস্তববাদী বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে। এই দর্শনে অবাস্তবের কোনরূপ জায়গা নেই। যা কিছু সত্য ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সেইগুলিকেই মান্যতা ও বিশ্বাস করে চলার কথা বলা হয়েছে। নকল, মিথ্যা, অবাস্তব, বিষয় চিন্তা-ভাবনার মধ্যে স্থান দেওয়া অনুচিত ও অন্যায় বলে বলা হয়েছে। লৌকিক বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিতে এবং অলৌকিক বিষয় পরিহার করতে বলা হয়েছে। স্বর্গ, নরক, পাপ, পূণ্য, ভাগ্য, পূর্বজন্ম পরজন্ম এইগুলি অবাস্তব, আজগুবি, অলৌকিক, বিভ্রান্তিকর। বাস্তবে এর কোথাও কোন অস্তিত্ব নেই। বলা আছে, মানুষের মনকে দুর্বল করে দিয়ে ঠকবাজদের ঠকবাজীর জল মাত্র জীবের জন্ম হলেই প্রাকৃতিক নিয়মে তার মরণ অবধারিত। এমন কোন প্রক্রিয়া নেই মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে অর্থাৎ মৃত্যু এড়ানো সম্ভব। বিশ্ব প্রকৃতির এ অমোঘ নিয়ম। স্ত্রী পুরুষের মিলনের ফলে জীবের জন্ম। একা পুরুষ শক্তি এবং স্ত্রী শক্তি কোন সন্তান জন্ম দিতে পারে না। পঞ্চভূতের মিলনে বিশেষ অবস্থা গুনে বিশেষ পরিস্থিতিতে সময় নিয়ে হড় > মানুষেরও জনম বা সৃজন। দেহের কোন একটি ভূত যেমন- ক্ষিতি, অফ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম কোন একটির ঘাটতি বা কমতি হলে দেহ অসুস্থ হয় এবং একেবারে না থাকলে জীবনের অবসান বা মৃত্যু ঘটে থাকে। মৃত্যুর পর পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চ মহাভূতের সঙ্গে মিশে যায়। যেকোন সন্তানের পিতা-মাতা অতি অবশ্যই থাকে বা ছিল। সেই পিতা-মাতারও মা-বাবা অর্থাৎ আজি-আজা ছিল। তাঁদেরও জন্ম যথা নিয়মেই হয়েছে বা হয়েছিল। কেউ আকাশ থেকে পড়ে নাই। কিম্বা অলৌকিক ভাবে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ছেলে বা মেয়ে যে সন্তানেই হয়ে থাক না কেন সে যথাসময়ে নিজ নিজ মায়ের গর্ভ থেকেই জন্মলাভ করেছে। পুরুষের গর্ভধারণ করার মত ক্ষমতা প্রাকৃতিক নিয়মেই নেই। সেইটিই বাস্তব। অন্যভাবে কেউ জন্মাতে পারে না। যদি বা বলা হয়, তা কখনো সত্য নহে। আজগুবি, ভাবতে বলা হয়েছে, এর আড়ালে অন্য উদ্দেশ্য আছে এবং ধান্দাবাজীর যাঁতাকল ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়।

৪। কুড়মালি সমাজ দর্শন যুক্তিবাদী দর্শন:

কুড়মালি সমাজ দর্শন যুক্তিবাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই দর্শনে অযৌক্তিক বিষয়ের কোন জায়গা নেই। এই দর্শন একাধারে যেমন যুক্তিবাদী তেমনি বিজ্ঞানের আধারে প্রতিষ্ঠিত। অবৈজ্ঞানিক বিষয় এখানে আলোচনা করে না। যুক্তি ও তর্ক সাপেক্ষে সব কিছু মানতে বলা হয়েছে। যে বিষয়ের উপর তর্ক ও যুক্তি করা যাবে না তাকে পরিহার করার কথা বলা আছে। কোন জীবকে বাঁচতে হলে তার খাদ্যের প্রয়োজন। খাবার না খেয়ে সে বাঁচতে পারে না। দেহের পুষ্টি সাধন ও বৃদ্ধির জন্য অন্নের প্রয়োজন। আঘাত করলেই প্রত্যাঘাত আছেই। চাষ করলেই ফসল পাওয়া যাবে। ঘরে বসে মনে মনে চিন্তা করলেই শষ্য জন্মাবে না। চাষ করতে হলে জমি চায়, বীজ চায়, শ্রম চায়, জল, সার, দেখভাল করতেই হয়। একটির অভাব হলে ভাল ফসল কখনোই হবে না। পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। পিপাসা পেলে জলপান করলে পর পিপাসা মিটবে। মেঘ থেকেই বৃষ্টি হতে পারে। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে। শীত পড়লেই শীত অনুভব হবে। অনুচিত, অসামাজিক কাজ করলে অনুশোচনা ভোগ করতে হবে। আমি যদি কাউকে মারি আমার মনে সবসময় ভয় জাগরিত থাকবে। সুযোগ ও সময় পেলে সেই ব্যতি আমাকে মারতে পারে। জীবনের তাগিদে যেমন আহার দরকার, তেমনি নিদ্রা ও বিশ্রামেরও প্রয়োজন আছে। জল, আগুন, লৌহা, বাতাস যার যে প্রাকৃতিক গুন সেগুলিই বাস্তব। জল আগুনের কাজ করবে এটা অবাস্তব। বাস্তব বাস্তবেই অন্যভাবে কেউ বলে দিলে তা বিশ্বাস করা ভুল।

বর্তমান ঝাড়খন্ড প্রদেশের ধানবাদ জেলার অদরকুঁড়ি গ্রামের আমার বন্ধুবর তরণীতারণ বানুহড় আমাকে একটা এই বিষয়ের উপর গল্প শুনিয়েছিলেন। এই পরিসরে গল্পটি শোনাবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। কাহিনীটি হাল আমলের গল্পটি সংক্ষেপে বলছি।

কোন এক গাঁয়ে কোন এক বাড়ীতে বছরকিতা পূজা করতে পুরোহিত আসবেন। বাড়ীর কর্তার সঙ্গে কথা হয়ে আছে। হঠাৎ দিনের দিন বাড়ীর মালিককে ধানবাদ কোর্টে মামলা থাকার কারণে যেতেই হবে। উকিলবাবু বলে দিয়েছেন লোক মারফত হবে না। কোর্টে হাজির থাকতেই হবে। কোর্টে যাবার আগে ছেলেকে ভালভাবে বলে গেলেন- পূজারী ঠাকুর পূজা করতে আসবেন তিনি যা যা যেমন যেমন বলবেন ছেলে যেন ঠিক ঠিক সেই কাজ করে।

পূজারীর বয়স বাড়ীর মালিকের চাইতে অনেক কম। বলা চলে ছেলের বয়সী। দুয়ার থেকেই পূজারী হাঁক দিয়ে বললেন- "কই রে হারু! সোব ঠিক ঠিক জোগাড় যন্ত্র করে রেখেছিস তো?" ঘরে ঢুকেই বললেন- "হারাকে দেখছি নাই। কুথাই

গেল?"
—"বাবা ধানবাদ গেছে। কোর্টে মামলার দিন আছে।"
—"কোর্ট যাবেক ত ব'লে যাতে পারত।"
—"বাবাই আমাকে ব'লে গেছে। আমি সোব জোগাড় ক'রে দিব। আপনি বলুন।"
ঠাকুর হম্বি তম্বি করে নানা ফিরিস্তি বলতে লাগলেন। এই জিনিস চাই, ঐ জিনিস চাই। পূজায় বসে কোন জিনিস না দিতে পারলে তার মূল্য ধরে দিতে বললেন। এইটার জন্য এই দান, ঐটার জন্যে ঐ দান দিতে হবেক বলতে লাগলেন। বাবা বলে গেছেন, অগত্যা পুরোহিতের বায়না পুরণ ছেলে করে যেতে লাগল। কিন্তু তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেল। ঠাকুরের ব্যবহার, কথাবার্তা ভাল মনে সে নিতে পারছিল না। হলই বা পূজারী তারই সমবয়সী সে কিনা তার বাবাকে "কই রে হারা!" সম্বোধন করে। আধুনিক যুগের কলেজ পড়ুয়া ছেলে এমন কথা অসহ্য লাগে। পূজা -পাঠ শেষে পুরোহিত কোঠাঘরে ফলহার করতে বসলেন। ঠাকুরকে বসার জন্য ভাল আসন দিয়াহল। কাঁসার রেকাবি থালায় চিড়ে, দই, কলাপাকা দেওয়া হল। জারমনী কাঁসার গ্লাস ভর্ত্তি গরম দুধ দেওয়া হল। ঘরে গুড় চিনি বাড়ন্ত। খাবার থালায় গুড় চিনি দেওয়া হয় নাই। ঠাকুর বলল— "গুড় কই? চিড়া কি দিয়ে খাব? ঘরে নাই ত জগাড় করে আন।"
গাঁয়ে দোকান নাই। এই সময় গুড় চিনি আনা একরকম অসম্ভব কাজ। ঠাকুর হাত গুটিয়ে বসে আছেন। হঠাৎ ছেলে করেছে কি? গুড়-চিনির বদলে ঠাকুরের খাবার থালায় বেশ কিছুটা গোবর এনে রেখে দিল। পুরোহিত রেগে-মেগে বললেন— "ই কিরে! খাবারের থালায় গোবর?
—"ঠাকুর এতক্ষণ যা যা বললেন আমি সোব মা'নে নিয়েছি। সোব বিশ্বাস ক'রেছি, অমত করি নাই। আপনিই ত আমাকে শিখালেন— "বিশ্বাসে মিলয়ে শাস্ত্র। তর্কে বহুদূর। আপনি আমার এই একটা কথা মানুন। গোবরকে গুড় ভেবে চিড়ার সঙ্গে মা'খে খেয়ে নিন। গোবর গুড়ের মতন মিষ্টি এইটা অন্তত বিশ্বাস করুন।" পুরোহিত রাগে তড়াক করে খাবার ছেড়ে উঠে মাঝ্যাঘারে জলের ঘটিতে বজড়াঞ দিয়ে বললেন— "ব্যাটা কুড়মি। আমার সঙ্গে দিল্লাগি। দু পাত প'ড়হে বহুৎ বা'ড় হঁয়েছে। আমি ব'লে যাছি- উচ্ছনে যাবি। স্ববংশে ধ্বংস হবি। টিপা নাশ হবেক। বামহুনকে অপমান। ইয়ার ফল ভোগ করবি।" এই বলে ঠাকুর হন্‌হন্ করে ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন।

৫। কুড়মালি সমাজ দর্শন সমাজবাদী দর্শন:

কুড়মালি সমাজ দর্শন পুরোপুরি সমাজবাদী দর্শন। সমাজ ব্যতিরেকে এই

দর্শন কখনো ব্যক্তিকে বড় করে দেখে না। ব্যক্তির চাইতে সমাজের গুরুত্ব ও স্থান অনেক উচ্চে। এই দর্শনে সদা-সর্বদা এক সঙ্গে মিলেমিশে চলতে ও কাজ করতে বলা হয়েছে। সমাজে যে সকল সামাজিক নীতি-নিয়ম এবং সংস্কার সংস্কৃতি আছে সেই সকল নেগ-নীতি-নেগাচার পালন ও মান্য করার কথা বলা হয়েছে। সমাজের নীতি-নিয়ম সেই কাজকে অসামাজিক কাজ বলা হয়। কুল ত্যাগ করে যাওয়া, আত্মহত্যা করা, অপরকে হত্যা করা, চুরি করা ইত্যাদি কাজকে অসামাজিক বলা হয়। সন্তান বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে সেবা-যত্ন না করে অবজ্ঞা-অবহেলা করা, অন্যান্য গুরুজনদের অশ্রদ্ধা-অপমান করাকে অনেক সময় অসামাজিক কাজ বলা হয়। অবৈধভাবে পরস্ত্রীর সঙ্গে যৌনাচারকে এবং বিবাহের পূর্বে গর্ভে সন্তান ধারণকেউ রীতিমত অসামাজিক কাজ বলে গণ্য করা হয়। অসামাজিক কাজ করলে সামাজিক শাস্তি দেওয়ার বা ভোগ করার কথা এই দর্শনে বলা আছে। অপরাধ বিচার করে পঞ্চজন অর্থদন্ড, এক ঘরে, সমাজচ্যুত শাস্তি দান করে থাকেন। এইরূপেই বিধান আছে। সমাজকে ভাবা হয় ঠিক মায়ের কোলের মত। মায়ের কোলে শিশু যেমন নিরাপদ। তার কাছে এমন সুখকর, আরামপ্রদ চরম আনন্দের ও পরম শান্তির আশ্রম আর কোথাও নেই। কুড়মালি সমাজের মানুষের কাছে সমাজ তেমনিই আশ্রয় স্থল। সুশৃঙ্খল, সততা, উদারতা, শালিনতার সঙ্গে বাঁচা-বাড়া, বংশ রক্ষা, সুখি-সমৃদ্ধি, উন্নতি করা, মান-মর্যাদা, সম্মান-সুখ্যাতি লাভ করা সুযোগ, নিজেকে সংশোধন করার পরামর্শও তার ব্যবস্থা সমাজেই করে দিতে পারে। নিরাপদে সংসার প্রতিপালন করার রক্ষাকবজরূপে সব সময়ের জন্য সুখে-দুঃখে, সম্পদে বিপদে, অসুখে-বিসুখে সমাজ আমার পাশে আছে। এই দর্শন মানুষকে এই কথায় স্মরণ করিয়ে দেয়। পাড়া থানার খইরিবহাল গ্রামের ঝুম্যর কবি উপেন মাহাতর একটি গীতে পাই, তিনি সমাজকে সূর্যের মত বলে বর্ণনা করেছেন।

"সমাজেই জনম দাদা,
সমাজেই মরণ রে।
সমাজ হেকেইক দাদা,
সুরুজ সমান রে।।"

৬। কুড়মালি সমাজ দর্শন নেগাচারি দর্শন:

নেগা অর্থে বাম ও চারি কথার অর্থ সংস্কৃতি। আবার নেগাচারি কথাটি ভাঙলে পাওয়া যায়- নেগ > নীতি-নিয়ম, আচারী > আচরণকারী। নেগ + আচারী- নেগাচারী। অর্থাৎ এই দর্শনের অনুগামী মানুষ নিয়ম নীতি পালনকারী বা রক্ষা করে চলার মানুষ। এই দর্শনে বলা হয়েছে বিশ্বব্রহ্মান্ডের সমুহ গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র যেমন

ডান দিক থেকে বাম দিকে আবর্তন করে চলে তেমনি ভাবে এই সমাজ দর্শনে জনসাধারণকে সেই নীতি-নিয়মে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। সাধারণ কিছু উদাহণ দিলেই বিষয়টি সহজেই বোঝা যাবে। কুড়মি ঝাড় বা বংশের মানুষ কৃষিজীবি। এই সমাজের মানুষ যখন জমি বা ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করেন তখন ডানদিক থেকে বাম দিকে ঘুরে ঘুরে "আঁতল" নিয়ে কাজ সম্পন্ন করেন। আবার দেখা যাবে প্রতিদিন বিহানে যখন ঘরের মা-বোনেরা তুলসী থানের সামনে, আঁখ দুয়ারে এমনকি প্রতিটি দুয়ারে ঘটিতে জল ও হাতে গোবর নিয়ে সূর্যের প্রতিকৃতি এঁকে মাড়ুলি দিয়ে থাকেন এবং মাড়ুলির চারিপাশে হাতে জল নিয়ে, হাত ঘুরিয়ে জলের ছিঁটা দিয়ে সূর্যের আলোর ছটা তৈরী করেন। এই মাড়ুলি দিয়ার সমুহ কাজ সমাধা করেন ডান দিক থেকে বাম দিকে হাত ঘুরিয়ে। করম-জাওয়া-দাঁড় নাচে, ছামড়া তলে বর কনে এবং বুঢ়াবাবার থান মড়পে প্রদক্ষিণের সময় ডান দিক থেকে বাম দিকে ঘোরার কথা এই দর্শনে বলা আছে। অপরদিকে বাম কথার অনেক সময়ই দুর্বল বলে অর্থ করা হয়। ডান হাতের চাইতে বাম হাত দুর্বল। কুড়মালি সমাজ দর্শনে দুর্বলকে সঙ্গে নিয়ে চলার কথা বলা হয়েছে। একটু লক্ষ্য রাখলেই সহজেই বোঝা যাবে কথাটি কত বাস্তব। কৃষকের বলদ জোড়ার মধ্যে একটি সবল অন্যটি খানিক হলেও দুর্বল হবে। ঠিক ডান হাত বাম হাতের মত্। যে যাবে কৃষক সবল ও অধিক তেজী বলদটিকে হাল ও গাড়ীর জোঁয়ালে ডানদিকে এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বলটিকে বাম দিকে জুড়েছেন। বলবেন, কেন এমনটি করা হয়। উত্তরে বলা যায় ডান পাশের বলদটিকে অনেক বেশী মাত্রায় ঘুরে ঘুরে হাল-গাড়ী টানতে হয়। সেই কারণে দুর্বলটিকে সাথে নিয়ে চলার জন্য বাম দিকে জোড়া হয়। বউ ও বরের মধ্যে বউকে দুর্বল ও বরকে সবল ভাবা হয়। সাধারণতঃ স্ত্রীকে স্বামী বামপাশে স্থান দিয়ে বা রেখে চলার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ দুর্বলকে সাথী করে সংসার চালাতে বলা হয়েছে।

সমাজ পরিচালনা:

কুড়মালি সমাজ দর্শনে সমাজ কিভাবে চলবে, কে কিভাবে পরিচালনা করবেন সে কথা পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। সমাজ পরিচালনার জন্য কয়েকটি পদ তৈরী করা হয়েছে। সমাজ প্রশাসনের জন্য এক একটি পদ নির্বাচন করা হবে। কোনরূপ অসুবিধা দেখা দিলে বার বছর অন্তরে পুনরায় নির্বাচন করা হবে।

গ্রাম পরিচালনার জন্য থাকবে গ্রামের প্রধান। তাকে বলা হবে মাহাত বা মড়ল অথবা মাঝি। মাহাত গ্রামের সামাজিক কাজ, বিবাদ-বিশংবাদ, পুজা-পার্বন ও অন্যান্য যাবতীয় সামাজিক কাজ দেখ-ভাল করবেন। তাঁর মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। গ্রামের সাধারণ মানুষ মাহাতকে মান্যমান করবে। তাঁকে যথোচিত সম্মান

জানাবেন।

গ্রামের দেবতা ও দেবীর পুজার ভার দেওয়া হবে, তাঁকে বলা হবে 'লায়া' বা 'দেহরি'। গ্রামে একাধিক দেব/দেবী থাকলে একজনের পক্ষে যদি পূজা চালনা করা সম্ভব না হয় তাহলে একাধিক লায়া থাকবে। গ্রামের পঞ্চ জন তা ঠিক করে নেবেন। লায়াকে সহযোগিতা করার জন্য থাকবে 'সুশারী' ও 'চাটিয়া"। গ্রামের সাধারণের কাজে ডাক-হাঁকের জন্য নিযুক্ত করা হবে "গড়াৎ"। এছাড়াও গো বধ অন্যান্য অপকর্মের দায় থেকে মুক্ত করার জন্য থাকবে "পটলই"। প্রতিটি গ্রামে "পটলই" না থাকলে পাশের গ্রামের থেকে ডেকে নেওয়া যাবে।

গ্রাম প্রধান বা মাহাতর উপরের পদের নাম হবে "চাটাদার"। বর্তমান আমলের অঞ্চল প্রধানের মত। কয়েকটি গ্রামের পরিচালনার ভার দেওয়া হবে চাটাদারকে। পাশাপাসি একাধিক গ্রামের বিষয় নিয়ে যদি কোনরুপ সামাজিক বিবাদ দেখা দেয় তাহলে কো কোন গ্রামের মাঝি-মাহাত ঐ বিবাদের মিমাংসা করার ক্ষমতা থাকবে না। ঐ ক্ষেত্রে যদি বিবাদী উভয় পক্ষকে ডেকে দুই পক্ষের মতামত নিয়ে চাটাদার কেসটির নিষ্পত্তি করবেন।

কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে এখন যেমন ব্লক সভাপতি সেই রকম চাটাদারের উপরে থাকবেন- "পরগনইত"। পরগনার পরিচালক যিনি হবেন তাঁর পদের নামই—"পরগনইত"। তার এলাকার মধ্যেকার কোন সামাজিক কেস তাঁর হাতে পড়লে তিনি তাঁর মিমাংসা করে রায় দান করতে পারবেন।

কয়েকটি পরগনা নিয়ে গঠন করা হয় এক একটি মুলুক। এই মুলুকের যিনি প্রধান তাঁকে বলা হয় 'মুলুকদার'। তাঁর হাতে থাকে মুলুকের সামাজিক দায়-দায়িত্বের ভারাভার। তাঁর হাতে কোন সামাজিক কেস এলে তিনি বিচার করে রায় দান করতে পারেন।

কয়েকটি মুলুক নিয়ে গঠন করা হয় দেশ। দেশের প্রধানের পদের নাম—'দেশমোড়ল"। এখন যেমন ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্ট দেশের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়। প্রধান বিচারপতি শেষ বিচার করতে পারেন। সেইরকম দেশমোড়ল কুড়মালি সমাজের বিচার ধারার সর্ব্বশেষ কথা বলতে পারেন। তাঁর বিচারের রায় খন্ডন বা লঙ্ঘন করা যাবে না।

কুড়মালি সমাজ দর্শন একটি পরিপূর্ণ দর্শন:

যেকোন সমাজ দর্শনের মূল কথা মানুষকে নিয়ে। কুড়মালি সমাজ দর্শনও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এই দর্শনের বিশেষত এই যে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন। ব্যক্তি ও পরিবার নিয়ে সমাজ তৈরী হয়েছে এবং বলা যায় এক একটি পরিবার

সমাজের একক। পরিবার কি ভাবে সুখ, শান্তি, সম্বৃদ্ধি, উন্নতি লাভ করে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ জীবন উপভোগ করতে পারে। পরিবার পরিজন ও আপনজনেদের সাথে মিলে-মিশে আনন্দ সহযোগে সুস্থতার সাথে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করতে পারে। দুঃখ, কষ্ট, রোগ-ব্যাধি, অনটন-অঘটন না ঘটে। শোকের তাপের জ্বালা -যন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়। কোন কাজে বাধা-বিপত্তি না ঘটে, অবজ্ঞা, অবহেলা, অনুতাপ, অনুশোচনা পোহাতে না হয়। নিজে ঠকতে এবং অপরকে ঠকাতে না হয় এবং অঘোরে অকালে অপমৃত্যু যাতে না ঘটে তারই পথ নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে।

আবার একথাও বলা আছে, কোথা হতে ব্যক্তি মানুষের জন্ম? কিসের জন্য জন্ম? জনম বা জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সার্থকতার বা কোথায়? মানব জীবনের দায়িত্ব-কর্ত্তব্যই বা কী? জীবনের আকাঙ্খাই বা কী? মানুষ জবনে কি আশা করে? মৃত্যুকালে কেমন মরণ কামনা করে?

সমাজ দেহ সদৃশ্য। মানব দেহের সঙ্গে এর তুলনা করা যায়। দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন তার প্রকৃতির নির্দেশিত কার্যভার স্ব-স্ব ভাবে সুচারুরূপে নির্বাহ করে চলে। কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক ঠিক কাজ না করলে দেহ অচল হয়ে পড়ে। অঙ্গহানি ঘটে। আবার দেহের মৃত্যু ঘটে থাকে। কোন অঙ্গের কাজকে ছোট বলা যাবে না। মানুষের বা অন্যান্য জীবের দেহকে যেমন মাথা, গলা, বুক, পেট, কোমর, হাত মুল ভাগ করা হয় এবং তার মধ্যে চোখ, কান, কলিজা, নাড়ি-ভুঁড়ি, আঙ্গুল, নখ ইত্যাদি ইত্যাদি ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়ে থাকে কুড়মালি সমাজ দর্শনকেও সমাজের ধর্ম অর্থ, কাম, সংস্কার সংস্কৃতি ইত্যাদি মুল ভাগ দেখানো হয়েছে এবং প্রতিটি ভাগের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম আরও অনেক ভাগ আছে। এই পরিসরে সম্যক আলোচনা করার তেমন সুযোগ নেই। মানুষের জনমনে মরণ, ভিনসরলে নিশিরাত ও আখানলে মকর কেমন নীতি-নিয়মে চললে সমাজ ও সংসার শান্তিশৃঙ্খলাপুর্ণ এবং আনন্দময় হতে পারে সেই কথা ইতিপুর্বেই আমার লেখা "কুড়মালি-নেগ-নীতি-নেগাচার" গ্রন্থে যতদূর সম্ভব আলোচনা করা হয়েছে। এখানে অতি সংক্ষেপে বিষয়গুলির কিছু আলোকপাত করার প্রচেষ্টা করছি।

(ক) ধর্ম: কুড়মালি সমাজ দর্শনে বলা হয়েছে এই সমাজের ধর্মের নাম সত্য তথা সারনা ধরম। অনেকে বর্তমানে বলছেন- সারি। সারি/সারনা যাইহোক ধর্মকে বলা হয়েছে 'ধরম'। এই ধরমে বলা হয়েছে- মহাবিশ্বের পুরুষ শক্তি মহাকাল ও প্রকৃতি শক্তি মহাকাশের মিলনে জীবকুল ও উদ্ভিদকুলের সৃষ্টি। পুরুষ প্রকৃতির মিলনে অদৃশ্য বিশ্বচালিকা শক্তিকে বলা হয় সার বা বঙ্গা। সারি ধরমে বলা হয়েছে- যা সত্য তাই ধর্ম। এই ধরমে আরাধ্য দেব জগৎ পিতা সূর্যকে "মাহারাই" এবং জগৎ মাতা পৃথিবীকে

"জাহির মাঞ্চ" ও অন্যান্য দেবতাকে বলা হয়- "রাই" ও দেবীকে বলা হয় "রইয়া বা সিনি"। এই ধরমে বলা হয়েছে যার কাছ থেকে কোন উপকার পাওয়া যাবে তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। সময় ও সুযোগ অনুসারে কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে। সেই কারণে গাছ, পাথর, নদী, পাহাড়, বন, পশু, পাখি, ফসলকে কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানিয়ে পূজা করতে হবে। পূজার করার রীতি-নীতি ও নিয়ম পদ্ধতি ও বলে দেওয়া হয়েছে। নকল বা মূর্ত্তি পূজা নিষেধ করা হয়েছে। বুঢ়াবাবা শিব তাঁর মূর্ত্তি পূজা না করে তাঁর বাণী স্মরণ ও পালন করে কাজ করতে বলে গেছেন। তিনি বলেছেন সৎ হও, উপার্জনশীল হও, এবং সাহসী হও। তিনি রাই রইয়াদের এবং আপন পূর্ব-পুরুষদের স্মরণ-মনন এবং কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে পূজা আরাধনার বিধান দিয়ে গেছেন।

এই দর্শনে বারো মাসে তেরো পার্বনের মধ্য দিয়ে যেমন আখান, সিঝানঅ, সারহুল, গাঁজন, রহিন, আমাবতী, মনসা, করম, জিতা, ছাতা, জিউহড়, বাঁদনা, টুসু বা মকর পরব-পালির মধ্য দিয়ে সামাজিক সংস্কার-সংস্কৃতি প্রতিপালনের কথা বলা হয়েছে। কিভাবে নীতি-নিয়মের মাধ্যমে এইগুলি পালন করা হবে তা বলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রিপু দমনের মাধ্যমে বিবেকের নির্দেশে কর্ম সম্পাদন ও জীবন অতিবাহিত করাকেই ধর্ম বলা হয়েছে। সমাজ সংসারের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও শান্তি বজায় রাখা, সততা, উদারতা, সাম্য, মৈত্রী, সামাজিকতা, সংযম, বিনয়তা, দুর্বল ও বিপদ গ্রস্থকে সাহায্য ও উপকার করাকে ধর্ম হিসাবে ভাবতে বলা হয়েছে।

বিশেষ শক্তি ও ক্ষমতা অর্জনের বাসনা থাকলে এবং পারলে যোগ সাধনা করতে বলা হয়েছে। যোগ সাধনার তারা সুস্বাস্থ্য ও দিব্যশক্তি অর্জন করা যায়। তারও রীতি পদ্ধতির বিধান এই দর্শনে দেওয়া হয়েছে।

বাবা-মা এবং পূর্বপুরুষ ও জননীরাই পরম গুরু ও গুরুমাতা। বিবাহিত জীবনে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে ধরম সাথী। পূর্বপুরুষদের শিক্ষা-আদর্শ, আদেশ মেনে কর্ম সম্পাদন করা এবং তাঁদের সেবা, পূজা ও সম্মান জানানোই ধর্ম। ধরমপূজা ও পাঁতা পূজায় ব্রতী হয়ে স্নান করে ভিজে কাপড়ে পূজাস্থলে দাঁড়ালেই ধরমের দীক্ষা নেওয়া হয়ে যায়। এই ধরমে আলাদা করে গুরু ধরে দীক্ষা নেওয়ার কোন বিধান নেই।

(খ) অর্থ: জীবনের প্রতি পদক্ষেপে অর্থের প্রয়োজন। অর্থ ব্যতিরেকে জীবন অচল। বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান অতি অবশ্যই দরকার। সাধ-আহ্লাদ পুরন করার জন্যেও চাই অর্থ। রোগের চিকিৎসা, যানবাহন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দরকারেও অর্থ লাগে। মুদ্রা ও দ্রব্যের মাধ্যমকে অর্থ ধরা হয়। এই দর্শনে সৎ পথে শ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জনের কথা বলা হয়েছে। অসৎ উপায়ে লোক ঠকিয়ে, চালাকির

দ্বারা অর্থ উপার্জনকে ঘৃণা করা হয়েছে। ভিক্ষা করাকে হীন কাজ বলা হয়েছে। এই দর্শনের মানুষকে ভিক্ষা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

(গ) কাম: ব্যক্তিগত কোন মানুষের সুখ, লালসা, কামনা, সাধ পুরণের যে বাসনা তাকে বলা হয় কাম। বিশেষ করে দৈহিক কামনা পুরনের জন্য যে যৌন সম্ভোগ তাকেই মূল কাম বলা হয়েছে। পুরুষ ও নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংযতভাবে দেহ মিলনের কথা বলা আছে। অসংযমী হয়ে অবৈধভাবে যৌনাচারকে কঠোরভাবে পরিহার করতে বলা হয়েছে। দৈহিক যৌন মিলন দেহের প্রয়োজন কিন্তু অনাচারী হয়ে যৌনাচার নৈব নৈব চ। বংশ রক্ষার জন্য পুরুষ নারীর দেহ মিলনের একান্ত প্রয়োজন। কিভাবে বংশ রক্ষার জন্য নারী পুরুষ সংযমী হয়ে মিলন করবে এই দর্শনে সেই কথাও বর্ণনা করা আছে। বিধান মত যৌন মিলন করলে চরম তৃপ্তি ও জীবনে শান্তি লাভ করা যায়। স্বাস্থ্যর অবণতি ঘটে না। ব্যতিক্রম হলে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। রোগ ব্যাধির আক্রমন বাড়ে। অবৈধ যৌনচারীকে সামাজিক অপরাধী বলে গণ্য করা হয়। অনেক সময় তাকে সামাজিক শাস্তি ভোগ করতে হয়। মানুষ তাকে ঘৃণা অবজ্ঞা ভরে হীন আচরণকারী বলে গণ্য করে।

(ঘ) সংস্কার-সংস্কৃতি: মানুষের খাওয়া, পরা, কথাবার্ত্তা বলা, দেওয়া-নেওয়া, শিক্ষা, আচরণ, দায়দায়িত্ব, রূপচর্চা, দেহচর্চা, দেখা-শোনা,ভাব-ভাবনা, কাজ-কর্ম, নাচ-গীত করা সমুহ সাংসারিক বিষয়কে নিয়েই তার সংস্কার সংস্কৃতি। কুড়মালি সমাজ দর্শনে প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর রীতি-নীতি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সাধারণভাবে আমরা কিছু সংস্কার মেনে চলি। এর পিছনে বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। যেমন রাত্রিকালে আলো নিভে গেলে কোন খাবার খাওয়া বারণ। রহিন পরবে রহিন ফল খেতে হয়। আমাবতীতে দুধ আম খাওয়া, বাঁউড়ির রাতে ঘুমানো আগে তল হাতে, তল পায়ে সরিষার তেল মাখা ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাসুর, মামশ্বশুরকে ছুলে উভয়কে স্নান করতে হয়। গরুর গায়ে পা ঠেকলে গরুকে প্রণাম করতে হয়। ধান পালইয়ে বেলা ডাল গুঁজে দিতে হয় আরো আরো অনেক কিছু।

আখানে হালপুনহ্যা, সিঝানয় পুঁথি পূজা, চৈত সংক্রান্তিতে কুঁড়হা ফেলা, রহিনে বীচপুনহ্যা, এমনি পাঁচআটি করা, বাঁদনায় হাল-মৈ ধোয়া, জাগর জ্বালা, চোখপুরা, ক্ষেত জাগা, ধানকে সাধ ভাত খাওয়ানো, ঠাকুরান বা ডিনি কুড়মালি সংস্কৃতির এক একটি উদাহরণ। কিভাবে ও কেন করা হয় কুড়মালি সমাজ দর্শনে তার বিবরণ দেওয়া আছে। এ সমাজ দর্শনের মানুষ অতিপ্রাচীন কাল থেকে যুগ যুগ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে আনন্দ উদ্দীপনার সাথে আন্তরিক ভাবে পালন করে চলেছেন।

শিশু জন্মানোর সাথে সাথে সে তার পিতা-মাতা ও তাদের পুর্বপুরুষের গুণাবলী

নিয়ে জন্মগ্রহন করে। প্রাকৃতিক কারণেই যেমন স্বত্ব, রজ ও তম গুণ সে পায়। ঐ একই কারণে শিশু তার দশ ইন্দ্রিয়, ষড়রিপু লাভ করে থাকে। মন, বুদ্ধি, অহংকার, বিবেক, চিন্তা, চেতনা, ইচ্ছাশক্তি, স্মৃতিশক্তি অর্জন করে থাকে। ফলে শিশু দেহমনে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জ্বালা, যন্ত্রণা, ভয়, ভালোবাসা ইত্যাদি অনুভব করে থাকে। মানুষের জনমের প র থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তার জীবন। এই সময় কালের মধ্যে দেহে আসে বাল্য, কৈশোর, যৌবন, পৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থা। প্রতি অবস্থায় মানুষের প্রাকৃতিক গুনে দেহের ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির পরিবর্তন ঘটে থাকে। মানুষ যদি বিবেক ও চেতনার দ্বারা তার দেহ মনকে পরিচালনা করে থাকে, ইচ্ছাশক্তিকে বিবেক নিয়ন্ত্রণে রাখে, তাহলে তার অনুতাপ-অনুশোচনা, দুখ কষ্ট ভোগ করতে হয় না। কুড়মালি সংস্কার সংস্কৃতির মূল গুঢ় রহস্যই হল সদা সেই চেতনা-বিবেক শক্তিকে শক্তিশালী ও সদা জাগরুক করে রাখা। ভুরসির আগুনকে জাগিয়ে রাখার জন্য যেমন কাঠ-কুচা, ভুঁসা বা তুসের দরকার হয়, তেমনি বিবেককে জাগিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন সংস্কার সংস্কৃতির। ব্যক্তি মানুষে সৎ কর্ম, সৎ সঙ্গ, সৎ শিক্ষা মানুষকে সংস্কৃতিবান করে তোলে।

কুড়মালি দর্শনে বলা হয়েছে, সমাজের কারণে সমাজের দরকারে মানুষের জনম। সৎ শিক্ষার দ্বারা সৎ চরিত্র গঠন করে, সংযম ও যোগ সাধনার মধ্য দিয়ে যথাসাধ্য কর্মসাধনা করে নিজেকে সমাজের একজন মর্যাদা সম্পন্ন অপরের অণুকরণযোগ্য ব্যাক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করায় হবে জীবনের লক্ষ্য। পরিবার পরিজন নিয়ে মান মর্যাদার সঙ্গে দীর্ঘ সুস্থ জীবন উপভোগ করাই হবে কামনা। আপন ধর্ম সংস্কৃতি বজায় রেখে, উপযুক্ত বংশধর অর্থাৎ চরিত্রবান, গুণবান, সমাজের একজন মানুষের মত মানুষ হওয়ার মত ক্ষমতাবান সন্তান সমাজকে দিয়ে বৃদ্ধ বয়সে সাধারণ মানুষের হয়ে আনন্দময় পরিবার পরিজনকে রেখে সুখকর মৃত্যু কামনা করবে। সেইটিই হবে জীবনের স্বার্থকতা।

দেখা যায়, কুড়মালি সমাজের কুমারী মেয়েরা ভাদ্র মাসের পার্শ্ব একাদশী ও করম ব্রত অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠার সাথে পালন করে থাকে। ব্রত পালনে অনেক কৃচ্ছ্র সাধনা করতে হয়। ব্রতের লক্ষ্য প্রকৃত মা হওয়ার সাধনা। পরবর্তীকালে উপযুক্ত সময়ে সে যেমন এমন সন্তান লাভ করে যে সন্তান সমাজের দশজনের জন্য কাজ করতে পারে। সমাজের পাঁচ জনের একজন হয়ে জনপ্রিয় হতে পারে। জাওয়ার মা করমতি অর্থাৎ করম ব্রতের মেয়েরা তাদের প্রতিকী সন্তান কাঁকৈড় ফলকে করম পূজাস্থলে বা ডাল তলে রেখে দেয়। আবার ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীতে জিতা পূজায় সন্তানবতী মায়েরা জিতা ব্রত পালন করেন। ব্রতের লক্ষ্য সন্তানের মঙ্গল কামনা।

কুড়মালি সমাজের আদি মাতার (বুঢ়া বাবার স্ত্রী) ষোলটি গুনের অধিকারিণী যেমন- দয়া, মায়া, সহনশীলতা, সংযম, সৎ কর্ম, সৎ চিন্তা ইত্যাদি। জিতা মায়ের ব্রতিনী মায়েরা জিতা মায়ের কাছে তাঁর গুণাবলীর শক্তি প্রার্থনা করেন যাতে করে তিনি তাঁর সন্তানকে বা সন্তানদের সমাজের উপযুক্ত গুণ সম্পন্ন করে তুলতে পারেন। কুড়মালি সমাজের জিতা প্রায় প্রতিটি পরিবারের মায়েরা করে থাকেন। করম ব্রত ও প্রতিটি কুমারী কন্য করে থাকেন এবং সকলেরই আন্তরিক কামনা প্রার্থনা থাকে তার সন্তান যেন তার সমাজের একজন গণ্য, আদর্শ মানুষ হতে পারে। কুড়মালি সমাজ দর্শনে এইগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালনের বিধান বা নিয়মনীতি ও বলে দেওয়া হয়েছে।

উপসংহার:-

উপসংহারে বলা যায়, ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে ও কালে কালে বহু সমাজ দর্শনের মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাদের কুটকৌশল, ক্ষমতা ও চালাকি, বুদ্ধি বানে ভারতবর্ষের রাজত্ব ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করে শাসক হয়ে বসেছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতা। সেই ক্ষমতা বলে কুড়মালি দর্শনের মানুষের উপরও আঘাত হেনেছে। দর্শনকে হেয় ও দুর্বল থেকে দুর্বল এমনকি মুছে ফেলে দিতেও চেয়েছে। আবার বিশ্বায়নের ঠেলায় পড়ে এই সংস্কৃতির মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে নিজের সমাজ, সংস্কৃতি ও দর্শনের উপর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভালবাসা হারিয়ে ফেলেছে। যে পূর্ণাঙ্গ সমাজ দর্শন বিশ্বের মানুষের কাছে অণুকরণযোগ্য হওয়ার কথা, সেই সমাজ আপনজনেরাই যদি আপন সমাজ দর্শনের প্রতি ভালোবাসা হারায় বিশেষ করে যুব সমাজের, যার ভবিষ্যতের সমাজের কর্ণধার হবে, তারাই যদি বেশী বেশী দিশাহারা হয়ে দর্শনকে না মানতে চায়, তাহলে ভবিতব্য কি? সময়ে যত্নবান না হলে পস্তাতে হবে। এই আর কি! মনে রাখতে হবে সেবাদাসদের কেউ মর্যাদা দেয় না। সহজ লাভে আশায়, লোভে পড়ে সামনে পিছনে না তাকিয়ে দৌঁড়ালে নাক কান খুইয়ে ঘটি বাটি হারিয়ে লেজে গোবরে হয়ে ন ছুতঅ, ন ভূতম হওয়া ছাড়া ভিন্ন গতি দেখছি না। আর না, বেসুরো অনেক গীত গাইলাম। একটা গীতের কলি শুনিয়ে নিবন্ধটি ইতি টানছি।

জাগাউয়েনঅ মাঞ গেধি সামাইঁ
হঁস দিশা দে হামরাকে গো।
ভাখিক বাখানে, চারিক গুমানে,
ফুলে ফরে ঝবরাঞে তকে গো।।

(নগেন পুনুড়িয়ার)

*** তত্ত্ব ও তথ্য সাহায্য নিয়েছি:**

১) সারি ধরমের দার্শনিক তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (প্রবন্ধ)- চারিয়ান মাহাত

*** সাহায্য সহযোগিতা করেছেন:**

১। নগেন পুনুড়িআর (টিমাংদা, কোটশিলা, পুরুলিয়া)

২। মথুর মাহাত (সারম্ব, ঝালদা, পুরুলিয়া)

৩। রবীন্দ্রনাথ মাহাত (পাকবিড়রা, পুঞ্চা, পুরুলিয়া)

৪। ভূবন চন্দ্র মাহাত (বালিগাড়া, পুরুলিয়া)

৫। তপন মাহাত (দাঁদুড়ি, হুড়া, পুরুলিয়া)

৬। মলিন্দ রাজোয়াড় (জামবাদ, কেন্দা, পুরুলিয়া)

৭। দুলাল পরামানিক (জামবাদ, কেন্দা, পুরুলিয়া)

৮। কর্মবীর মাহাত (জামবাদ, কেন্দা, পুরুলিয়া)

৯। জহরলাল মাহাত (বেগুনকোদর, কোটশিলা, পুরুলিয়া)

TUSU:

The Manifestation of the Supreme Power of Creation.

Dr. Binapani Mahato

TusuParab is the longest festival of the Greater Jharkhand Region which comprises Mayurbhanj, Kendujhar and Sundargarh districts of Odisha; Jharkhand and Purulia, Medinipur and Bankuda districts of West Bengal.There is not a single festival in India which is observed for such a long duration. It is exceptionally unique to this region only.

Commencing from the *Agahan-Sankrâit* in the middle of December *Tusu*worship concludes on the *MakarSankrâit* on the fourteenth of January. The nomenclature of the festival as '*TusuParab*' came into being because the minor girlsof this regiondo '*Tusu*' worshipduring this period.Tusu worship is exclusively the domain of girls. Women can join them in singing only and not in the worship. Theyare even not supposed to touch the worship arena. However, theycan guide the girls whenever it is necessary. The girls are called '*Karmaiti*' as they are doing their '*Karma*' of *Tusu* worship.

The soul of *Tusu* festival is its songs. The songs revolve around *Tusu* whom the girls worship during the festival. For that these songs are called *Tusu* songs. After the installation of *Tusu*in the earthen saucer with calfdung balls, New Paddy, rice balls etc, the girls offer Prasad and sing to invoke *Tusu.* The songs are extempore creations of the girls and the women who join them only in singing. In these songs *Tusu* is seen as a minor

girl, playmate and married daughterand also in the form of the goddess of wealth: *Dini*. The description given below will through light on this.

Tusu as a Girl Child:

There are two categories of songs known as *'TusuDhulâ'* and *'TusuUthâ'* songs. In these songs *Tusu*is potrayed as a girl child. *'TusuDhulâ'*songs are lullaby songs in which she is found just like a little girl for whom the mother sings soothing songs to make her sleep. It is to be noted that, since the installation of *Tusu* the girls turn to be the mother of *Tusu*. So it is natural for them to sing lullaby songs for *Tusu*. They sing these songs before they go to sleep after evening worship. Here is an example of *TusuDhulâ*song:

Tusudhuladhula Go! Tusudhuladhula Go!
ÂgejâyMâHâtiGhodâ, PâchhuJâyMâJhâri,
JhârirChalaneMorâChaliteNâPâri.
Tusudhuladhula Go! Tusudhuladhula Go!

(Census-1961, District Census Hand Book, Purulia II:
'TUSU- A Folk Festival'; Dr.TusharChottopadhyay.)

.In the same manner they sing *TusuUthâ*songs to wake up*Tusu* in the morning just as a mother coaxes to wake up her daughter. The girls sing these songs after they get up in the morning.

UthaUthaTusu! Kata NidrâJâchha Go,
KhelibârSangatiSabâyDhulâteLatây Go.
(Curtsy: Mrs. DebakiMohanta, Kendujhar, Odisha)

Songs depicting *Tusu* as a Playmate:

Children love to play with their friends. In her childhood *Tusu* also plays with her friends. This has been described in the following song:

KhelBhanga Law Sangatirâin, MâinHâmorDâkeisâhi,
KhelekGutiGhurâiDehan, MâinHâmorKândeisâhi.

(GiteRegeGahaGaha, Jharkhand KudmaliBhashaBikash Pariṣhad,Chakradharpur.)

Tusu as a grown up girl:

In the meantime,*Tusu* has grown up. So, *Tusu's* mother (the girlworshiping *Tusu*) is thinking of her daughter'smarriage. She plans to engage drummers to make it a grand celebration.

NâlâiNâlâiJalChhâdyenchhi, TâiDharenchheKadamâ,
ÂmârTusurBihâDiba, Jaga-JhamperBâjnâ.

(TusuBrata O GitiSamikhya; Page-147)

Tusu as a married daughter:

In many songs*Tusu* has been portrayed as a married daughter in different stages of her married life. The following songs project *Tusu* as a married daughter in which *Tusu's* mother says:

1.*Ây Re Mairâ,Dhar Re Jhânjrâ, Dey Re GuderPâgDhare,*
TusuJâbenS̃asurBâḍi, Dey Re HândâyJatkare.
(TusuBrataO GitiSamikhya; Page-143)

2. *YiGharKâḍâ U GharKada, LohârPâtâBasâbo,*
HâmârTusurBetâ Hole,HâjârTâkâUdâbo.

3. *Jaljal je karaTuṣuJaletumârkeâchhe?*
Manetebhâbiyendekhȯ, JaleShasurgharâchhe,

Tusu as the Devine Entity:

Apart from*Tusu's* mundane form as described in the above songs, her Devine form has also been captured in some songs. In the songs mentioned below *Tusu* has been described as the goddess of wealth: *Dini.*

1.*SânjhDilâmSanjhâDilâm, DilâmSarageBâti Go,*
JataDeotâSanjhâ Leo,<u>MâDiniThâkurâni Go</u>.

(TusuBrata O GitiSamikhya, Page-113)

2.*MalinKeneMukhShashi, O TusuDhanKahâKathâ,*
Ki HayechheManerBedan,Bala Ki ManerBethâ.

MakarÂsechheTomâyNite, TomâyChhedeJâiKothâ?
Âwandi, Châwndi, Bâwndi Tin Din ÂgeDharechheÂmâr Mâthâ.

ÂrBachharEmni Dine,DekhâDiyoDâsire,
Tumi Go MahâsatiDiniMâin! Puji Go Tomare
Dhan, Dhân, Dhiâ, Putâ, BajâyRekhemoriJenoSangsâre.
(TusuBrata O GitiSamikhya)
In support of this, a popular saying of the region is given below inwhich*Tusu*
has been portrayedas *Dini.*

. *KheteDhâni, KharaiyeDini, PâlaiyeDimini.*
JeinDiniOinTusumoni.

Symbolic representation of Tusu:

The ingredients of*Tusu*installation,the vital aspect of *Tusu* worship highlight the symbolicrepresentation of *Tusu*. The ingredients include *Rahin* soil, new paddy (*Dhân*), new paddy husks (*Tush*),rice flourballs (*ChuniDhulâ),* calfdung balls (*GobarDhulâ*),piece of jute kept on the balls, turmeric pieces, kohl, mustard seeds which are kept in an earthen saucer outside of which is painted with the solution of rice powder and a pitcher of water (*Ghat*).

If one delves deep into the matter he will find that all the ingredients used in the installation of the *Tusu*are symbolically intertwined with the concept of fertility. *Rohin* soil represents land, the base of bowing the seeds. Paddy seeds suggest the dormant life within it which will sprout and come to life the moment it gets proper environment. The seeds are so powerful that only one seed (*Paddy*) is capable of producing enormous grains. Paddy husks are kept with a belief that no paddy flower will remain without grain (to check the flowers to become *Agâdi).*Water in the pitcher symbolizes life. Water is essential for the seeds to sprout and grow and for the

survival of the living creatures. The calfdungas manure is indicative of boosting the fertility power of the plants to bear more and healthy fruits and grains. In short, all these ingredients are the symbolic representation of the power of fertility related to agriculture.

On the other hand rice and cowdung balls, kohl, turmeric pieces, mustard seeds, jute piece are also used in marriage.Marriage is that social institution through which a man and a woman get social sanction for the creation of new life (offspring). In marriage rice balls and cowdung balls are used for blessing the bride and bridegroom (*Chumân)*. Turmeric pieces, jute thread are used in the *LaganBandhâ* ritual. Kohl and mustard seeds are used for the *parchhan* ritual of the new couple to drive away theevil eyes and to protect them from the evil spirits. The third song portraying *Tusu*as a married daughter above also it is mentioned that *Tusu* is going to her in-laws house to be united with her husband for the creation.

The earthen saucer in whichthese ingredients are kept represents the womb, where the creation of new life takes place. For this reason *KhâprâPithâ*is prohibited to eat from *AgahanSânkrait* to *Push Sânkrâit* as *Tusu* is resting in the saucer during this period. *Khaprâpithâ* is one kind of rice cakewhich is prepared in this earthen saucer called *'Sarâ'*and its dome like lid called *'Sâruâ'*. Besides, the involvement of minor girls in the *Tusu* worship made mandatory by the ancestors is also pointing to the same. All these are indicative of fertility: the supreme creative power of the nature.

In reality, *Tusu* is none other than that supreme power of creativity through which a seed sprouts, becomes sapling, grows into plant, bears flowers and fruits and again becomes dormant in the form of seed for the new creation. Like the seeds, the minor girls will beget children when they get

married. The seeds and the girls are the two faces of the same coin.

That is why girls worship this supreme power of creation in the form of *Tusu*.

Idol worship of Tusu:It will not be out of place to say few words about the Idol worship of *Tusu*.Recently Idol worship of *Tusu*is seen in some places. This is based on the story of the princess *Tusu*whoplunged into the river to save her from the Muslim ruler. There are different stories in which *Tusu*is portrayed as the daughter of the king Birbal of BulandSahar in one story, as the daughter of *Kudmi*king of Kashipur in another story and as the daughter of *Kudmi*chieftain of *Charkudih* in yet another story and so on. It is not possible for *Tusu* to be the daughter of different parents at a time. Again the day of sacrifice remaining the same (*Makar*festivalday), different rivers such as River *Damodar*, River *Subarnarekha* and River *Kansabati* are mentioned as the sacrifice places in these stories. It is also not possible for *Tusu* to plunge into different rivers on the same day. More over these stories focus on the one day*Tusu* festival to commemorate the day of *Tusu*'s sacrifice and remain silent about the one month long *Tusu*worship which starts on the *AgahanSankrâint* in December, continues throughout the *Pus* month and ends on the *Makar*festival day on the last day of *Pus*. The stories are silent about the ingredients of *Tusu* installation.

Numerous *Tusu*songs are in vogue throughout the region and none of the songs has depicted *Tusu*as the princess and her sacrifice. There is no sign of mourning in memory of the sacrifice of the princess rather *Makar* is celebrated with pomp and gusto spreading message of happiness and enjoyment all over.

In the Government records and other books on *Tusu* worship, mention of earthen saucer with the natural ingredients is

available and not the Idol worhip. Let us have a glimpse of some documents.

1. Bengal District Gezetteers -Manbhum - 1911edited by H.Coupland:

In the Manbhum District Gezetteer-1911, it has been recorded that "In PaustheTusuParab is observed by unmarried girls throughout the month. Small cow dung balls are prepared and stored in an earthen pot, which is painted outside with a solution of pounded rice. Paddy is sprinkled over the balls, and *pujas* offered to the goddess of wealth with flowers of mustard and radish every morning before anything eaten. Hymns are also sung invoking the goddess and calling on her to provide wealth and good husbands........."

2. CENSUS-1961, District Census Hand Book of Purulia II

   In this Hand Book an article-'TUSU-A FOLK FESTIVAL' written by Dr. TusharChottopadhyay was published. In his article, Dr. TusharChottopadhyay mentioned that Tusu is worshipped widely with the symbol of a concave earthen plate in which new paddy, husk of new paddy, balls made of cowdung, paddy strewn on hemps of cowdung, grass, mustard and radish flower, cowrie etc. are placed. He also did not mention about *Tusu* Idol worship or Tusu as a princess. The same thing is mentioned again in the CENSUS-2011, District Census Hand Book of Purulia.

3. Journal of Bihar and Orissa Research Society-March, 1939.

In his article "Aryan Attitude to Female Deities"published in the above journal Shri Man GobindaBanergy has written about Tusu worship in the earthen plate with the same ingredients.

4. ShriDibyojyotiMajumdar in his book "Tusu: Itihase O Sangite, 1958 has also mentioned about the use of the

earthen platewith cowdung balls etc.in *Tusu* worship and not Tusu Idol.

TusuHâmrâThâpanKariha, ÂghanSânkrâit Dine Gaw,

We are installing Tusu on the last day of the month Agahan (Mid december)

AbalâBâchhurekGobar Lagan ChâurekGundiGaw.

With the calf dung and the rice of unboiled paddy

LautanPetilâinRâkhihaHâmrâChuniDhulâ, GobarDhulâGaw,

We are keeping rice and calf dung balls in the new earthen Saucer,

TâkarUparDini Main Gaw, GendâPhuleHâlâHâlâGaw

On which we are keeping Goddess of wealth: Dini and offer Marigold flowers

LihâLihâTusuNânâBaranekphulaGaw,

O Tusu! We are offering you flowers of various colour.

Tirish Din Je DebaMaaGaw, SâraiBânduPhulaGaw.

We will present you Bandu flowers for the thirty days

BihânSanjhedebaHâmrâDhup, DhunâBâtiGaw,

Every day we will light the earthen lamp, offer fragrant smoke in

honour of you in the morning and in the evening.

SangiSabheGeetGâikeTahar Mon BhulâbaGaw.

We, all the friends will sing songs for your entertain.nment

Chala Law SangatiSabheTusuGeeteRijhâwab

Dear friends! Let us sing songs to please Her,

TusuMâinyekÂdarPâikeSansâreGharBasâwab .

With Her Blessings only we will be happy in our family life.

কুড়মালি সংস্কৃতিতে লোকায়ত শিক্ষাধারা

সঞ্জীব মাহাত

'লোকায়ত' শিক্ষাধারা বলতে বোঝায় যে লোকজীবনের সঙ্গে সংযুক্ত ঘটনাবলীর আবেগের বহিঃপ্রকাশ ও ভাব বিনিময়ের উপাদানসমুহ সুদীর্ঘকাল থেকে বংশপরম্পরা বা প্রজন্নগত ভাবে লোকমুখে ভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়ে চলেছে। কুড়মালি সংস্কৃতিতে লোকায়ত শিক্ষাধারা বলতে কুড়মি জাতিসত্ত্বার সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান প্রভৃতি লোকগীতি, লোকছড়া (লাহনা), লোককথা,লোকনাট্য (ছেইব) প্রভৃতির মাধ্যমে কুড়মি সহ অপরাপর খেরওয়াল ও হিতমিতান গোষ্ঠীর জীবনধারার আচরণের পরিবর্তন, বুদ্ধির প্রসারণ মানসিকতার ব্যাপ্তি ও সমাজ জীবনের অঙ্গনে কুড়মালি সংস্কৃতি প্রথাবিধি মুক্ত ভাবে প্রয়োগ ভারত তথা পৃথিবীর ইতিহাসে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। কুড়মালি সংস্কৃতির কথা বলতে গেলে কৃষিকেন্দ্রীক জীবন ও সংস্কৃতির কথা বলতে হবে কারণ কুড়মি কৃষি সভ্যতার সূচনা লগ্নের থেকে সংস্কৃতির মাধ্যমে লোকায়ত শিক্ষার ধারার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। রহিন, জাঁতাড়, করম, জিতিআ, সহরাই (বাঁদনা), ডিনিমাঞ আনা, টুসু প্রভৃতি অনুষ্ঠানমূলক কুড়মালি সংস্কৃতি কৃষিকেন্দ্রীক সভ্যতার পরিচয় বহন করে ও সেই সঙ্গে ভারতীয় কৃষির সূচনার বয়স, সভ্যতার পত্তনের অধিকার কারা ও কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে তাদের অবদান কতখানি তা সংস্কৃতির উপাদানসমূহ (নৃত্য ও গীত)ও কুড়মালি ভাষায় ভাবের ব্যঞ্জনা থেকে সহজেই অনুমেয়। ইজ্রায়েলের বারলান বিশ্ববিদ্যালয়, হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়, টেলি এভিড বিশ্ববিদ্যালয় ও আমেরিকার হাবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা যথাক্রমে ইয়েল মেলামেড, এহুড ওয়েস, ডেনিয়েল নাডাল, আইরিশ গ্রোমান ইয়ারোলাভস্কি ও অফার বার ইউসেফ তাদের থিসিস—"The Origin of Cultivation and proto-weeds, Long Be-

fore Neo-Lithic Farming."(2015) এ দেখান যে ১২,০০০ বছর আগে কৃষির সূচনা হয়েছিল। তারা ইজ্রায়েলের গ্যালিলি সমুদ্র তটভূমির উপর ওহেলো দ্বিতীয় নামে ২৩,০০০ বছরের প্রাচীন মানুষের আদিম আগাছার চাষবাসের উপর গবেষণা করেন। ১,৫০,০০০ উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষানিরীক্ষা চালান ও গম, বার্লিসহ ১৪০ প্রজাতির উদ্ভিদের মাধ্যমে খাদ্যপ্রস্তুতির সন্নিবেশ ঘটান। পরীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তে তারা উপনীত হয় যে, ১১,০০০ বছর আগে খাদ্যশস্য জাতীয় দানা থেকে কৃষির সূচনা। ২০০০ সালে Archacological Survey of India (ASI) খড়্গপুর আই.আই.টি-এর ভূ-পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. অনিন্দ্য সরকার পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞান বিষয়ক "Nature Journal' এ "Cradles of Civilization"-এ বলেছেন, কৃষিকেন্দ্রীক সভ্যতার জন্ম ৮,৫০০ বছর আগে। আবার কৃষির সূচনা সম্পর্কে শ্রী শ্রী আনন্দ মূর্তিজী (আনন্দ মার্গ সংঘের প্রবক্তা) তাঁর "পথ চলতে ইতিকথা (দ্বিতীয় খন্ড) বইতে বলেছেন- কৃষিসভ্যতা ও সংস্কৃতির সূচনা ৭, ৫০০-৮,০০০ বছর আগে। সে যাই হোক না কেন, লোকায়ত শিক্ষার ধারা সূচনা যে অতি প্রাচীন ও সেটি কৃষিকেন্দ্রীক সংস্কৃতি ও জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত তা অবশ্যই প্রমানসাপেক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য। আদিবাসী টৌটেমিক কুড়মি জাতির জিনতত্ত্ব সুচারুভাবে বিশ্লেষণ করলে প্রমানিত হবে যে তারা আদিম অধিবাসী ও কৃষিকেন্দ্রীক সংস্কৃতির জন্মদাতা।

কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষাধারার বৈশিষ্ট্য:

কুড়মালি সংস্কৃতি অতি প্রাচীন সংস্কৃতি। সুতরাং তৃণমূল স্তর থেকে ধাপে ধাপে সভ্যতা গঠনে এই সংস্কৃতি ও কুড়মালি ভাষার অবদান অনস্বীকার্য। যাই হোক, কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারার বৈশিষ্ট্যবলী নিম্নরূপ:

* কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষা অতি প্রাচীন।

১) কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষা বিধিমুক্ত (Non-Formal)।

২) বয়সের বাধ্যবাধকতা থাকে না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে এই সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষায় পারদর্শী।

৩) কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষার বাঁধা ধরা পদ্ধতি নেই কিন্তু 'Dictation Method' (গিত ও বাজনার রেগ), 'Discussion Method' (সৃষ্টিতত্ত্বকথা, মাহরাই, করমকথা), Question Answer Method' (অহিরা গিত, চাঁচর গিত, বিহা গিত,

জাউআ গিত), 'Story Telling Method (লোকপুরাণ, পাহরা, রাইতকহনি) বেশী ব্যবহৃত হয়।

৪) কুড়মালি সংস্কৃতি লোকায়ত শিক্ষার শৃঙ্খলা নমনীয়।

৫) কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষার জন্য আর্থিক ব্যয় কম।

৬) এই ধরণের লোকায়ত শিক্ষার জন্য আখড়া, কুলহির পিড়হা প্রভৃতি জায়গায় আয়োজিত হতে পারে।

৭) অভিজ্ঞ ও বয়স্ক ব্যক্তির দ্বারা কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষা পরিচালিত হয়।

৮) কুড়মালি সংস্কৃতির লোকয়ত শিক্ষায় সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) প্রভাব বিদ্যমান।

৯) কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষায় জৈব কারণ (Biological Factors), কৃষ্টিগত কারণ (Social Factors), সামাজিক কারণ (Social Factor), প্রাকৃতিক কারণ (Physical Factor) ও প্রযুক্তিগত কারণ (Technological Factor) ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১০) কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষার মাধ্যমে শারীরিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ, বৌদ্ধিক বিকাশ, নৈতিক বিকাশ, প্রাক্ষোভিক বিকাশ, ধর্মীয় বিকাশ ও সর্বোপরি নান্দনিক বিকাশ ঘটে।

১১) কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মূল্যবোধ জাগ্রত হয়।

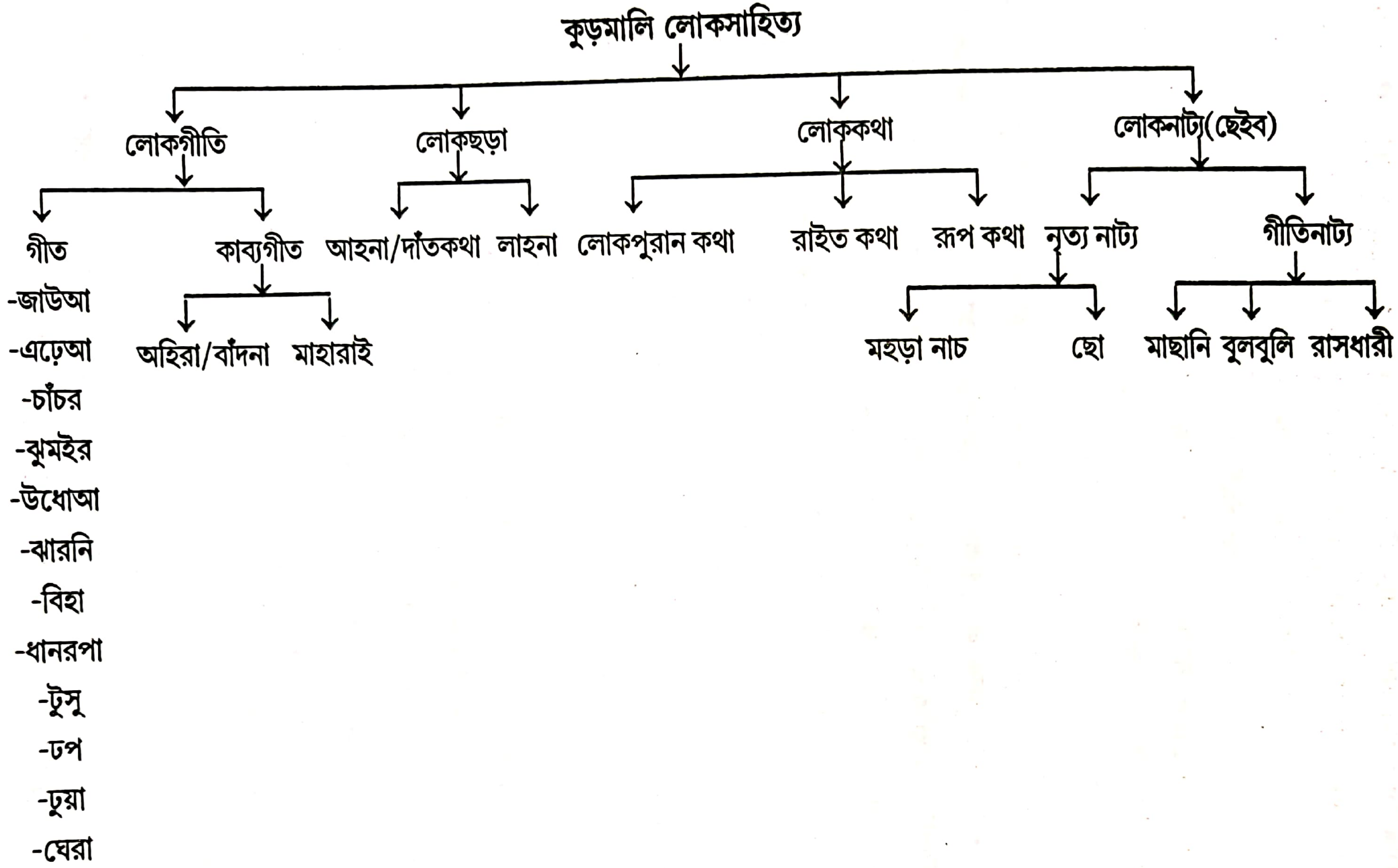
কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষার সময়কাল:

'Folklore' শব্দটি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের উইলিয়াম থমস সংগঠিত করেন। তিনি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২ শে আগষ্ট 'The Athenacum' নামে প্রকাশিত করেন যদিও জার্মনীর ব্রাদার্স গ্রিম ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে 'Kinder-und Hausmarchen' নামে আর্টিকেল প্রকাশ করেন। স্কেনডিনেভিয়ার বাসিন্দারা 'Folkeminde' (Danish) ও 'Folkermimne (Norwegian) নামক লোককথা থেকে তাদের টিউটোনিক গোষ্ঠীর উৎসের ধারা জানতে পারে। পরবর্তীকালে থমাস ক্রপ্টনক্রুকার তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড থেকে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে 'Keen' নামে ধারা প্রকাশিত করেন। জন ফেনিং ওয়াটশন 'Annals of Philodclphia' নামে আমেরিকা থেকে প্রকাশ করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে

'Folklore Society' গড়ে উঠে। ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে UNESCO "Recommendation on the Safegurding of Traditional Culture and Folklore' নামে বিশ্বব্যাপী পঠনের স্বীকৃতি দান করে। ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দে UNESCO পুনরায় 'Conention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage' নামে প্রকাশ করে। সে যাই হোক, কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষার ধারার সূত্রপাত মূলত কৃষিসভ্যতার সূচনার সময় থেকে বলা যায় কারণ টোটেমিক কুড়মি জাতি মূলত কৃষিজীবি। 'সৃষ্টিতত্ত্বকথা', 'ধরম কথা', 'করম কথা', 'টুসু কথা' প্রভৃতির প্রচলন ও ধারা অতি প্রাচীন। কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষার উপাদানকে কাল ও ঘটনা অনুযায়ী সাজালে 'লোকগীত', 'লোকছড়া'(আহনা ও লাহনা), 'লোককথা', 'লোকনাট্য' প্রভৃতি রূপে বিন্যস্ত হতে পারে। লোকভাবনা ও বিধিমুক্ত লোকায়ত শিক্ষার ধারা জনজীবনকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখতে ও জীবন জীবিকার কর্মের সঙ্গে ছন্দবদ্ধতা বজায় রাখতে উৎপত্তি হয়েছে। কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষার মধ্যে কুড়মালি ভাষা, কুড়মালি সংস্কৃতি ও ধর্ম স্থান পেয়েছে। একজন মানুষের রুচি, চিন্তাধারা, আচরণ, ব্যক্তিত্ব, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রকাশের মাধ্যমের উপাদান সুনিপুন ভাষা, সুচারু সংস্কৃতি ও আধুনিক কুসংস্কারমুক্ত মানবতাবোধমূলক ধর্মের বহিঃপ্রকাশ।

কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষার শ্রেণীবিভাগ:

কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষার আধার লোকগীত, লোকছড়া, লোককথা ও লোকনাট্য। এইসময় বিধিমুক্ত শিক্ষার উপাদানগুলি যে এক সময়ে উৎপত্তি হয়েছে তা বলা যায় না; উক্ত এই সমস্ত উপাদানগুলি পরিস্থিতি ও ঘটনার উপর নির্ভর করে সময়ের কালক্রমে ধাপে ধাপে সমাজজীবনে প্রভাবিত হয়েছে। বনবাসী গুহাচারি মানুষ জোটবদ্ধভাবে সমাজ গঠনের জন্য 'গুসটি', 'ভেইআদ', 'বাখল' প্রভৃতির প্রচলন করেছিল। 'গরাম' থান প্রতিষ্ঠা করে গ্রাম পত্তন করে 'গাঁ মড়ল'/'মাহাত', 'চাঠা'/'মুইখ্যা', 'পরগণইত', 'দেশমড়ল' প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আরোপ করেছিলেন। 'গড়াইত', 'টহলুদার', 'লাইআ', 'পটলই' প্রভৃতির সংগঠিত করে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম চলতো। সামাজিক ও লোকজীবনে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চালানোর জন্য লোকগীত, লোকছড়া, লোককথা ও লোকনাট্য ব্যবহার করে আসছে। যাইহোক, কুড়মালি লোকসাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপঃ-


কুড়মালি লোকসাহিত্য
লোকগীতি
লোকছড়া
লোককথা
লোকনাট্য(ছেইব)
গীত
কাব্যগীত
আহনা/দাঁতকথা
লাহনা
লোকপুরান কথা
রাইত কথা
রূপ কথা
নৃত্য নাট্য
গীতিনাট্য
-জাউআ
-এড়েআ
-চাঁচর
-ঝুমইর
-উধোআ
-ঝারনি
-বিহা
-ধানরপা
-টুসু
-ঢপ
-ঢুয়া
-ঘেরা
অহিরা/বাঁদনা
মাহারাই
মহড়া নাচ
ছো
মাছানি
বুলবুলি
রাসধারী

কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষা ও দর্শনের সঙ্গে সম্পর্ক:

পৃথিবীর ইতিহাসে যে কোন লিখিত উপাদানেই হোক না কেন তার তত্ত্ব ও দর্শন নিগূঢ়ভাবে কাজ করে। সেক্ষেত্রে কুড়মালি একটি প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত ও তার আধার কৃষিকেন্দ্রীক সংস্কৃতি। যাই হোক, কুড়মালি সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত দর্শনগুলি নিম্নরুপঃ

১। ভাববাদী দর্শন ও কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষা:

পাশ্চাত্যের গ্রীক দার্শনিক প্লেটোকে (৪২৭ BCE-৩৪৭ BCE) ভাববাদের জনক বললেও পৃথিবীর ইতিহাসে সভ্যতা গঠনের ধারণা, পদ্ধতি, নিয়মাবলীর বিস্তার প্রভৃতি বুঢ়াবাপ শিব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। শিব সভ্যতা ও সংস্কৃতি (নৃত্য ও গীত) জনক বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃত ভাববাদ শিবকে বাদ দিয়ে হয় না। সে যাই হোক কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষাতে ভাববাদী দর্শনের বৈশিষ্ট্য নিম্নরুপঃ

ক) মন ও বুদ্ধির সঙ্গে পঞ্চভৌতিক উপাদান (ক্ষিতি, তাপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম) ও পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রুপ, রস ও গন্ধ) গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

খ) 'সত্য' যা ভাববাদী দর্শনের একটি অন্যতম উপাদান তা চরম। কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষার মধ্যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

গ) সততা যা কুড়মালি সংস্কৃতি ও সারনা ধর্মে বিদ্যমান।

ঘ) মূল্যবোধ জাগরণ যা ভাববাদী দর্শনের অন্য আর এক উপাদান, কুড়মালি সংস্কৃতির (ক্রিয়ামূলক ও অনুষ্ঠানমূলক) মধ্যে তা প্রকটিত।

ঙ) ব্যক্তিত্ব সংগঠন (চিন্তন, অনুভূতি ও আচরণ) ভাববাদে নিহিত রয়েছে। বুঢ়াবাপ শিব কর্তৃক সৃষ্ট সংস্কৃতি কুড়মালির মধ্যে তন্ত্রসমন্বিত আচরণবাদ ও গভীর চিন্তন রয়েছে।

২। প্রকৃতিবাদী দর্শন ও কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষা:

প্রকৃতিবাদ দর্শনের একটি শাখা যা সৃষ্টিতত্ত্ব (Metaphysics) এর সঙ্গে সামগ্রিকভাবে সংযুক্ত ও প্রকৃতিকে এক অখন্ড বাস্তবরূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এটি সম্পূর্ণরূপে অতিপ্রাকৃত জগৎ থেকে ভিন্ন কিন্তু বাস্তবতাবোধ নিহিত রয়েছে। বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রযুক্ত হয়। ফরাসী বিপ্লবের দার্শনিক রুশোকে (১৭৭২-১৭৭৮) প্রকৃতিবাদের শ্রেষ্ঠ পন্ডিত বলে মনে করলেও প্রকৃতিবাদ কৃষিকেন্দ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত যা বুঢ়াবাপ শিব কর্তৃক সৃষ্ট এক অতি উন্নত সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত। কুড়মালি কৃষিকেন্দ্রীক সংস্কৃতির সঙ্গে প্রকৃতিবাদের অনেক বৈশিষ্ট্যের মিল নিহিত রয়েছে। সেগুলি নিম্নরুপঃ

ক) আত্মশিখন: প্রকৃতি থেকে মানুষ নিজে নিজেই সুন্দর ও সুচারুভাবে শিখতে

সক্ষম। 'আখাইন জাতরা', 'চড়ক', 'রহইন', 'আমাবতি', 'করম', 'জিতিআ', 'বাঁদনা/সহরই', 'ডিনি আনা', 'টুসু' প্রভৃতির মধ্যে মানবীয় জীবনচক্র শুরু, বীজের বিশুদ্ধতা যাচাইকরণ ও পরীক্ষা, প্রকৃতিমাতাকে কর্ষণ থেকে বিরত থাকা, গর্ভসঞ্চার হওয়া, শস্যবীজের অঙ্কুরোদ্গম, শস্যের উৎকর্ষতার বৃদ্ধি ও বিকাশ, জীবনচক্রের পরিণতি, পুনরায় শস্যদানা ঘরে সঞ্চয় ও সূর্যের উত্তরায়ন কালকে ধরে পুনরায় অঙ্করোদ্গামের জন্য পাঠানো পুরো ঘটনাটা চক্রবৎ, বিজ্ঞানভিত্তিক ও পদ্ধতিগত ও উদ্ভিদ গোষ্ঠীকে নমুনা হিসেবে ব্যবহার করে সমগ্র প্রাণীকূল শিক্ষা পাচ্ছে।

খ) শিশুকেন্দ্রীক শিক্ষা: প্রকৃতি মাতা শিশুর প্রথম ও আদর্শ জননী রূপে বিবেচিত। শিশুর প্রথম ও বিধিমুক্ত শিক্ষালাভ প্রকৃতিপাঠ থেকে হওয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়। প্রকৃতির শিক্ষার মধ্যে সরলতা, বিশুদ্ধতা, নমনীয়তা, লাবণ্যভাব, পরাকাষ্ঠা, স্নেহশীলতা মানবতাবোধের জাগরণ, আবেগের বহিঃপ্রকাশের ঘনীভবন কুড়মালি কৃষিকেন্দ্রীক সামাজিক (জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু সংস্কার) ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান (গরাম, ধরম, সূর্যাহি) প্রভৃতির মধ্যে নিগূঢ়ভাবে বিদ্যমান।

গ) প্রগতিশীলতা: অন্ধ কুসংস্কার, গোঁড়ামি, নৃশংসতা, নির্যাতন নেই বললেই চলে। কুড়মালি কৃষিকেন্দ্রীক সংস্কৃতির মধ্যে যুক্তিবিজ্ঞান, দর্শন, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি মানুষের মনে আত্মচেতনার সঞ্চার করে মানবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করে প্রগতিশীল করে তুলেছে।

ঘ) স্বাধীনতার সঞ্চার: প্রকৃতিবাদী দর্শনের মূল কথা প্রকৃতির অঙ্গণে মুক্তভাবে মনের, মতের ও ভাবের প্রসারণ। কুড়মালি কৃষিকেন্দ্রীক সংস্কৃতি পালনে প্রকৃতির কাছ থেকে সানন্দে বিচরণের শিক্ষা প্রকটভাবে পাওয়া যায়। 'করম' ও 'বাঁদনা'/'সহরাই' পরবে কোন কুড়মি জাতির মানুষ মারা গেলে সেই গুষ্টির ভাইআদরা পরে করম পরব ও পূর্ণিমা তিথিতে সেই নেগাচার পালনের সুযোগ পেয়ে থাকে। বংশানুক্রমিকভাবে পিঢ়ির পিঢ়ি কুটুম বাড়তে থাকলে পুরানো কুটুম ছেড়ে নতুন কুটুমের শাখা বৃদ্ধির স্বাধীনতাগুলি খুবই নমনীয় ও প্রসারণশীল।

ঙ) ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণ: পঞ্চ ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) ও পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) শুক্রনাড়ী শঙ্খিনী, বজ্রানী ও নিয়ন্ত্রক বায়ু ঔপস্থ, অশ্বিনী ও কুহু প্রভৃতি কুড়মালি ক্রিয়ামূলক অনুষ্ঠানমলূক সংস্কৃতির মধ্যে ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণ রয়েছে।

চ) নেতিবাচক শিক্ষার প্রভাব: যদিও ফরাসী বিপ্লবের দার্শনিক রুশো নেতিবাচক শিক্ষার ধারণা দেন কিন্তু প্রকৃতিবাদী দর্শনে দৈহিক ও নৈতিক শিক্ষা বৌদ্ধিক শিক্ষার থেকে অধিকতর জোর দেওয়া হয়ে থাকে। মুক্ত আলোয় ছোট্ট শিশুকে তুলসী, দূর্বা

ঘাস জলের সঙ্গে মিশিয়ে স্নান করানো, কাঁচা হলুদ মাখানো, তেল মাখানোর সময় লাহনা (ছড়া) বলে ইন্দ্রিয়ের নমনীয়তা কুড়মালি সংস্কৃতির মধ্যে গভীরভাবে সকলকে শিক্ষা প্রদান করে। মকরে স্নান করে সকালে বয়ঃজেষ্ঠদের প্রণাম করা, বৃদ্ধদের নেগাচার সংক্রান্ত পরামর্শ শোনা, গুরু মহিষ বিক্রির সময় শিং-এ তেল দেওয়া, পায়ে হলুদ জল দেওয়া ও ধান খাওয়া প্রভৃতি নৈতিকতা (Ethics) এর মধ্যে পড়ে।

৩। প্রয়োগবাদী দর্শন ও কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষা:

পাশ্চাত্যের দার্শনিক চার্লস পিয়ার্স (১৮৩৯-১৯১৪), উইলিয়াম জেমস (১৮৪২-১৯১০) প্রভৃতির প্রয়োগবাদী দর্শনের ক্ষেত্রে অবদান থাকলেও জন ডিউইকে (১৮৫৯-১৯৫২) সাধারণত প্রয়োগবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়ে থাকে। পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি সাধারণত প্রয়োগবাদী দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কুড়মালি সংস্কৃতির বিধিমুক্ত লোকায়ত শিক্ষার সঙ্গে প্রয়োগবাদী দর্শনের পাঠ্যক্রমের সাদৃশ্য অনেকাংশে বিদ্যমান। সেগুলি নিম্নরূপঃ

ক) নমনীয়তা: চার থেকে আট বছরের মধ্যে শিশুর খেলার মাধ্যমে পারিবারিক কাজের মাধ্যমে আগ্রহ ও অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে সামাজিক প্রতিফলন ঘটে। 'পাতলুকা', 'কিতকিত', 'কানামাছি', 'নাম ডাকাডাকি', 'অসটা' প্রভৃতি খেলাধুলার মাধ্যমে গুচ্ছিত গৃহ সম্পদ সংরক্ষণ, অনুমান ও পরিচালনা দক্ষতা, সঠিক জায়গায় সঠিক কাজ অনুমান ভিত্তিক সনাক্তকরণের সক্রিয়তা প্রভৃতি অভিজ্ঞতা অর্জন করে ও জীবনে চলার পথে প্রয়োগ করে।

খ) অভিজ্ঞতাভিত্তিক: প্রয়োগবাদী দর্শনে পুরানো অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতার মেলবন্ধনে শিক্ষার্থীর মধ্যে বিষয়বস্তুর সঞ্চার করে। কুড়মালি সংস্কৃতির সঙ্গে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের স্তর বিশেষভাবে বিজড়িত। ছোট্ট শিশু কোন বস্তুকে লক্ষ্য করে পাথর, ইট প্রভৃতি ছোঁড়া অভ্যাস করলে গোলাকার ডেলা বা টেলার দ্বারা অতি সহজেই কোন লক্ষ্য বস্তুকে আঘাত করে।

গ) আগ্রহ ও সামর্থভিত্তিক: প্রয়োগবাদী দর্শনে শিশুর আগ্রহ প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যকে লক্ষ্য করে পাঠ্যক্রম রচিত যা কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কুমার ও কুমারী কুড়মি ছেলে-মেয়েদের করম পরব পালন ও নাচ-গিত, বাঁদনা/সহরাই পরবে অংশগ্রহণ যার মধ্যে আগ্রহ প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য প্রভৃতি সমাজজীবনে অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চালিত হয়ে থাকে।

ঘ) উপযোগীতাভিত্তিক: প্রয়োগবাদী দর্শনে উপযোগীতাভিত্তিক স্তর রয়েছে যা কুড়মালি সংস্কৃতির মধ্যে প্রকটভাবে দেখা যায়। কুড়মালি সমাজের বিবাহ, জন্ম

সংস্কার, মৃত্যু সংস্কার প্রভৃতির নেগাচার সমাজকে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে শ্রীবৃদ্ধি, সংরক্ষণ, পরিবর্তন করে যা উপযোগীতাভিত্তিক স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গরাম, ধরম, সুর্যাহি প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লোকাচার, রীতিনীতি, কলাকুশলতা প্রভৃতি মহিলাদের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে সঞ্চালিত হলে একদিকে সৃজনশীলতা, নমনীয়তা, স্বতঃস্ফুর্ততা, মৌলকতার সঙ্গে সমাজের বুনিয়াদ সুদৃঢ় হবে।

৪। মার্কসবাদী দর্শন ও কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষা:

মার্কসবাদ বা সাম্যবাদের সুত্রপাত বনবাসী গুহাচারী মানুষের জীবন থেকে যা পর্যায়ক্রমিকভাবে কৃষিকেন্দ্রীক কুড়মালি সংস্কৃতির প্রয়োগে পূর্ণতা অর্জন করে। বনবাসী বা গুহাচারি মানুষের বনজ ফল সংগ্রহ করে নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ ও বন্যপশু শিকার করে কাঁচা মাংসের সমান ভাগ তাদের কাছে সেই সময়ের সাম্যবাদী দর্শনের চরম দৃষ্টান্ত। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় অর্থাৎ প্রখর রোদ, ঝড়-বৃষ্টি, শীত কেউ সংগ্রহ করতে না পারলে অপর জন গাছের ছাল সংগ্রহ করে দিত। পাথরের গুহায় বা গাছের ডালে থাকার সময় নিজেরা সমানভাবে জায়গা করে অভিযোজন করে নিরাপত্তাজনিত অস্তিত্বরক্ষা করত।

যাই হোক, কাল মার্কস দেখাতে চেয়েছেন যে শ্রেণী সংগ্রাম থেকেই সমাজে শাসক ও শোষিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সূত্রপাত বিচার করতে গিয়ে তিনি পুঁজিবাদী উৎপাদনশীলতার কঠোর সামালোচনা করেছেন। সর্বপোরি বলা যেতে পারে যে, কার্লমার্কস মূলত অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের পটভূমি বিচার করে ও হেগেলের বস্তুবাদকে কেন্দ্র করে মার্কসবাদ তত্ত্ব বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সাম্যবাদী দর্শনের জন্ম হয়েছে বুঢ়বাপের (শিব) হাত ধরেও তন্ত্রবিজ্ঞান ও দর্শন থেকে যা তিনি কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর সমাজতান্ত্রিক ভাবনার ধারনার সঙ্গে আনন্দমার্গের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রী আনন্দমূর্ত্তিজীর চিন্তাধারার মিল অনেকাংশে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। দুজনেই সমাজের গঠনমূলক সমাজতান্ত্রিক উন্নয়ন ও বিকাশকে সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। 'ত্রিপুরী কংগ্রেসের ভাষণ' ও 'Progressive Utilization Theory' (PROUT) পৃষ্ঠান্তর প্রমান ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু শ্রী প্রভাতরঞ্জন সরকারের কাছে দীক্ষা প্রকটভাবে বহন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের হিমায়েতপুর আশ্রমে সমাজসেবামূলক কাজের ব্যাপারে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সঙ্গে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর গভীরভাবে কথোপোকথন হয়েছিল। ভালো মানুষ তৈরী করতে গেলে বিবাহ সংস্কার সুসঙ্গত ও বিধিসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি

নেতাজীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সৎসঙ্গ সংস্থা সম্পর্কে বলেছেন — " শ্রী শ্রী ঠাকুর আপনাদের যে পথে পরিচালিত করেছেন, সেটাই সর্বকালের সর্বমানের পথ এতে কোন সন্দেহ নেই। বৈদেশিক শাসক থেকে ভারত যখন মুক্তিলাভ করবে, তখন তাকে এই পথই অনুসরণ করতে হবে"।

যাইহোক, কুড়মালি কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষার সঙ্গে সাম্যবাদী দর্শনের প্রতিচ্ছবির প্রতিফলন পাওয়া যায় যা মার্কসবাদী দর্শনের অংশবিশেষ। সেগুলি নিম্নে আলোচিত হল।

ক) কুড়মালি সংস্কৃতিতে সাম্যবাদ ও গুসটি ভাবনা ঃ-

"টঁড় কুড়মি একাশি" অর্থাৎ কুড়মালি কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতিতে মূলত একাশি গুসটি থাকলেও তার আরোও শাখাগুসটি বিদ্যমান, যেমন —'কাড়ুআর' গুসটির শাখাসমূহ — 'কাড়াকাটা কাড়ুআর, 'সিঁকা কাটা কাড়ুআর', 'টাকা কাটা কাড়ুআর, 'আঁধচাবা কাড়ুআর' 'ডুমরিআর' গুসটির শাখাসমূহ — 'ঘোধ ডুমরিআর', ঢেঁকিপিটা ডুমরিআর' 'কেঁকড়ুআর' গুসটির শাখাসমূহ — সাঁচি কেঁকড়ুআর' 'দুধি কেকড়ুআর' ও ভেলু কেঁকড়ুআর, সুদূর অতীতে গুসটি ভাবনার উৎপত্তি হলেও কোন কারণে অর্থনৈতিক কারণে, আর্থ-সামাজিক কারণে, ধর্মীয় কারণে বিভিন্ন রাজ্য, রাষ্ট্র বা অন্যদেশে স্থানান্তরিত হলেও একই গুসটির মানুষদের সমানভাবে ভাব হয়ে থাকে ও নিজ গুসটির ধরা হয় যা 'বঁস ভাইআদ (ভেইআদ) এমনটি একই গুসটিতে গুসটিতে বিবাহ নিষিদ্ধ তখন সমস্যা কাটানোর জন্য গুসটির দাগ বিচার করা হয়। একই গুসটিতে জন্ম সংস্কার, বিবাহ সংস্কার ও মৃত্যু সংস্কার একই নিয়মে ও সমভাবে পালন করে। বাস্তুভিটা, জমি জায়গা, গাছের বাগান প্রভৃতি, গৃহস্থালির জিনিসপত্র সমানভাগে বন্টন হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানমূলক কৃষিমূলক কুড়মালি সংস্কৃতি সমূহ (করম, জিতিআ, বাঁদনা) প্রভৃতি পালনের সময় মানুষ মারা গেলে পরবর্তী একমাসের মধ্যে একাদশীতে 'করম' পরবর্তী বছরে নবজাত মানব মিত বা গরু/ মহিষ বাচ্চা জিতিআ পরবের দিন জন্মগ্রহন করলে পুনরায় জিতিআ পরবের সুযোগ যে, কোন দেওয়া গুসটির লোককে দেওয়া হয়ে থাকে।

খ) কুড়মালি সংস্কৃতিতে সাম্যবাদ ও কৃষিসভ্যতার সমনেতি ঃ

কুড়মালি কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতিতে পুরুষ ও স্ত্রী জাতিতে সমভাবে ও সমান নজরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কুড়মালিকে একটি প্রবাদ আছে —

"আঁখ বাড়িএ্র সিআর রাজা
বনেক রাজা বাঘ,
বিহাঘারে জেনি রাজা

অরাসরা ভাগ"।

কুড়মালি প্রবাদটির মমার্থ এই যে, ক্রিয়ামূলক অনুষ্ঠানে পুরুষদের সমান নারীদের ভূমিকার কথা ব্যক্ত হয়েছে। জমিতে লাঙল দেওয়ার বাদে, ধান রোপন, নিড়ান, ধানকাটা, ধানবাঁধা, ধান ঝাড়া প্রভৃতি কাজে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করে। কুড়মালি ক্রিয়া মূলক সংস্কৃতি (জন্ম সংস্কার, বিবাহ সংস্কার, মৃত্যু সংস্কার) অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি (আখাইন জাতরা, রহিন, অম্বাবতি, করম, জিতিআ, জিহুড়, বাঁদনা, ডিনিআনা (টুসু) ও ধর্মীয় সংস্কৃতি (গরাম, সূর্যাহি) প্রভৃতি অনুষ্ঠানে কুড়মি পুরুষ ও মহিলারা সমানভাবে ও সক্রিয়তার সঙ্গে অংশগ্রহন করে। অর্থনৈতিক সংকটে 'বেরুহন ও কাজের সুবিধার জন্য 'পসরি' পদ্ধতিতে কুড়মি পুরুষ ও মহিলাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

গ) কুড়মালি সংস্কৃতিতে সাম্যবাদ ও খেরওয়াল সমনেতির গুসটি ভাবনাঃ-

কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষজন খেরওয়াল গুসটি সমূহ — মুন্ডা, মাঝি (সাঁওতাল), ওরাং, হো, খেড়িয়া, ভিল, মাহলি, ভূমিজ, ঘাসি, গোন্ডা, খন্ড, কড়া, মাল (সুরিয়া) ও পান প্রভৃতি জাতিসত্ত্বার মানুষদের নিজেদের ভেবে সমান গুরুত্ব ও সম মর্যাদা দান করে। কুড়মালি ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম অন্যখেরওয়াল গুসটির মধ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে। এমনি কুড়মালি ভাষা প্রায় সমগ্র ছোটনাগপুরে সংযোগকারী ভাষা বলে খ্যাত। কুড়মালি ভাষা সাঁওতালি, মুন্ডারি, হো, কুড়ুক, মাহলী, ভূমিজ প্রভৃতি ভাষার শব্দের সঙ্গে প্রকটভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। অনেক কুড়মালি ও সাঁওতালি শব্দে মিল বিদ্যমান। সেগুলি নীচে উদ্ধৃত ঃ-

কুড়মালি শব্দ	সাঁওতালি শব্দ
আঁকুর	আঁকুর।
আঁধার	আঁধার।
আগড়া	আগড়া।
আমড়া	আমড়া।
উপাস	উপাস।
রগড়	রগড়।
জুঁঠা	জুঁঠা।
জাত	জাত।
ঝাড়	ঝাড়।
ঝকঝক	ঝকঝক।
ডেরা	ডেরা।

সুতরাং, উপরের কুড়মালি ও সাঁওতালি শব্দের মিল দেখে মনে হচ্ছে যে কুড়মালি শব্দগুলি সাঁওতালি শব্দের উপর প্রকট গুন আরোপ করছে। ফলতঃ একদিকে সাঁওতালি ভাষার শব্দভান্ডার বৃদ্ধি পাচ্ছে ও অন্যদিকে ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত নমনীয়তা, প্রসারণ ও ব্যপ্তি ঘটছে ও নান্দনিক গুণ ফুটে উঠছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে সমৃদ্ধশালী ভাষাগুলি থেকে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাসমূহ প্রভাবিত হয়েছে ও অক্সিজেন লাভ করছে।

আবার কুড়মালি ও মুন্ডারি শব্দের অনেকাংশ মিল নীচে বর্ণিত ঃ-

কুড়মালি শব্দ	মুন্ডারি শব্দ
আগু	আয়ার।
চাল কি	চাউলি।
সুরজ	সিঁগি।
আচল	আনচার।
আটুপাটু	আটুপাটু।

একইভাবে কুড়মালি ও মুন্ডারি শব্দের মধ্যে গঠনগত মিল রয়েছে। শব্দের ভাষাতত্ত্ব (Philology) ও ধ্বনিগুচ্ছ (Phoneme) এর মিল চরমভাবে প্রকটিত।

সংস্কৃতিগত দিক থেকে কুড়মি ও খেরওয়ালগুসটির মধ্যে আখাইন জাতরা, সারহুল /সারুল (বাহা), আমাবতি, করম, (কারাম), বাঁদনা (সহরাই), কইনাপন প্রভৃতি সাধারণত মিল দেখা যায়। এগুলি পুরো মাত্রায় কৃষিকেন্দ্রীক সংস্কৃতি। এগুলি অতীতে একটি জাত ব্যবহারিক জীবনে কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার পর অন্য জাতিসত্ত্বার মানুষ গ্রহণ করে কিংবা একই সময়ে অন্যান্য খেরওয়াল গুস্টি কুড়মি জাতির সঙ্গে একইভাবে উপরোক্ত সংস্কৃতিগুলি পালন করে।

ধর্মীয় দিক থেকে কুড়মি ও অন্যান্য খেরওয়াল গুস্টির মধ্যে গরাম থান/ জাহিরা থান প্রভৃতির মিল অনেকাংশে পরিলক্ষিত। সুতরাং একটি জাতির দ্বারা অন্য জাতিসত্ত্বার মানুষ প্রভাবিত হচ্ছে বা সমাজের সংস্কৃতির সংরক্ষণ, সঞ্চালন, সংবর্ধন প্রভৃতির প্রসার ঘটাচ্ছে।

ঘ) কুড়মালি সংস্কৃতিতে সাম্যবাদ ও হিতমিতানের সমনেতি:

কুড়মালি সংস্কৃতি যদি গোলাকার বৃত্তের কেন্দ্র ধরা হয় তাহলে তার পরিধির বাম দিকে খেরওয়াল গুসটি ও ডান দিকে পরিধি বরাবর হিতমিতান গুসটির প্রকাশ ঘটে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, কুড়মালি সংস্কৃতির পরিপূরক খেরওয়াল গুসটি ও হিতমিতান গুসটি। দুই গুসটি কুড়মালি কৃষিকেন্দ্রীক সংস্কৃতিকে পূর্ণতা দিতে পারে। একটি বাদ দিলে অপরটির কথা ভাবা যায় না, প্রকাশভঙ্গী ও ব্যাপ্তি তো বহু দূরের

ব্যাপার। যাই হোক, কুড়মালি সংস্কৃতির সঙ্গে হিতমিতানের সম্পর্ক মধুর তা 'জাউআ' গিতে জলহা, তাঁতি ও মুচিদের কথা গভীরভাবে ব্যক্ত হয়েছে-

"ভেল রে ভিনসইরা রে মুরুগাঞ দেলঅ বাঁগ হো
অগ, জাড়ে সিঁতে, অগঁঅ ভিজি জাই।
কাঁহা হামে পাউঅব, ডেড় পগড়িআ
অগ, কাঁহা পাউঅব, দহরি চাদর।
কাঁহা হামে পাউঅব রেসেমেক জুতা
অগ, বনে বনে খেলহ মইলান।
জলহা ঘারে পাউঅব, ডেড় পগড়িআ
অগ, তাঁতি ঘারে দহরি চাদর।
মুচি ঘারে পাউঅব, রেসেমেক জুতা
অগ, রনে বনে খেলহ মইলান।

কিআ বেচি লেউঅব, ডেড় পগড়িআ
অগ, কিআ বেচি দহরি চাদর।
কিআ বেচি লেউঅব রেসেমেক জুতা
অগ, রনে বনে খেলহ মইলান।
দুধা বেচি লেউঅব ডেড় পগড়িআ
অগ, দহি বেচি, দহরি চাদর।
ঘিআ বেচি লেউঅব, রেসেমেক জুতা
অগ, রনে বনে খেলহ মইলান।

(জাউআ ডালি, কিরিটি মাহাত)

সুতরাং, কুড়মি জাতির সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করত হিতমিতান গুসটি ও কুড়মি জাতির সঙ্গে দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা, হাসি, কান্না প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলি ভাগ করে নিত। আবার চাঁচর গিতে কথিত আছে যে—

"কাহাল কাহাল কাহাল
লুগা বুনইতে তাঁতি মরল রে।
লুগা ফাটা বহি বহি জাই।
ভালা বাপেক বেটি হেবে গে তাঁতিনি
লুগা বেচি খাবে ঢারা মাড়

(তথ্য পরিবেশকঃ যুধিষ্ঠির মাহাত, ঝালদা)

কর্মের প্রতি তাঁতির দায়বদ্ধতা, জীবিকা ও কুড়মি জাতির প্রতি সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের নিদর্শন পাওয়া যায়।

আবার হিতমিতান গুসটি ডোমের সঙ্গে কুড়মির গৃহস্থলীর কাজের সঙ্গে সম্পর্ক যা একটি পুরখেইন 'অহিরা' গিতে প্রমান বহন করে—

অহিরে-

কনহ পাহাড়েকেরি কঁচি কঁচি বাঁস রে বাবু হউ
কনহ নগরেকর ডমিন
সরু সরু বেতিআঞ সুপ বুনতউ হউ
সেহ সুপে গেইআনি চুমাই।

অহিরে-

কুড়ম পাহাড়েকেরি কঁচি কঁচি বাঁস রে বাবু হউ
হড়দিপি নগরেক ডমিন
সরু সরু বেতিআঞ সুপ বুনতউ হউ
সেহ সুপে গেইআনি চুমাই।

(সিন্ধু সভ্যতার ভাষা ও কুড়মালি-কিরীটি মাহাত)

কুড়মি জাতির সঙ্গে কুড়ুম পাহাড় (বর্তমানে পাকিস্থানের কুড়ুম প্রদেশ) হড়দিপি নগর (হরপ্পা), ডোম সম্প্রদায় ও সুপ (একজাতীয় ছোট্ট কুলো) প্রভৃতি সমাজতন্ত্রবাদ যা কুড়মালি সংস্কৃতির সাম্যবাদী দর্শনের সঙ্গে সংযুক্ত।

ঙ) কুড়মালি সংস্কৃতিতে সাম্যবাদ ও পাড়াপড়শির সমনেতি:

কুড়মালি সংস্কৃতিতে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলে তেল, হলুদ দিয়ে গাঁ মোড়লের মাধ্যমে গাঁয়ের সবাইকে জানানো হয়ে থাকে। বিবাহ অনুষ্ঠানে হলুদ কাপড়সহ ঘট ভাঁড়ে বেঁধে গোটা পাড়া ছামড়া বাঁধা নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়ে থাকে। মানুষ মারা গেলে গোটা গাঁ দাহ করার জন্য খবর দেওয়া হয় ও সৎকাজের জন্য কাঠ সাহায্য করে থাকে। তিন দিনে তেলখৈলের দিন সমস্ত গাঁকে ডেকে ঘাট কামান ও অন্যান্য কাজকর্মের জন্য গভীরভাবে আলোচনা হয়ে থাকে। গাঁয়ের গরাম পূজা, ডাকবিচার প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে সমস্ত পাড়াপড়শিদের সমানভাবে ডাকা হয়ে থাকে। এছাড়া সধউড়ি, মু জুঠান প্রভৃতি অনুষ্ঠানে গাঁয়ের পড়শিদের নিমন্ত্রণ থাকে।

চ) কুড়মালি সংস্কৃতিতে সাম্যবাদ ও আপস কুটুম সমনেতি:

কুড়মালি সংস্কৃতিতে করম পরব, বাঁদনা/সহরাই পরব প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বিবাহিতা মহিলাদের জামাই ও অন্যান্য কুটুম বাটুমসহ নিমন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। প্রথম বিবাহিতা মহিলারা জিতা পরব করলে বাপের বাড়ী থেকে ডালা, টঁকি, কাঁড়-কাঁড়বাঁশ, কাপড়,

করহনি, ধানের কুচড়ি প্রভৃতি শ্বশুরঘরে পাঠানো হয়ে থাকে। নারতা, একুইশা ও মুজুঠান প্রভৃতি কাজে কুটুমরা উপস্থিত থেকে নবাগত বাচ্চা বা শিশুটিকে জামা-কাপড়, মায়ের জন্য শাড়ি, গহনা প্রভৃতি প্রদান করে। কুড়মালি সংস্কৃতিতে ছেলে কিংবা মেয়েদের বিবাহ অনুষ্ঠানে জামাকাপড়, গহনা, খাট, খাওয়ার সামগ্রী প্রভৃতি প্রদান করে। একইভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির ছেলে কিংবা মেয়ের বিয়ের সময় তা সমভাবে পরিশোধ করা হয়ে থাকে। মৃত ব্যক্তির সৎ কাজের জন্য ২ সলি মুড়ি, ২০ পইলা চিড়া, শাকসব্জি, ২ মন চাল, ১টি ছাগল খাসি প্রভৃতি মেয়েদের শ্বশুরঘর থেকে বাপের ঘরে সাহায্য করা হয়ে থাকে। একইভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাজের জন্য সমভাবে তা পরিশোধ করা হয়ে থাকে।

৫। মানবতাবাদ দর্শন ও কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষা:

কুড়মালি সংস্কৃতিতে বিশেষ করে লোকায়ত শিক্ষার মধ্যে মানবতাবাদ দর্শন গভীরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সহানুভূতি, অনুকম্পা, সহমর্মিতা প্রভৃতি মানবতাবাদের প্রধান গুন সমূহ। শুধু পশুপ্রেম, মানবপ্রেম নয়; অচেতনমূলক বস্তু কিন্তু সর্বপ্রাণময় বস্তু বা প্রকৃতিবাদী বস্তুর ক্ষেত্রেও সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। একটি 'করম' গিতে বিষয়টি সহজভাবে অনুমেয়-

<u>গীত</u>

"কনে তকে করম রাজা আনলঅ নেউঅতি রে
আনলঅ নেউঅতি
কনে তকে করম রাজা রাখলঅ উপাসি
মাঝি মাহাতএ করম রাজা আনলঅ নেউঅতি রে
আনলঅ নেউঅতি
গাঁউএকর বেটিছউআএ রাখলঅ উপাসি"।

(লতে লতে করম গিত- পঃবঃ কুড়মালি নিখরান, পৃষ্ঠা-৬০)

করম রাজা অর্থাৎ 'করম গঁসাই' (কৃষির স্রষ্টা) কে নিমন্ত্রণ করার ব্যাপারে 'মাঝি' বা 'মাহাত' (পুরুষ) ও 'বেটিছউআ' (মহিলা) প্রভৃতিদের সমান অধিকারের কথা ব্যক্ত হয়েছে। আবার একটি 'করম' গিতে কথিত যে—

"কনঅ পরবে দাদা আনলে লেগঅলে রে
কনঅ পরবে দাদা করলে বিদাই।
করম পরবে দাদা করলে বিদাই।
করম পরবে দাদা আনলে লেগঅলে রে
জিতিআ পরবে দাদা আনলে লেগঅলে রে

জিতিআ পরবে দাদা করঅলে বিদাই।
কিআ খাউআউলে দাদা কিআ পিঁধাউলে রে
কিআ দেইএ রে দাদা করঅলে বিদাই।
ভাতঅ খাউআউলে দাদা লুগা পিঁধাউলে রে
ডালা দেইএ রে দাদা করঅলে বিদাই।

(লতে লতে করম গিত- পঃবঃ কুড়মালি নিখরান, পৃষ্ঠা-৩৪)

মহিলাদের প্রতি পুরুষদের কর্তব্যের কথা ব্যক্ত হয়েছে। 'করম ডালা', 'সিঁথির সিঁদুর' ও 'সাড়হি' পুরুষদের দেওয়া আজীবন মহিলারা বহন করে আসছে। আবার একটি 'অহিরা' গিতে উল্লিখিত যে—

"অহিরে- কিআ ধিআনে গেইআ ঘারা সে বাহরাল রে বাবু হউ
কিআ ধিআনে বনা জাই
কিআ ধিআনে গেইআ ঘারা সে ঘুরইএ
কিআ ধিআনে দুধা দেই?
অহিরে- সুরুজ ধিআনে গেইআ ঘারা সে বাহরাল রে বাবু হউ
ঘাঁসা ধিআনে গউ বনা জাই
বাছুরি ধিআনে গেইআ ঘারা সে ঘুরল হউ
কিসানে ধিআনে গউ দুধা দেই।

(অহিরা- কিরিটি মাহাত, পৃষ্ঠা-৭৬)

কৃষিজীবি কুড়মি জাতির সঙ্গে 'সূর্য', 'ঘাসা', 'বাছুর' ও কিষাণের (চাষীর) সঙ্গে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। একটি প্রচলিত 'অহিরা' গিতে কথিত যে—

"অহিরে- এতেক দিন জে খালউ ভালা ভাট ভিখারিএ রে বাবু হউ
আজু ত মাগে ধিঁগুআইন
ধিঁগুআইনকে দেলে ভালা পানিএ নেহি পড়তউ
জুগে জুগে রহি জাতউ নাম"

(পুরখেনি সঁহরই গিত- শক্তিপদ বঁসরিআর, পৃষ্ঠা-৪৪)

কুড়মি জাতির 'সহরাই'/'বাঁদনা' পরবে ভিখারি, ধিঁগুআন প্রভৃতিদের খাবার দেওয়ার সাম্যতার বিধান 'অহিরা' গিতে উল্লিখিত। অন্য একটি 'অহিরা' গিতে উল্লিখিত যে-

"অহিরে- কনঅ জে চাসা ভালা ঠেঁগা হাঁরে ঘুরই রে বাবু হউ
কনঅ চাসা গাঢ়াই ভাঁসি জাই
কনঅ জে চাসা ভালা মইধ খাধাঁএ ঘুরই হউ
কনঅ চাসা পিটিকে বাঢ়াই?

অহিরে- কুড়মি জে চাসা ভালা ঠেঁগা হারে ঘুরই রে বাবু হউ
জলহা চাসা গাঢ়াই ভাঁসি জাই
তেলি জে চাসা ভালা মইধ খাধাঁএ ঘুরই হউ
কামার চাসা পিটিকে বাঢ়াই।

(অহিরা- কিরিটি মাহাত, পৃষ্ঠা-২০)

খেরওয়াল গুসটি ও কুড়মির সঙ্গে জলহা, তেলি, কামার প্রভৃতি হিতমিতান গুসটির কথা ও কর্মের সাম্যবাদের কথা আছে। আবার একটি প্রচলিত 'অহিরা' গিতে আছে যে-

"অহিরে- মকে বেচলে সঁঞা কনে দেতউ রাঁধি রে বাবু হউ
কনে তকে করতউ সুঁসার
কনেহি রে সঁঞা সঁগে সাথে বুলতউ
কনে তকে পাড়তঅ টকাইর।।
অহিরে- মাঁঞ বুড়িঞ গে ধনি রাঁধি বাঁটি দেউঅতউ রে বাবু হউ
বহিনিঞ ত করতঅ সুঁসার
আড়রি পাড়রি ঠেঁগা সঁগে সাথে বুলতউ
বঁসিআঞ ত পাড়অত টকাইর।।

(পুরখেনি সঁহরই গিত- সমভুনাথ বঁসরিআর আর সকতিপদঅ বঁসরিআর, পৃষ্ঠা-২৩)

অহিরা গিতে মা, বোন, লাঠি, বাঁশি প্রভৃতির সাম্যবাদের কথা ব্যক্ত হয়েছে। একটি জনপ্রিয় 'অহিরা' গিতে কথিত যে-

"অহিরে- কাঁহাই পাউঅব ভালা মুচু মুচু জুতা রে বাবু হউ
কাঁহা পাউঅব দহরি চাদর?
কাঁহা ত পাউঅব ভালা ডেড় পগড়িআ হউ
কাঁহা পাউঅব পাঁড়রিকা ডাঁগ?
অহিরে- মুচি ঘারে পাউঅব ভালা মুচুমুচু জুতা রে বাবু হউ
জলহা ঘারে দহরি চাদর
সদাগর ঘারে পাউঅব ভালা ডেড় পগড়িআ হউ
বিজু বনে পাঁড়রিকা ডাঁগ
উঠে পুতা খলবে মইলান।

(অহিরা- কিরিটি মাহাত, পৃষ্ঠা-৭৯)

কুড়মি জাতির সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন মানুষের কর্মের সম্পর্কের সাম্যবাদ আলোচনা করা হয়েছে।

সুতরাং আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী তথা শিক্ষাবিদ কার্ল রানসম রজার্স (১৯০২-১৯৮৭) 'Humaytic Approach' এর প্রথাগত প্রতিষ্ঠাতা হলেও প্রকৃত 'মানবতাবাদ (Humanism) তত্ত্বের সূত্রপাত কৃষিসভ্যতার সময়কাল থেকে ও সেখানে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সাম্যবাদী দর্শনকে প্রয়োগ যা কৃষিজীবি কুড়মি জাতির প্রধান ভূমিকাগুলির মধ্যে অন্যতম। কার্ল রানসম রজার্স তাঁর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে ব্যক্তিতান্ত্রিক, শিক্ষার্থীকেন্দ্রীক শিক্ষণ, রজারিআন আলংকারিক দৃষ্টিভঙ্গি, মিশ্র সংস্কৃতির সম্পর্ক, ব্যক্তিকেন্দ্রীক ও রাজনীতিযুক্ত কথন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তি, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতির মধ্যে মানবতাবাদ দর্শন বিদ্যমান যা কৃষিজীবি কুড়মি জাতি হাজার হাজার বছর আগে কৃষিকেন্দ্রীক সভ্যতা থেকে অনুধাবন করেছিলেন।

৮। নব্যমানবতাবাদ দর্শন ও কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষা:

'নব্যমানবতাবাদ (Neohumanism) তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা প্রভাতরঞ্জন সরকার (১৯২১-১৯৯০)। তিনি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে 'The Liberation of Intellect : Neohumanism' গ্রন্থে তাঁর তত্ত্ব ও দর্শনকে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি নব্য মানবতাবাদের তিনটি সোপানের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা-

ক) সিপরিচুয়ালিটি এ্যাজ এ কাল্ট (Spirituality Age a cult)

খ) সিপরিচুয়ালিটি ইন এসেন্স বা সিপরিট (Spirituality In Essence as Spirit)

গ) সিপরিচুয়ালিটি এ্যাজ এ মিশন (Spirituality Age A Mission)

ক) সিপরিচুয়ালিটি এ্যাজ এ কাল্ট (Spirituality Age a cult): নব্য মানবতাবাদের 'সিপরিচুয়ালিটি এ্যাজ এ কাল্ট' বলতে 'ফ্রিজিকো সাইকো-সিপরিচুয়াল এন্‌ডেবার' (জড়-মানসিক আধ্যাত্মিক প্রগতির নিত্য প্রয়াস) বোঝায়। এই পর্যায়ে জড় জগতের ভুল-ভ্রান্তিগুলি সংশোধন করতে সাহায্য করবে, চিন্তা জগতের ত্রুটি শোধরাতে নির্দেশনা দিবেও সর্বোপরি আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের দিকে যেতে সাহায্য করবে যা মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক জগতেও সহায়ক। কুড়মালি সংস্কৃতির উপাদানসমূহ (নৃত্য, গিত, কহনি, ছড়া, প্রবাদ) কুড়মি তথা আপামর জনসাধারণের কাছে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বিশ্লেষণপূর্বক পৌঁছালে ও সারনা ধরমের সারবস্তুগুলি মানুষকে সরবরাহ করলে অন্তর্নিহিত প্রক্ষোভগুলির বহিঃপ্রকাশ ঘটে লক্ষ্য মাত্রা চরিতার্থ করবে।

খ) সিপরিচুয়ালিটি ইন এসেন্স (Spirituality In Essence): নব্য মানবতার 'সিপরিচুয়াল এসেন্স' বলতে আধ্যাত্মিক সারমর্ম যা নিগূঢ় তত্ত্বকে নির্দেশিত করে। মানুষের মনের সাহায্যে সমগ্র মানব জাতিকে সামগ্রিকভাবে দেখা যায়। মানুষের

কালেকটিব মাইন্ডে নতুন ধরণের চিন্তার প্রসারণ আনতে হবে। মানুষের কালেকটিব স্পিরিট শক্তির যোগান দিয়ে একটি পূর্ণমাত্রায় আধ্যাত্মিক গোষ্ঠীতে পরিণত করবে যাতে আর স্যুডো-ইউম্যানিষ্ট ছক কাজ করবে না। ব্যাপক পরিমানে কালেকটিব স্পিরিট সঞ্চার করতে গেলে কুড়মালি খেমটা, আড় খেমটা, লুহুর লুহুর ভাদরিআ, উমটি ঝুমটি, ঝিঙ্গাফুলিআ, ডমকচ প্রভৃতি রেগ সহ গিত, নৃত্য ও বাজনা দিতে হবে ও সেই সঙ্গে তন্ত্রভিত্তিক যোগমার্গের সারনা ধরমের উপাদানসমূহ দিয়ে সাহায্য করতে হবে।

গ) সিপরিচুয়ালিটি এ্যাজ এ মিশন (Spirituality Age a Mission):

জগতের সমস্ত কর্মকান্ডের উৎস একটি অস্তিত্ববাচক চক্রনাভি থেকে। মানুষের এক্‌জিস্টেনসিয়াল নিউক্লিয়াসের সঙ্গে যোগ আছে কসমোলজিক্যাল অর্ডার যা নিয়ন্তাবিন্দু যা মহাবিশ্বের দোলার সঙ্গে চক্রনাভির সম্পর্ক অটুটভাবে রেখে চলেছে। চরম পথ হচ্ছে এক্‌জিস্টেনসিয়াল নিউক্লিয়াসকে কসমিক এর এক্‌জিস্টেনসিয়াল নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সংযোগ ঘটানো যাতে অনুবিন্দু ও মহাবিন্দু মিলনে এককত্বের সমস্ত চক্রাধারকে বিশ্বদ্যোতনার মহাচক্রনাভিতে মিশিয়ে অবযন্ত্রণার থেকে পরিত্রাণ ঘটাবে। নব্যমানবতাবাদ কেবল মানুষের পরিত্রাণ ঘটাবে শুধু তাই নয়; সমস্ত জীবকূল ও উদ্ভিদকূলকে বাঁচাবে। মানুষ তখন বিশ্বমানব পর্যায়ে পৌঁছাবে ও মানুষের পক্ষে অসাধ্যসাধনমূলক কাজ হবে, কোন প্রকার খারাপ বা অশুভ শক্তি মানুষের ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। কুড়মালি কৃষিকেন্দ্রীক প্রকৃতিবাদমূলক সংস্কৃতি ও সারনা ধরমের উপাদানগুলি দিলে তা অনেকাংশে চরিতার্থ হবে। সংস্কৃতি (প্রকৃতিকেন্দ্রীক কৃষিসংস্কৃতি) ও ধরম পারে মানুষের মনকে বৃহৎ ও বিস্তীর্ণ পরিসরে নিয়ে যেতে পারে ও চরম সমাধান করতে পারে।

কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারা ও সাংখ্য দর্শন:

কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারা ও সাংখ্য দর্শন গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। মহর্ষি কপিল রাঢ়ের পাট ঝালদা গ্রামের সন্তান 'সাংখ্যা' দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন যা পৃথিবীর দর্শনশাস্ত্রে প্রাচীনতম নিরীশ্বর সাংখ্য রূপে বিবেচিত। কপিল রচিত গ্রন্থের নাম 'সাংখ্যসূত্র'। জনশ্রুতি আছে যে মহর্ষি কপিল কুড়মি ঘরের সন্তান ছিলেন। যদিও তা প্রমান সাপেক্ষ ও গবেষণালব্ধ বিষয়। 'সাংখ্য' শব্দটি 'সংখ্যা' শব্দ থেকে এসেছে। সংখ্যা শব্দের অর্থ 'পরিসংখ্যান' বা 'গণনা'। বৃহত্তর অর্থে বলা যেতে পারে যে, যে শাস্ত্র পাঠ করলে সম্যক্‌জ্ঞান লাভ করা যায় তারই নাম 'সাংখ্যদর্শন'। সাংখ্যদর্শন দ্বৈতবাদী দর্শন যার মূল দুটি তত্ত্ব- প্রকৃতি (জড়) ও পুরুষ (আত্মা)। মহর্ষি কপিল। প্রদত্ত 'সাংখ্যসূত্র' যা অনেক বছর পর পন্ডিত ঈশ্বর কৃষ্ণ দু বছর যাবৎ ধরে (এক

বছর সাংখ্যসূত্রের পাঠ ও অন্য এক বছর সাংখ্য দর্শনের টীকা) সর্বজন শ্রদ্ধেয় আচার্য শিতিকণ্ঠ নামাঙ্কিত 'সাংখ্যকারিকায়' সৎকার্যবাদের প্রতিপাদক যুক্তিযুক্ত সূত্রাকারে প্রদর্শন করেছেন-

"অসদকরণাৎ উপাদান গ্রহণাৎ সর্বসম্ভবাভাবাৎ
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণ ভাবাচ্চ সৎকার্যম্"।

সূত্রটিতে পাঁচটি যুক্তির অবতারণ রয়েছে। যথা- ১. অসদকরণাৎ, ২. উপাদানগ্রহণাৎ, ৩. সর্বসম্ভবাভাবাৎ, ৪. শক্তস্য শক্যকরণাৎ, ৫. করণভাবাৎ।

সাংখ্যদর্শনে 'সৎকার্যবাদ' সমর্থিত। সাংখ্যমতে কার্য সৎ অর্থাৎ উৎপন্ন হবার পূর্বে কার্য তার উপাদান কারণে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান থাকে। প্রকৃতি জগতের মূল কারণ ও সৃষ্টির পূর্বে জগৎ প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। জগৎ প্রকৃতির পরিণাম। সৎকার্যবাদের দুটি প্রকারভেদে আছে। যথা- ১. পরিণামবাদ ও ২. বিবর্তনবাদ।

১. পরিণামবাদ: পরিণামবাদ অনুসারে, কারণের পরিণাম হচ্ছে কার্য। এবং কারণ প্রকৃতই কার্যে পরিণত হয়ে থাকে। কারণে যা অব্যক্ত রূপে থাকে কার্যে তা ব্যক্তরূপে প্রকাশিত হয়। কারণে যা সূক্ষ্মরূপে থাকে কার্যে তার স্থূলতা প্রাপ্তি ঘটে। সাংখ্য পরিণামবাদা 'প্রকৃতি পরিণামবাদ' নামে পরিচিত। সাংখ্য মতে, জগৎ প্রকৃতির (জড়ের) পরিণাম- অব্যক্ত প্রকৃতি যথার্থই জগতে ব্যক্ত হয়। উৎপত্তির আগে জগৎ প্রকৃতির মধ্যে অব্যক্তরূপে বিদ্যমান ছিল (সৎকার্যবাদ) ও সেই সূক্ষ্মাব স্তরে অভিব্যক্তি হচ্ছে জগৎ (পরিণামবাদ), ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে অ্যান্টনি ল্যাভসিয়েঁ 'ভরের নিত্যতা সূত্র' জুলিয়াস রবার্ট মায়ার 'শক্তির নিত্যতা সূত্র' এর মাধ্যমে জড় পদার্থের রূপান্তর ও শক্তির রূপান্তর দেখিয়েছেন। যেখানে মোট ভর ও মোট শক্তি অপরিবর্তনীয়।

২. বিবর্তনবাদ: বিবর্তনবাদ অনুযায়ী কারণ প্রকৃতই কার্যে পরিণত হয় না অর্থাৎ কার্য কারণের প্রকৃত পরিণাম নয়। বিজ্ঞানবাদীদের বিবর্তনবাদ 'বিজ্ঞান বিবর্তনবাদ' নামে পরিচিত একইভাবে শূণ্যবাদীদের বিবর্তনবাদ 'শূণ্যতা বিবর্তনবাদ' নামে পরিচিত যা কুড়মালি সংস্কৃতি ও দর্শনের সঙ্গে সংযুক্ত। প্রতিদিন ভোরে 'মাড়ুলি'/'ছড়া' শূণ্যবাদের প্রতীকি রূপে ব্যবহৃত যা শঙ্করের বিবর্তনবাদ 'ব্রহ্মা বিবর্তনবাদ' রুপে বিবেচিত। কুড়মালি শূণ্যবাদের মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি আড়াই যুক্তি আড়াই অর্থাৎ পঞ্চমাহভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম) যা পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) থেকে উৎপত্তি লাভ করে। কুড়মালি সংস্কৃতির এক বহুল প্রচলিত ঝুমুরে কথিত যে—

"মহাশূণ্যে শূণ্য ছিল
তাতে বিন্দু উপজিল"

মহাশূণ্যের শূণ্য থেকেই বিন্দুর উৎপত্তি। সেই শূণ্যই কারণ যা কার্যরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। কার্য কারণের প্রতিভাত রূপ, পরিণাম নয়। কুড়মালি সংস্কৃতিতে 'আখাইন জাতরা' বাঁদিক থেকে আড়াই পাক লাঙ্গল, আখাইন জাতরায় আড়াই কোপ গোবর কুপানো, চড়কে আড়াই কাঠির বাজনা, রহিন পরবে আড়াই মুইঠ বীজ তলা মাটির সঙ্গে মেশানো, আড়াই পাক জাউআ নাচ, জিতা পরবে আখ ডালকে ধরে বারতিরা বাম থেকে ডান দিকে আড়াই পাক ঘোরার প্রমান পাওয়া যায়।

আবার পাঁচ মুগ, পাঁচটি আতপ চাল, পাঁচ আঁটি (ধান রোপনের সময়), পাঁচটা সিঁদুরের দাগ, পাঁচটি শালপাতায় পূজার সামগ্রীভাগ, পাঁচজন গ্রাম্য বিচার, কুয়ো প্রতিষ্ঠায় পাঁচজনকে খাওয়ানো ও পাঁচটি ছাগল বলি প্রভৃতি পঞ্চমহাভূতের নমুনার প্রমান পাওয়া যায়। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ঋষি অরবিন্দ ঘোষ তাঁর 'The Life Divine' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে মানুষকে কিভাবে সচেতন মানসিকতা স্তর (Consciousness Mind) অতিক্রম করে আত্মিক মানসিক স্তরে (Super Mind) পৌঁছতে হবে। এইজন্য তাদেরকে অখন্ড যোগাভ্যাস করতে হবে ও শারীরিক স্তরকে মানসিক স্তরে নিয়ে গিয়ে আধ্যাত্মিক স্তরের চরম পর্যায়ে গিয়ে মনের রূপান্তর ঘটাতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, অবচেতন মন (Unconsciousness Mind) কখনও চরম পর্যায়ে যেতে পারবে না।

কুড়মালি বস্তু বিষয়ক মৃত্যু সংস্কৃতিতে 'দ বাটে কাঁটা সাটন' এর মাধ্যমে জীবাত্মার পুনরাগমন রোধ ও 'তিন দিনাহি তিতা ভাত/ 'তেল খইল' এর মাধ্যমে আহার্য বস্তু দিয়ে জীবাত্মাকে আস্বাদে প্রলুব্ধ করা হয়ে থাকে যাতে পুর্নজন্ম হতে না পারে। পক্ষান্তরে মৃত্যু বিষয়ক সংস্কৃতির শেষ পর্যায়ে 'পিড়হি পাড়ন' এর মাধ্যমে পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে বিরহির বড়ি আহার্য বস্তু দিয়ে সন্তুষ্ট করা হয়ে থাকে। একদম শেষ পর্যায়ে 'রকত-পাড়া' নেগাচার পালনের মাধ্যমে কালো রঙের 'পাঁঠি ছাগল' কেটে মহামাঞের ঋণ পরিশোধ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'চড়ক' পার্বণের সময় পাঁঠা বলি দিয়ে পুত্রকন্যার জন্মলাভের ঋণ পরিশোধ করা হয়ে থাকে। পঞ্চভূতে (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) বিলীন হওয়ার জন্য টোটেমিক কুড়মি জাতি বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও ভূগোল প্রভৃতি শক্তির রূপান্তর উপরোক্ত আলোচ্য বিষয়ের মাধ্যমে তুলে ধরেছে। সুতরাং কুড়মি জাতি ও কুড়মালি জাতিসত্ত্বার কোন জায়গায় রূপান্তরবাদ নেই ঠিক কিন্তু বস্তু বিষয়ক মৃত্যু সংস্কৃতির শেষে 'রকত পাড়া' অনুষ্ঠানে কালো 'মেদি ছাগল' বলি যা উর্বরতার ইঙ্গিতবাহী ও রক্ত রজ গুণের প্রতীকবাহী হিসেবে কাজ করছে। ঋণাত্মক শক্তিকে ধনাত্মক শক্তির কাছে আত্মসমর্পন করানো হচ্ছে। সুতরাং যোগমার্গের কুড়মালি

সংস্কৃতির মধ্যে 'রূপান্তরবাদ' বিদ্যমান। যোহান হ্যানরিচ ল্যাম্বার্ট, অ্যালবাডো (১৭৬০) এর মাধ্যমে সৌরশক্তির ২৫ শতাংশ মেঘপুঞ্জ, ৭ শতাংশ বায়ুমন্ডল ও ২শতাংশ ভূপৃষ্ঠ দ্বারা প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত হয়ে মহাশূণ্যে ফিরে যায়। ভূপৃষ্ঠ, বায়ুমন্ডল ও মেঘপুঞ্জ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে ক্ষিতি, মরুৎ ও ব্যোম এর প্রতীকিকরণরূপে কাজ করে। জীববিদ্যায় তাপগতিবিদ্যার প্রথম সুত্রে শক্তির সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না কিন্তু শক্তির রূপান্তর ঘটে। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রে এক শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয় ও রূপান্তরিত হওয়ার প্রয়োজনে কিছু শক্তির অপচয় ঘটে। মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণা বিষয়ক পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংস তাঁর বহুল জনপ্রিয় 'Blackhole and Baby Universes Other Essays' (১৯৯৩) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন গ্যাসের অভিকর্ষজ তরঙ্গের সাহায্যে শক্তি ও তাপের রূপান্তর ঘটে এবং ইলেকট্রনের বিচূর্ণীভবন ঘটে ও ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানযুক্ত মুক্ত আয়নের প্রকাশ ঘটে। তিনি দেখিয়েছেন যে, কৃষ্ণগহ্বরের ভিতর অভিকর্ষজ তরঙ্গের বেগ এত তীব্র যে আলোর মতো তীব্র গতিসম্পন্ন বস্তু সেখান থেকে পুরোপুরিভাবে নির্গত হতে পারেনা। সেখানে সঞ্চিত ও বিদ্যমান অবস্থায় থাকতে হয়।

সাংখ্য দর্শনে 'জ্ঞানবিদ্যার' (Epistemology) যে তিনটি প্রমান পাওয়া যায় সেগুলি নিম্নরূপ:-

ক. প্রত্যক্ষ (Perception)
খ. অনুমান (Inference)
গ. শব্দ (Testimony)

ক. প্রত্যক্ষ (Perception):

ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়জনিত সংযোগের ফলে যে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই 'প্রত্যক্ষজ্ঞান' নামে অভিহিত।

বাহ্য বা লৌকিকভাবে নির্বিকল্পভাবে কুড়মালি পরিবেশ ও পরিমন্ডলের কোন কুড়মি লোক পায়রা থাকার টং এক বাচ্চা শিশুকে দেখাল যা তাঁর সেই বয়সে টং সম্পর্কে কোন ধারণা নেই কিন্তু চোখ দিয়ে দেখছে যা পরবর্তী সময়ে সবিকল্পক প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে সুস্পষ্ট জ্ঞান বিস্তারে সহায়ক।

খ. অনুমান (Inference):

জ্ঞাত কোন পদার্থের সাহায্যে অজ্ঞাত কোন পদার্থের জ্ঞানলাভ প্রণালীকে 'অনুমান' বলে আর সেই প্রণালীলব্ধ জ্ঞানকে 'অনুমিতি' বলে। অনুমিতি হচ্ছে জ্ঞানের উপর নির্ভর করে অন্য জ্ঞান।

কুড়মালি অনুষ্ঠান বিষয়ক সংস্কৃতিতে সাতটা 'ডা' পার হওয়ার পর কুড়মি

জাতি বীজ ফেলার জন্য 'কেতকি বতর' পালন করে। সুতরাং মাটির 'কেতকি বতর' 'অনুমিত' যার' উপর ভর করে বোঝা যায় যে বীজতলা ফেলার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বাতের সম্বন্ধে সাধ্য অনুমিত হয় তা 'পক্ষ'। 'কেতকি' 'সাধ্য' অনুমিত। এখানে 'মাটির' সম্বন্ধে 'কেতকির' সাধ্য অনুমিত হওয়ায় মাটি 'পক্ষ' যার উপর নির্ভর করে পক্ষে সাধ্য অনুমিত হয় তা 'হেতু'। এখানে 'বতর' 'হেতু' কেননা বতর প্রত্যক্ষণের উপর নির্ভর করে মাটিতে বীজতলা ফেলা যাবে।

গ. শব্দ (Testimony):

আপ্ত ব্যক্তির উপদেশ বা বাক্যই শব্দ প্রমান। যিনি বাক্যের যথার্থ অর্থ জানেন এবং সত্য ভাষণের ইচ্ছাবশত সেই জ্ঞানানুরূপ বাক্য বলেন তিনিই আপ্ত এবং এমন আপ্ত ব্যক্তির বাক্যই শব্দপ্রমান। ভারতীয় দর্শনে দু ধরণের শব্দ বিদ্যমান। যথা- ১. লৌকিক শব্দ, ২. বৈদিক শব্দ/শ্রুতি।

কুড়মালি সংস্কৃতির 'মাহারাই' গিত শ্রুতির চরম নিদর্শন বহন করে।

কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারা ও যোগদর্শন:

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। সাংখ্য দর্শন ও যোগ দর্শনের মধ্যে বিভেদ প্রায় নেই। তত্ত্ব ও প্রয়োগ যেমন পরস্পর ঘনিষ্ট সম্পর্ক আবদ্ধ, সাংখ্য ও যোগও তেমনি অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। সাংখ্যদর্শনে তত্ত্বালোচনা মুখ্য, যোগশাস্ত্রে প্রয়োগবিধি মুখ্য। উভয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, সাংখ্যদর্শন ঈশ্বর স্বীকৃত নয়, কিন্তু যোগদর্শন ঈশ্বর স্বীকৃত। সাংখ্যমতে বিবেকজ্ঞানই মুক্তির উপায়। যোগ দর্শনে বিবেক জ্ঞানের সঙ্গে যোগসাধনকেও মুক্তির উপায় বলা হয়েছে। সাংখ্য জ্ঞানপ্রধান। যোগ কর্মপ্রধান। সাংখ্য দর্শন কেবল জ্ঞানকেই মুক্তির উপায় বলেন; যোগদর্শনে কর্মযোগকে-ধ্যান, ধারণা ও সমাধিকে মুক্তির উপায় বলেন।

সে যাই হোক, জ্ঞানতত্ত্বকে অনুসরণ করে যোগদর্শনেও প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম/শব্দকে প্রমানরূপে স্বীকার করা হয়েছে। সেগুলি নিম্নোক্তভাবে আলোচিত-

ক. প্রত্যক্ষ (Perception):

ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহ্যবস্তুর সংযোগজনিত চিত্তের যে বৃত্তি তাই প্রত্যক্ষজ্ঞান। বাহ্যবস্তু যথা-ঘটের সঙ্গে ইন্দ্রিয় ও মনের সংযোগের ফলে চিত্তের যে ঘটজ্ঞান হয় তা 'বাহ্যপ্রত্যক্ষ বৃত্তি'।

যেমন- কুড়মালি সংস্কৃতির একটি প্রযুক্তি পলাশ পাতায় তৈরী 'লটা' যা জল খেতে সাহায্য করে। এখানে চোখের সাহায্যে দেখে ও জিভের সাহায্যে স্বাদ নিয়ে প্রানের আরাম এবং 'লটা' যা জলপাত্রসম য়া 'বাহ্যপ্রত্যক্ষ বৃত্তির' নমুনা বহন করে।

অন্যদিকে মন-রূপ অন্তর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চিত্তের যে মানসিক অবস্থা সমূহের,

যথা- সুখ দুঃখের,জ্ঞান ও বৃত্তি হয় যা অন্তঃ প্রত্যক্ষবৃত্তি যেমন- মন ঠান্ডা ত কাঠায় গঙ্গা।

কুড়মালি সংস্কৃতিতে অষ্টাঙ্গিক যোগের প্রমানসমূহ:

১. যম:

অহিংসাঃ মৈত্রী-করম পরবে বোনের দ্বারা ভাইয়ের হাতে 'গমহা' সূতা বাঁধা। জাউআ ফেলার পর কুমারী মেয়েরা বন্ধুত্ব বজায় রাখে একে অপরের সঙ্গে। এইগুলি সব কুড়মালি দর্শনে সম্প্রীতি ও মানবতাবোধের নিদর্শন প্রমান করে।

সত্যঃ করম পরবে স্নানের সময় আদিগুরু বুঢ়াবাপ, বাবার কুল ও মায়ের কুলের জন্য মুখ ধোয়া ও স্নানের জন্য হলুদ-তেল-দাঁতুন ব্যবহার প্রভৃতি চরম সত্যতার প্রকাশ। ছাঁছাকলে ভোগ ও জল দেওয়ার সময় সূর্যদেব, বসমতা ও পূর্বপুরুষের পিড়হির পুরুষ ও মহিলাদের স্মরণ। করম পূজায় ও বাঁদনা পরবে নটা ঘর চরম সত্য। জিতিআর পান্নার সময় তিনটি আলতি পাতে ভাত-তরকারী ও তিনটি বঁতায় জল ভর্তি করে ছাঁছাকলে ভাত, তরকারী ওজল কুল দেবতার পিড়হি জননীদের স্মরণ। মাডুলি দেওয়া প্রতিদিন। জল কর্মযোগের প্রতীকি অর্থে ব্যবহৃত।

অস্তেয়ঃ "এক গুন লিলে দুগুন জাই" কুড়মালি প্রবাদের মাধ্যমে অচর্য মানসিকতা ত্যাগের কথা কুড়মালি দর্শনে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

ব্রহ্মচর্যঃ

জাউআ ফেলার পর কুমারী মেয়েদের পালনসমূহ সবেই ব্রহ্মচর্য পালন।

অপরিগ্রহঃ 'আমে খাবে নঁহ, নিম খাবে নঁহ"। উল্লিখিত কুড়মালি দাঁতকথার মাধ্যমে সমাজের মানুষের প্রতি বা অচেতন বস্তুর প্রতি উদারতা ব্যক্ত হয়েছে।

২. নিয়ম:

শৌচঃ করম ও জিতা পরবে সকাল সকাল স্নান, ঘরপরিষ্কার ও পান্নার খাবার শৌচের দৃষ্ঠান্ত। সহরাই(বাঁদনা) পরবে স্নান করে ধান শিষের মোড় তৈরী করা হয় যা শৌচের নমুনা বহন করে।

সন্তোষঃপরের দেখে করি হাই,নিজের জাও থাকে তাও জাই-এই কুড়মালি আহনার মধ্য দিয়ে স্বল্প পার্থিব বস্তুতে জাগতিক তৃপ্তির কথা প্রকাশিত হয়েছে।

তপঃ জাউআর পর তার নিয়মাবলী পালনীয় কর্তব্য তপের উদাহরণ।

স্বাধ্যায়ঃ ধরম পূজায় 'মাহারাই' গিত এর নমুনা বহন করে। এর মধ্য আত্মঅধ্যায় বা আত্মপরিচয় হয়ে থাকে।

৩. আসন:

ঝাঁট দেওয়া, গোবর কুড়ানো, গোবর ঠেকা তোলা, মাথায়/হাতে জল বহন

করা, বাবু হয়ে বসে মন্ত্র শিক্ষা বা পূজা করা সবেই আসনের দৃষ্টান্ত।

৪. প্রাণায়াম:

উধোয়া গিত, চাঁচর গিত, ঘেরা গিত, ঝুমুর গিত শ্বাসবায়ু গ্রহণ করে কিছুক্ষণ পর প্রশ্বাস ত্যাগ যা 'পূরকের' দৃষ্টান্ত।

এড়েইআ গিতে এক কলি গাওয়ার পর শিল্পী ঘর খাবার খেতে চলে যায় যাতে শ্বাসবায়ু ত্যাগ করে কিছুক্ষণ শ্বাসবায়ু গ্রহণ করে না যা 'রেচকের' দৃষ্টান্ত।

৫. প্রত্যাহার:

একটি কুড়মালি আহনাতে কথিত আছে যে- "ধন জউবুন আড়াই দিন, নঅন ভইরে মানুষ চিন"। ধন ও যৌবন ক্ষণস্থায়ী। এগুলির প্রতি গর্ব বা মোহগ্রস্থ বৃথা।

৬. ধারণা:

করমগাছ, আখ গাছ, হাল পূজা, ডিনি আনা, গরাম থানে পূজা, পাহাড় পূজা ইষ্ট বস্তুর দিকে মন নিবিষ্ট করা।

৭. ধ্যান:

গরাম থানে লাইআর লোটন পড়া ও বারি পূজায় ঝুপার যা ধ্যানের দৃষ্টান্ত।

কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারা ও ন্যায় দর্শন:

মহর্ষি গৌতম ন্যায় দর্শনের প্রবক্তা। ন্যায় দর্শনের মূল গ্রন্থের নাম 'ন্যায়সূত্র'। 'ন্যায়' বিষয়ে অর্থাৎ জ্ঞানের পদ্ধতি সম্পর্কে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে 'ন্যায়শাস্ত্র' বলে। প্রমান সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে বলে ন্যায়শাস্ত্রকে 'প্রমানশাস্ত্র' বলে। আবার ন্যায়শাস্ত্র প্রত্যক্ষ, শব্দ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে পুনরায় আলোচনা করে তাই তাকে 'অন্বীক্ষিকি বিদ্যা' বলে।

সে যাই হোক, কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারা সঙ্গে ন্যায় দর্শনের প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ প্রভৃতি পদার্থের যোগ ও সাদৃশ্যতা বিদ্যমান। বিষয়টি গভীর গবেষণালব্ধ ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

এছাড়া প্রমেয় পদার্থের বারটির মধ্যে-শরীর, ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক), অর্থ (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ), বুদ্ধি (জ্ঞান), মন (অন্তরিন্দ্রিয়)। প্রবৃত্তি (কর্ম), দোষ (রাগ, দোষ ও মোহ), ফল, দুঃখ (সুখ-দুঃখ) প্রভৃতি প্রকটভাবে প্রতীয়মান যা সাংখ্য দর্শনের মধ্যেও গভীরভাবে বিদ্যমান।

কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারা ও জৈন দর্শন:

কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারার সঙ্গে জৈন দর্শন ও জৈন দর্শন সম্পর্কিত জ্ঞানবিদ্যা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। জৈন দর্শনে জ্ঞান দুই প্রকার। যথা-অপরোক্ষ ও

পরোক্ষ। অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান তিনপ্রকার। যথা- অবধি, মনঃপর্যায় ও কেবল; পরোক্ষজ্ঞান দুই প্রকার- মতি ও শ্রুতি। সুতরাং জৈনমতে জ্ঞান পাঁচপ্রকার- অবধি, মনঃপর্যায়, কেবল মতি ও শ্রুতি। উপরোক্ত জৈনজ্ঞানবিদ্যা নিম্নে আলোচিত হলঃ-

ক. অবধি: অবধি হচ্ছে আলোক দৃষ্টি বা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি। ইন্দ্রিয় মাধ্যম ছাড়াই অপরোক্ষ বিষয় জ্ঞান। জীব তার প্রচেষ্টার দ্বারা কর্ম-পুদ্গালকে কিছুটা নষ্ট করে কর্মের প্রভাব থেকে কিছুটা নষ্ট করে কর্মের প্রভাব থেকে কিছুটা মুক্ত হতে পারে ও ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যম ছাড়াই দুরস্থ দেশ ও কালের বস্তুকে সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ। সীমায়িত হওয়ার জন্য এপ্রকার আলোকদৃষ্টি (Clcirvoyance) 'অবধি' নামে পরিচিত।

যেমন- করম পরব কুড়মিসহ অন্যান্য খেরওয়াল ও হিতমিতান গুসটির মানুষজন না করলে যেমন ধীরে ধীরে সৃষ্টি বিনাশ হবে; অন্যদিকে সৃষ্টিশীল জিনিসের উৎকর্ষতা নষ্ট হবে। সুতরাং অনেক কাল পরে কোন্ ঘটনা ঘটবে তা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। আবার প্রাকৃতিক বস্তু (বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ, ফুল, ফল ও বীজ) প্রভৃতি প্রকৃতিবাদকে গুরুত্ব না দিলে একদিন প্রকৃতিই মানবসভ্যতাকে শিক্ষা দিয়ে চরমভাবে বিনাশ করবে।

খ. মনঃপর্যায়:

মনঃপর্যায় হচ্ছে অপরের মানসবৃত্তির অতীত ও বর্তমানের মানসিক অবস্থার, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক স্বরূপ হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি থেকে জীব মুক্ত হতে পারে ও তা ইন্দ্রিয় ছাড়াই। সে তার মনকে অপরের মনের সঙ্গে যুক্ত করে তাদের চিন্তাভাবনা, ব্যথা-বেদনা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করতে পারে। ইংরেজী শব্দে যা 'Telepathy' নামে পরিচিত। যেমন- পা চুলকালে কেউ উক্ত ব্যক্তির নাম করা বা বাম চোখ নাচলে কোন অমঙ্গলের ইঙ্গিত বহন করে। হাত থেকে ঘটি বা গ্লাস পড়ে গেলে কোন কুটুম বা আত্মীয়ের আগমন বুঝতে পারা যায়।

জৈন পুদ্গলবাদ (Jaina Atomism):

পুদগল এক প্রকার জড় ও অচেতন দ্রব্য। জড়ের দুটি অবস্থা- সূক্ষ্ম ও স্থূল। ক্ষিতি (পৃথিবী/বসমতা), অপ (জল), তেজ (সূর্য), বায়ু (বাতাস) নিরংশ কণা হচ্ছে সূক্ষ্ম জড় দ্রব্য। স্থূল জড়দ্রবঙ্গয যা অতিসূক্ষ্ম কণা দ্বারা গঠিত। স্থূল জড় দ্রব্যকে ক্রমাগত বিভাগ করতে করতে কোন এক পর্যায়ে এমন কতকগুলি অতিসূক্ষ্ম জড় কণা পাওয়া যায় যা ভাগ করা যায় না তা 'পুদ্গল' বা 'পরমানু' পরমানু নিরংশ, অচ্ছেদ্য, নিত্য ও জড়জগতের উপাদান।

পরমানুর মিশ্রণকে 'সংঘাত' বলে। দুটি পরমানুর মিশ্রণে 'দ্ব্যণুক' উৎপন্ন হয় যা ক্ষুদ্রতম সংঘাত নামে খ্যাত। পরমানুর মিশ্রণের ফলে স্থূল ক্ষিতি, স্থূল তাপ,

স্থূল তেজ ও স্থূল বায়ু উৎপন্ন হয়। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ প্রভৃতির সংমিশ্রণে জগতের উৎপত্তি হওয়ায় জগৎ ও এক সংঘাত মহাসংঘাত প্রতিফলিত। সংঘাত দ্রব্যের উৎপত্তি আছে আবার ধ্বংস আছে। পরমানুর মিশ্রণে তাদের উৎপত্তি ও পরমানুর বিভাজন বিনাশ আছে। জড় 'নিত্য অনু অবস্থা' ও 'অনিত্য অনু অবস্থায়' থাকতে পারে। জৈন মতে মন (Mind), বাক (Speech) ও প্রাণবায়ু (breath) পরমানু সংঘাত। কর্মও একপ্রকার অতিসূক্ষ্ম পুদ্‌গল বা জড়ানু। 'শব্দ' জৈন মতে পুদ্‌গল যা শৈব ধর্মের সঙ্গে গভীর সম্পর্কযুক্ত। কুড়মালি দর্শনে 'শব্দ' 'বঁগা' রূপে পূজিত যা শব্দব্রহ্মরূপে মহাশূণ্য আকাশকেও সূচিত করে।

এছাড়া জৈনমতে 'পঞ্চমহাবৃত'- 'অহিংসা', 'সত্য', 'অস্তেয়', 'ব্রহ্মচর্য' ও 'অপরিগ্রহ যা অঙ্গাঙ্গ যোগের উপাদান যা কুড়মালি দর্শনে গভীরভাবে ব্যক্ত। কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারা ও যোগ দর্শনের পয়েন্টে আলোচিত হয়েছে।

কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারা ও বৌদ্ধ দর্শন:

বৌদ্ধ দর্শনের প্রবক্তা গৌতম বুদ্ধ। তিনি নিজে দুঃখ নিবারণের জন্য মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছিলেন। দুঃখ, সমুদায়, নিরোধ ও মার্গ প্রভৃতি চারটি মহান সত্য বোধি বা সম্যকজ্ঞানের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। গৌতম বুদ্ধ আচার্য্য সঞ্জয়ের কাছ থেকে সাংখ্য দর্শনের পাঠ নিয়েছিলেন যখন তিনি উরুবিল্ব গ্রামে এসেছিলেন এবং সেই সঞ্জয় ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত 'সাংখ্যকারিকা' নামে পুস্তক অধ্যয়ন করেছিলেন। ঈশ্বরকৃষ্ণ আবার মহর্ষি কপিল রচিত 'সাংখ্য প্রবচন' গ্রন্থ পাঠ নিতে পাট ঝালদা (অধুনা রাঢ় কিন্তু বর্তমানে পুরুলিয়া) গ্রামে দীর্ঘ এক বছর কাল অবস্থান করেছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, গৌতম বুদ্ধের তত্ত্ব বা দর্শনের প্রধান ভিত্তি ভূমি 'সাংখ্য' দর্শন যার মধ্যে শিবকর্ত্তৃক প্রবর্তিত আচরণবাদ মিল যথেষ্ট মাত্রায় বিদ্যমান। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ দর্শনের তিনটি মূল উৎস— 'বিনয়পিটক', 'সূত্তপিটক', ও 'অভিধম্মপিটক' গ্রন্থে একইভাবে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচরণ, বুদ্ধের উপদেশাবলী ও দার্শনিক তত্ত্বের পরাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রভৃতিতে সাংখ্য দর্শনের উপাদানগুলির প্রভাব অতিমাত্রায় প্রকটিত হয়েছে। পাশ্চাত্যের জার্মানি দার্শনিক ম্যাক্স মুলার তাঁর "Studies in Buddhism" গ্রন্থে বলেছেন- "In onesense, every Indian Philosopher was an antheist, for they all perceived that the gods of the populace could not claim the attribute that belong to a Supreme Being (Absolute the Source of all that exists or seems to exit, Brahman). Kapila, when accused of denying the existence

of an Absolute Being. He is accused of denying the existence of an Ishvara." সুতরাং ম্যাক্স মূলারের উদ্ধৃতিতে মহর্ষি কপিল প্রণীত 'সাংখ্য' দর্শনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা সকলে জানতে পারি।

আবার বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ের দিকে তাকালে দেখতে পাব যে, বৌদ্ধ দর্শন দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল- ক. প্রাচীনপন্থী ও খ. নব্যপন্থী। প্রাচীনপন্থীরা বুদ্ধের নৈতিক অনুশাসন অবিকৃতরূপে অনুসরণ করার পক্ষপাতী ও অপরপক্ষে নব্যপন্থীরা নিয়মবিধি নমনীয় করার পক্ষাপতী প্রাচীনপন্থীদের মতবাদ 'হীনযান রূপে' ও নব্যপন্থীদের মতবাদ 'মহাযানরূপে' ব্যক্ত হয়ে আছে। হীনযান 'থেরবাদ (স্থবিরবাদ) ও মহাযান 'বোধিসত্ত্বযান' নামে পরিচিত। হীনযানরা বুদ্ধের ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশাসন পালন করতে আগ্রহী। হীনযানরা 'বস্তুবাদী' দর্শনে বিশ্বাসী কিন্তু পক্ষান্তরে মহাযানরা 'ভাববাদী' দর্শনে বিশ্বাসী। হীনযানদের মধ্যে- ১) বৈভাষিক ও ২) সৌত্রান্ত্রিক নামে দুটি সম্প্রদায় আছে। মহাযানদেরও দুটি সম্প্রদায় আছে- ক. যোগাচার/বিজ্ঞানবাদী ও খ. মাধ্যমিক/শূণ্যবাদী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মহাযান সম্প্রদায় গৌতম বুদ্ধের ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশাসন না মানলেও যোগাচার ও শূণ্যবাদকে গুরুত্ব দিয়েছে যা কুড়মালি দর্শনের লোকায়ত শিক্ষাধারার সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে। কুড়মালি ঝুমুরে এক জায়গায় 'শূণ্যবাদ' সম্পর্কে কথিত আছে যে—

"মহাশূণ্যে শূণ্যে ছিল
তাতে বিন্দু উপজিল"

আবার দুঃখ নিরোধ মার্গে যে 'অঙ্গাঙ্গিক মার্গ' এর কথা অর্থাৎ- ১. সম্যক্ দৃষ্টি, ২. সম্যক্ সংকল্প, ৩. সম্যক্ বাক, ৪. সম্যক্ কর্মান্ত, ৫. সম্যক্ আজীব, ৬. সম্যক্ ব্যায়াম, ৭. সম্যক্ স্মৃতি, ও ৮. সম্যক্ সমাধি। উল্লিখিত যা 'প্রজ্ঞা-শীল-সমাধি' রূপে বর্ণিত। 'প্রজ্ঞা' অর্থে 'জ্ঞান' ও 'শীল' অর্থে 'সদাচার'।

গৌতম বুদ্ধ দুঃখমুক্তি ও নির্বানের জন্য 'জ্ঞানমার্গ' ও 'কর্মমার্গ' দুটির সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। প্রকৃত সম্যক কর্ম সাধন না হলে প্রকৃত সম্যকজ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। সম্যক্‌জ্ঞান ও সম্যক কর্ম পরস্পরের পরিপূরক। 'সম্যকজ্ঞান' এর সঙ্গে ভক্তিমার্গ সংযুক্ত আছে। কুড়মালি সংস্কৃতির দর্শনের লোকায়ত শিক্ষাধারার 'করম' পরবে উল্লিখিত আছে যে—"ভাইয়েক করম বহিনেক ধরম" বিষয়টির তাৎপর্য এই যে, 'ভাই' (পুরুষের প্রতীক) ও 'বহিন' (প্রকৃতির প্রতীক) এর সম্মিলিতি প্রয়াসে 'কর্মমার্গ' ও 'জ্ঞানমার্গ' (যা ভক্তিমার্গের পরিপূরক) ক্রিয়াকান্ড সম্পূর্ণ হবে।

গৌতম বুদ্ধ 'অনাত্মবাদ'/নৈরাত্মবাদ' এক মধ্যপন্থা মতবাদ যার মধ্যে উপনিষদীয় 'আত্মতত্ত্ব' ও চার্বাক 'দেহাত্মবাদের' মধ্যবর্তী মতবাদ। প্রত্যক্ষ ও অনুমান

প্রমানবাদী বৌদ্ধ মতে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমানের দ্বারা সিদ্ধ নয় তাকে সত্তাবানরূপে স্বীকার করা যাবে না। 'চৈতন্যবিশিষ্ট' /'চৈতন্যস্বরূপ' আত্মা প্রত্যক্ষ প্রমান অথবা অনুমান প্রমানের দ্বারা সিদ্ধ নয়। সুতরাং উপনিষদীয় আত্মতত্ত্ব স্বীকার্য নয়। একইভাবে দর্শনে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহকেই 'আত্মা' বলা যাবে না। বুদ্ধদেবের মতে আত্মা বিশুদ্ধ চেতনা নয়, তেমনি আবার বিশুদ্ধ দেহও নয় কিন্তু মনের সংগঠন বা সংঘাত। 'অনাত্মবাদ' দুই প্রকার। যথা- ১. শাশ্বতবাদ ও ২. নাস্তিকবাদ। 'শাশ্বতবাদ' অনুসারে সত্তা (Being) স্থায়ী কিন্তু 'নাস্তিকবাদে' সত্তা বলে কিছু নেই যা সবেই অসত্তা। সবই শূণ্য। বুদ্ধদেব দুটি চরম মতের মধ্যবর্তী নিয়েছেন। তিনি বলেছেন সত্তা আছে (নাস্তিকবাদের বিরোধী) কিন্তু স্থায়ী দ্রব্যরূপে নেই (শাশ্বতবাদের বিরোধী)। কেবলমাত্র পরিবর্তনের ধারা বা প্রবাহ (Becoming) বিদ্যমান। সুতরাং 'রূপান্তরবাদ' এখানে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারা ও চার্বাক দর্শন:

কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারার সঙ্গে চার্বাক দর্শনের যথেষ্ট মিল বিদ্যমান। 'কুড়মালি সংস্কৃতির' দর্শন ও 'চার্বাক' দর্শন দুটিই 'প্রত্যক্ষ' প্রমান সাপেক্ষ। সুতরাং যথার্থ জ্ঞানলাভ বা পরোক্ষ জ্ঞানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অপরোক্ষ জ্ঞান-ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ (চক্ষু,কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) চার্বাক দর্শনের জ্ঞানলাভের পক্ষে সহায়ক। কুড়মালি অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি 'চড়ক' ও 'টুসু' না প্রত্যক্ষ করলে 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি'এর মিলন ও পৃথিবীর সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণ করবে কেমনভাবে তা উপলব্ধি হবে না। সুতরাং চার্বাক দর্শনের 'প্রত্যক্ষ' প্রমানের সঙ্গে কুড়মালি দর্শনের অটুট মেল বন্ধন বিদ্যমান। চার্বাক দর্শনে নির্বিকল্প' প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যার বিষয়ের নাম থাকে না অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষে কোন পদার্থের বিশেষ্য ও বিশেষণ বিষয় ব্যবহৃত হয় না।

আবার চার্বাক দর্শনের অধিবিদ্যা (Metaphysics) দুই ভাগে বিভক্ত। যথা-১. কার্যকারণবাদ(Theory of Causation), ২. জড়বাদ (Materialism)। বৈশেষিক দর্শনে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম পঞ্চভূত উল্লেখ আছে কিন্তু চার্বাক দর্শনে ক্ষিতি, অপ,তেজঃ , মরুৎ পঞ্চভূতের পরিবর্তে চতুর্ভুতের উল্লেখ রয়েছে। ব্যোম (আকাশ) অনুমানসাপেক্ষ। চতুর্ভুতের স্থূল অনু থাকলেও পরমানু নেই, কেননা পরমানু প্রত্যক্ষগোচর নয়। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ ও মরুৎ -এই চারটি মহাভুতের স্থূল পরমানু নিত্য ও অবিনশ্বর। এদের রূপান্তর আছে কিন্তু বিনাশ নেই। সুতরাং চার্বাক দর্শন কুড়মালি দর্শনের মত 'রূপান্তরবাদে' বিশ্বাস করে।

কুড়মালি ভাষা-সংস্কৃতির লোকায়ত ধারা দার্শনিক ও আধুনিক ধারণাসমূহ:

কুড়মালি ভাষা-সংস্কৃতির লোকায়ত ধারার সঙ্গে আধুনিক দার্শনিক ধারণা সমূহের মিল অনেকাংশে বিদ্যমান।

দর্শন বাদে কুড়মালি ভাষা-সংস্কৃতি প্রাণহীন। কুড়মালি ভাষা-সংস্কৃতি অতি প্রাচীন হওয়ার কারণে দর্শনের সঙ্গে ও দর্শনের অন্যান্য শাখার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ক. যৌক্তিক বিশ্লেষণ (Logical Analysis):

বারর্টান্ড আর্থার উইলিয়াম রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে একজন কৌশলগতভাবে বিশ্বের মৌলিক উপাদানগুলি শিক্ষার পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেছেন। "Principa Mathematica" গ্রন্থে রাসেল প্রমান করেছেন যে গণিত যুক্তিবিজ্ঞানের অংশ এবং ভাষার সঙ্গে গণিতের যুক্তিমূলক অবয়ব বিদ্যমান। সে যাই হোক, ভাষার অর্থ সুন্দরভাবে সুস্পষ্ঠ করতে গণিতের যুক্তির সাহায্যে দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে।

১. Logical Atomism :

এই দার্শনিক পদ্ধতিতে রাসেল পার্থক্য দেখিয়েছেন যে কিভাবে ক্ষুদ্র বাক্য ও অতি ক্ষুদ্র বাক্যের মধ্যে। অতি ক্ষুদ্র বাক্যে কোন অংশ থাকে না। অতি ক্ষুদ্র বাক্য থেকে যেমন- এবং, বরং, যদি প্রভৃতি সংযোগের সাহায্যে ক্ষুদ্রবাক্য সংগঠিত হয়ে থাকে। যেমন- 'মঁঞ জাম' (অতিক্ষুদ্র বাক্য) কিন্তু 'তঁই নিহি ত মঁঞ জাম' (ক্ষুদ্র বাক্য)। আবার 'অহবাটে জাঁই/ (অতিক্ষুদ্র বাক্য) কিন্তু 'অহবাটে জাঁই বনচুক কনঅ বাড়হাবাড়তি করে জাইস না' (ক্ষুদ্র বাক্য)। ক্ষুদ্র বাক্যকে খন্ড খন্ড করে অতিক্ষুদ্র বাক্য কুড়মালি ভাষায় সংগঠিত হতে পারে।

২. যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ/অভিজ্ঞতাবাদ (Logical Positivism/Empiricism):

আলফ্রেড জুলেস আয়াকে (১৯১০-১৯৮৯) 'যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ' বা 'যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদের' জনক বলা হয়ে থাকে। তিনি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও যুক্তির সাহায্যে সৃষ্টিতত্ত্বকে বর্জন করে ১৯২০ ও ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে ভিয়েনা সার্কেল গ্রুপের এক ঝাঁক দার্শনিক সমূহকে— মরিৎজ সিকলিক (১৮৮২-১৯৩৬), রুডল্ফ কারনাপ (১৮৯১-১৯৭০), হাবার্ট ফেজল (১৯০২-১৯৮৮), ফেলিক্স কফম্যান (১৯৯৫-১৯৪৯) অন্তর্ভুক্ত করেন। 'Language', ও 'Truth and Logic (1936)' আলফ্রেড জুলেস আয়ারের প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত গ্রন্থ। আয়ার যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদে/অভিজ্ঞতাবাদে প্রত্যক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেমন- কুড়মি জাতি কৃষিকাজের বীজতলা ফেলার ক্ষেত্রে রহিন পরের পর সাতটা 'ডা' মেনে চলে। এই 'ডা' চলাকালীন সুর্যের অতিবেগুণী রশ্মি মৃত্তিকার

উপর পড়ে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে। কুকুরকে খাবার দেওয়ার সময় 'লেলেলে, লেলেলে, লেলেলে', মুরগীকে দরা চাল (ক্ষুদ্রাকৃতি অবশিষ্ট দেওয়ার চাল) সময় 'তিতিতি, তিতিতি, তি তি তি' ও হাঁসকে ধান/ভাত প্রভৃতি খাবার দেওয়ার সময় 'কুডুকুডুকুডু, কুডুকুডুকুডু, কুডুকুডুকুডু প্রভৃতি ডাক দেওয়া হয়ে থাকে। এগুলি সবই 'যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ'/'আচরণবাদ' হিসেবে পরিগণিত। আশ্বিন মাসের অষ্টমী তিথিতে 'দেঁসাই'পরবে খেত জাগানোর সময় বলা হয়ে থাকে—

"ছোট বড় ধান ফুলউ
ছোট বড় ধান ফুলউ"

বিষয়টি 'যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ'/'আচরণবাদ' এর চরম দৃষ্টান্ত বহন করণ 'ধানকে' সাধারণভাবে ভাবা হয় না; পরিবারের সদস্যরূপে চিহ্নিত করা হয় ও সর্বোপরি একজন মানবশিশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়। মানব শিশু যেমন মাতৃ জঠরে প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুসামঞ্জস্যভাবে বিকশিত হওয়ার জন্য 'সধউড়ি' দেওয়া হয় তেমনিভাবে ধানের মধ্যে পূর্ণ রস চালের দানার মাধ্যমে পরিপক্কতা ও ধানগাছ থেকে জীবনীশক্তির সঞ্চার (পূর্ণ পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত) যা টোটেমিক কুড়মি জাতি কৃষিসভ্যতার সূচনার প্রথম থেকে আচরণবাদের মধ্য দিয়ে পূর্ণ মাত্রায় প্রতিফলিত করছে। টোটেমিক কুড়মি সহ অন্যান্য খেরওয়াল গুসটি (মুন্ডা, ওঁরাং, ভূমিজ, হো, ভীল, সাঁওতালি, খেড়িয়া) ও হিতমিতান গুসটির (তেলি, তাম্বলি, মুচি, ডোম, নাপিত, কামার, কুমার, তাঁতি, ধোপা, হাড়ি) 'বাঁদনা'/'সহরাই' পরবে অমাবস্যা তিথির সময় বিশেষ করে গরু, কাড়া, মহিষ জাগানোর সময় ঘাস দেওয়া হয়ে থাকে। তাৎপর্য এই য়ে কৃষিজীবি জীবজন্তু কৃষিকাজের জন্য সমান ভাগিদার। তাদের সাহায্যে কৃষির সূচনা ও পরিসমাপ্তি ঘটে অর্থাৎ তারাও আট আনার (৫০ শতাংশ) ভাগিদার। তাদেরকে স্নেহ করে বা আদর যত্ন করে পরিবারের সদস্যরূপে ভাবা হয়ে থাকে। মানবিকতার পরিচয় বহন করে টোটেমিক কুড়মি জাতির আচরণবাদের মধ্য দিয়ে যা এক চরম 'যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ'/'আচরণবাদ' এর দৃষ্টান্ত বহন করে। আবার 'বাঁদনা'/'সহরাই' পরবে অমাবস্যা কাটার পর 'গরইআ' অনুষ্ঠানটি পালনের সময় লাঙ্গল, মই, জুঁআল প্রভৃতি কৃষিপ্রযুক্তিগুলিকে পূজার মাধ্যমে শালুক ফুলের মালা দিয়ে মান্যতা দেওয়া হয়ে থাকে। কৃষিপ্রযুক্তি সহায়ক উপকরণরূপে ভাবা হয় তার মধ্যেও প্রাণ বা অস্তিত্ব আচে যা 'সর্বপ্রাণবাদ' (Animism) ও 'সর্বেশ্বরবাদ'(Pantheism) নামে পরিগণিত যা ব্রিটিশ নৃতাত্ত্বিক স্যার অ্যাডওয়ার্ড বারনেট টেলর (১৮৩২-১৯২৭) তাঁর "Primitive Culture" ও ব্রিটিশ গণিতজ্ঞ জোসেফ ব্যালফসন (১৬৪৮-১৭১৫) ১৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দে 'সর্বেশ্বরবাদ' (Pantheism) তাঁর বহুল প্রচলিত গ্রন্থ 'De Spatio Reali'

প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগের থেকে অর্থাৎ কৃষিসভ্যতার সূচনার সময়কাল থেকেই টোটেমিক কুড়মি জাতি তা মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে পৃথিবীর চেতন ও অচেতন সববস্তুর মধ্যে এক প্রাণময় সত্ত্বা আছে যা 'যৌক্তিক 'প্রত্যক্ষবাদ'/ 'অভিজ্ঞতাবাদ' এর চরম নিদর্শন।

কুড়মালি সংস্কৃতিতে লোকায়ত শিক্ষাধারা বিশেষ করে প্রথাবিধিমুক্ত (Non-Formal) ব্যবস্থা বেদশিক্ষার পদ্ধতি, টোল, পাঠশালা, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে পৃথিবীর শিক্ষা ইতিহাস জগতে এক আলোড়ন পূর্বক নজির ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিষয়টি যদিও বর্তমানে গবেষণার বিষয় কিন্তু তার প্রায়োগিক সূচনা কৃষিকেন্দ্রীক সভ্যতার পত্তনের শুরু থেকে বা কিছু কিছু উপাদানসমূহ প্রমান করে (লোকগীত, লোককথা) মানুষের আচরণবাদের সূত্রপাত সেই সঙ্গে দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রতিফলনের সীমা ৮,০০০ বছর আগে (পথ চলতে ইতিকথা- দ্বিতীয় খন্ড) কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারাতে জিহুড় (আশ্বিন সংক্রান্তির সময় থেকে রহৈন-১৩ই জৈষ্ঠ) পর্যন্ত অর্থাৎ উত্তরায়ণ কালের কয়েকটা দিনও দক্ষিণায়নকালের চার মাস ধরে সিদগুরু, জানগুরু ধরে ডান ভূত ঝাড়া, গোরু-কাড়ার ঔষধ, মানুষের ঔষধ প্রভৃতির শিক্ষা ধারাবাহিকভাবে এখনও চলে আসছে। সুতরাং বিধিমুক্ত শিক্ষার মধ্যে দর্শনের প্রত্যক্ষ (Perception), অনুমান (Inference) ও শব্দ (Testimony) গভীরভাবে মিল রয়েছে। ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ, প্রয়োগবাদ, মার্কসবাদ, মানবতাবাদ ও নব্যমানবতাবাদের প্রয়োগ প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যদিকে যৌক্তিক বিশ্লেষণ (Logical Analysis), যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ/ অভিজ্ঞতাবাদ (Logical Positivism/Empiricism) প্রভৃতি অতি আধুনিক দার্শনিক ধারণাসমূহের পাশাপাশি সাংখ্য দর্শন, যোগ দর্শন, ন্যায় দর্শন, জৈন দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন ও চার্বাক দর্শনের সঙ্গে কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারা সুন্দরভাবে ও সুনিপুণভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

*** তথ্যসূত্র:**

১. মাহাত কিরীটি ও মাহাত বিশ্বনাথ (২০২১), কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি, সারনা প্রিন্টার্স, পুরুলিয়া, পিন-৭২৩১০১।

২. মাহাত কিরীটি (২০১৪), সিন্ধু সভ্যতার ভাষা ও কুড়মালি, বি.টি. সরকার রোড, পুরুলিয়া, পিন-৭২৩২০১।

৩. মাহাত জ্যোতিলাল (২০১৫), সিন্ধু থেকে সুবর্ণরেখা, মিত্র প্রেস, কলকাতা-৯

৪. মাহাত বঙ্কিমচন্দ্র (২০০০), ঝাড়খন্ডের লোকসাহিত্য, ১৪-এ টেমার লেন,

কলকাতা-৭০০০০৯।
৫. ড. মাহাত নিমাইকৃষ্ণ (২০১৭), মানভূমের কৃষিসংস্কৃতি, সুকুমার গুপ্ত, নলেজ ব্যাঙ্ক পাবলিশার্স এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটরস্,৪১, বেনিয়াটোলা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৫
৬. মাহাত সঞ্জীব (২০১৪) কুড়মালি সংস্কৃতি ও সারনা ধর্ম এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক সমাজের উপর প্রভাব, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পিন-৭৪১২৩৫।
৭. শ্রী সরকার প্রভাতরঞ্জন (২০১২), প্রাউটের রূপরেখা, আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ, ৫২৭ ভি.আই.পি. নগর, কোলকাতা-৭০০১০১
৮. চট্টোপাধ্যায় সরোজ (২০০৯), প্রশ্নোত্তরে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের রূপায়ণ, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড, ৮/১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
৯. আচার্য্য অবধূত কীর্ত্যানন্দ (১৯৯২), রক্ত মৃত্তিকা রাঢ়ঃ ইতিহাসে ও সংস্কৃতিতে, আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ, কলিকাতা-৩৯
১০. Sethi Charu and Rani Pooja, UGC NET/SET (JRF&LS) EDUCATION Paper II & III, Arihat Publication Limited, Agarwal Road, Danya Ganj,New Delhi-110002
১১. মাহাত কিরীটি (২০১৫), জাউআ ডালি, বি.টি. সরকার রউড, পুরুইলা। পিন-৭২৩২০১
১২. মাহাত সমভুনাথ, বঁসরিআর শক্তিপদ ও মাহাত শশাঙ্ক শেখর (২০১৩), লতে লতে করম গিত, পশ্চিমবঙ্গ কুড়মালি অ্যাকাডেমি পাবলিকেশন, ওয়ার্কিং অফিস, বেগুনকোদর, পুরুলিয়া, পিন-৭২৩২১৪
১৩. মাহাত কিরীটি ও মাহাত রঞ্জিত কুমার (২০২১), অহিরা, সারনা প্রিন্টার্স, নর্থ লেক রোড, পুরুলিয়া, পিন-৭২৩১০১
১৪. মাহাত সমভুনাথ ও বঁসরিআর সকতিপদ (২০১৪), পুরখেনি সহরাই গিত, পশ্চিমবঙ্গ কুড়মালি অ্যাকাডেমি পাবলিকেশন, ওয়ার্কিং অফিস, বেগুনকোদর, পুরুলিয়া, পিন-৭২৩২১৪
১৫. মাহাত ছত্রমোহন (২০২২), কুড়মালি দাঁত কথা প্রবাদ প্রবচন, জি-৫, বিধাননগর, মেদিনীপুর-৭২১১০১

ইকোক্রিটিসিজমের আলোকে কুড়মালি সংস্কৃতি

মৃণাল কান্তি মাহাত

আন্তর্জাতিক সাহিত্য অঙ্গনে সর্বকনিষ্ঠ সাহিত্য আন্দোলন হল 'eco-criticism'. যা মানবিয় বিভাগের পঠনপাঠন, গবেষণা ও নতুন সাহিত্য সৃষ্টিকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। যে সমস্ত পন্ডিতগণ eco-criticism নিয়ে যুক্ত আছেন, তাঁরা মূলত একটা ত্রিমুখী আন্দোলন করছেন। প্রথমত, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকৃতির পঠনপাঠন, দ্বিতীয়ত, পরিবেশ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংম্পর্ক নিয়ে গবেষণা লেখা ও আলোচনা। সর্বশেষ হল, যে কোন উপায়ে পরিবেশকে বাঁচানো। অনেকেই 'eco-criticism' এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'পরিবেশবাদী পাঠ' বা 'বাস্তুতন্ত্রবাদ' কে গ্রহণ করেছেন। 'Eco-criticism' মানে সাহিত্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বা নৈসর্গিক রুপের বর্ণনা নয়, বরং যে সাহিত্য মানুষ এবং পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক, বাস্তুতন্ত্র, জীবজন্তু,পশুপাখির অবস্থা এবং আসন্ন প্রকৃতির দুরাবস্থা নিয়ে যারা আলোচনা করে, একমাত্র তারাই 'Eco-criticism' এ উত্তীর্ণ হতে পারে। আমরা দেখেছি, ছোটনাগপুরের টোটেমিক কুড়মীদের সঙ্গে প্রকৃতির একটা আলাদা সহাবস্থান রয়েছে। তাদের জীবনযাপন, সংস্কৃতি ও মননে এক উন্নত পরিবেশ চেতনা লালন করে, তাই এই প্রবন্ধে কুড়মীদের সংস্কৃতি 'বাস্তুতন্ত্রবাদ' এর আলোকে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

'Eco-criticism' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন William Rueckert তাঁর বিখ্যাত 'Literature and Ecology : An Experiment in Ecocriticism' নামক প্রবন্ধে। যদিও এর শিকড় রয়েছে প্রাচীন ইংরেজি সাহিত্যের 'nature poetry' তে। এই আন্দোলন আমেরিকায় শুরু হয় ১৯৮০ এর দশকে এবং ইংল্যান্ডে ১৯৯০ এর দশকে। Cheryll Glotfelty বলেছেন- 'Ecocriticism is the study of the relationship between literature and the physical environment. Just as the feminist criticism

examines language and literature from a gender- conscious perspective.

Eco- criticism এর প্রধান উদ্দেশ্য হল সাহিত্যে পরিবেশ এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্ক অনুসন্ধান করা। বিভিন্ন 'Text' এর মধ্যে পরিবেশমূলক এবং সাংস্কৃতিক 'Issues' গুলো তুলে ধরে প্রকৃতির প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল সমাজের একজন মানুষ প্রকৃতি এবং বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছে এবং তাদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গীই বা কেমন তা যাচাই করা।

আদিবাসী কুড়মিরা আপাদমস্তক একটা পরিবেশ সচেতন জাতি। এদের মূল আবাসভূমি হল 'শিখ শিখর নাগপুর' আধাআধি খড়গপুর।' সম্পূর্ণ এলাকাটাই বন জংগল, পাহাড়, ডুংরি, নদিনালা দিয়ে আবৃত। প্রকৃতির সঙ্গে এদের এক ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে। কুড়মিরা তাদের জীবিকার ব্যাপারে অনেকাংশে অরণ্যের উপর নির্ভরশীল। জঙ্গল থেকে শালপাতা তুলে এদের অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করে। পুরুলিয়া, ঝাড়খন্ডের বহু কুড়মি কেন্দু ও পলাশ পাতা তুলে বিড়ি তৈরীর কাজে যুক্ত আছে। তাই দেখা যাচ্ছে কুড়মিদের জীবন জীবিকার উপরে অরণ্যের অবদান সর্বাধিক। কুড়মিরাও এর প্রতিদানে গাছ, পাহাড়, নদীকে পূজা করে। বেলপাহাড়ীর একটি প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব সমৃদ্ধ অঞ্চল হল লালজ পাহাড়। যেখানে পাহাড় দেবতাকে নিত্য পূজো দেওয়া হয়। পুজো করেন লালজল গ্রামের লায়া রঞ্জিত মাহাতোর বাবা চুনারাম মাহাত। এছাড়া প্রতিটি গরাম থানে তো বৃক্ষদেবতাকে পুজা করা হয়ই। তাই দেখা যাচ্ছে কুড়মি সমাজ ও প্রকৃতির সম্পর্কটা একমুখী নয়, বরং প্রকৃতি ভালোবেসে উজাড় করে দেয় মানুষকে, অন্যদিকে কুড়মি সমাজ পুজা দেয় পরিবর্তে গাছকে।

'কলকা ফুল কলকা ফুল ফুটে লালে লাল গউ
ঝি ছানার মিছা জনম কাঁদছে অন্তর।'

(ঝাড়খন্ডের লোকসাহিত্য)

এই জাওয়া গীতটিতে ধরিত্রী মাতাকে একজন নারীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শ্বশুর বাড়িতে একজন বধূকে অনেক কষ্ট করে জীবনযাপন করতে হয়, সহ্য করতে হয় অনেক অত্যাচার। তেমনি এই পৃথিবী ধরিত্রী মাতাকেও অনেক অত্যচার, কষ্ট সহ্য করতে হয়। যা 'eco-feminism' এর বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা যেতে পারে। এই অনুষঙ্গ পাওয়া যায় আরেকটি জনপ্রিয় জাওয়া গীতে—

'একদিনকার হল' দ বাঁটা তিনদিনকার বাঁসি গ
মা বাপকে বল্যে দিবে বড় সুখে আছি।'

একজন নারী যেমন শ্বশুরবাড়িতে শত কষ্ট পেলেও বাবা মায়ের কাছে প্রকাশ করে না, তেমনি বসুন্ধরা শত অত্যাচার সহ্য করেও আমাদের ফুল, ফল দিয়ে চলেছেন। তার দুঃখ কষ্টের কথা কার কাছেই বা তুলে ধরবেন।

'কার ত বঠে ভালা বনজঙ্গল রে কার ত বঠে খেড় ঘাস।
কার ত বঠে ভালা ভৈস ধনির পাল রে ঠরকা ঠুকিয়ে বনে যায়।।
রাজার ত বঠে ভালা বনজঙ্গল রে পরজার ত বঠে খেড় ঘাস।
নন্দ গয়লার বঠে ভৈস ধনির পাল রে ঠরকা ঠুকিয়ে বনে যায়।।
কিয়া হইল ভালা বন জঙ্গল রে কিয়া হইল খেড় ঘাস।
কিয়া হইল ভালা ভৈস ধনির পাল রে ঠরকা ঠুকিয়ে বনে যায়।।
কাটে কুটে গেল ভালা বনজঙ্গল রে ডুঁড়কিয়ে গেল খেড় ঘাস।
মরে হারাই গেল ভালা ভৈস ধনির পাল রে ঠরকা ত রহলা টাঁগাই।।'

(ঝাড়খন্ডের লোকসাহিত্য-৮৭)

এই অহিরা গীতটিতে বন জঙ্গল এবং আরণ্যক পরিবেশ ধ্বংসের সুন্দর একটা ছবি তুলে দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত গীতটির কবি বন জঙ্গল, খেড় ঘাস, ঠরকার বিলুপ্তিতে কাতর হয়েছেন। মানুষের অত্যাচারে অরণ্যের বাস্তুতন্ত্র আজ বিপন্ন। অহিরা গীতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে পরিবেশ এর খারাপ অবস্থার কথা এভাবেই।

আর পাঁচটা আদিবাসী জনজাতির মতোই কুড়মিরাও টোটেমিক। এখনো পর্যন্ত কুড়মিদের ৮১টি গোষ্ঠীর খবর পাওয়া গেছে। প্রত্যেকটি গোষ্ঠিরেই নিজস্ব টোটেম বা চিহ্ন রয়েছে। এবং এই টোটেমগুলি নেওয়া হয়েছে পরিবেশের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব ও উদ্ভিদ থেকেই। যা 'Ecocriticism' এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি আদিবাসী গোষ্টীর মতই কুড়মিরাও তাদের 'টোটেম সিস্টেম' (গুষ্টি প্রথা) এর মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করে চলেছে। বোঝার সুবিধার জন্য কয়েকটা গোষ্ঠীর টোটেম ও ট্যাবু উল্লেখ করা হল। যথা-

গুষ্টির নাম	**টোটেম**	**ট্যাবু (নিষেধ)**
হিঁদইয়ার	কুঁচিয়া মাছ	হত্যা ও খাওয়া নিষেধ
মুতরুয়ার	মাকড়সা	হত্যা করা নিষেধ
সাঁখুয়ার	শাঁখ	শাঁখের জিনিস ব্যবহার নিষেধ
বঁশরিয়ার	বাঁশ	কাটা ও খাওয়া নিষেধ
পুনরিয়ার	পুঁই শাক	কাটা ও খাওয়া নিষেধ
কাটিয়ার	টসর	টসর এর জিনিসপত্র ব্যবহার নিষেধ

তাহলে দেখা যাচ্ছে কুড়মিরা টোটেম হিসেবে এই ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকায়

যে সমস্ত উদ্ভিদ, প্রাণী, সরীসৃপ ইত্যাদি পাওয়া যায়, সেখান থেকেই নেওয়া হয়েছে। এই টোটেমগুলিকে এক একটা গোষ্ঠী সংরক্ষণ এবং পূজা করে। সত্যি ভাবলে অবাক হতে হয় হাতি, বাঘ, বিড়াল, ময়ূর, কচ্ছপ, বাঁশ, পুঁই শাক এর মত পরিচিত জিনিস বাদ দিয়েও উঁই, ফড়িং, গেজর পোকা, সিকরা ইত্যাদি পশু, পাখি, গাছ টোটেম হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এক একটা গোষ্ঠীর শ্রদ্ধার আসনে থাকে। এভাবেই কুড়মিরা টোটেমের মাধ্যমে পরিবেশের গাছ, পশু, পাখিকে সংরক্ষণ করে আসছেন। 'Environmental ethics' অনুযায়ী কোন জীবজন্তু বা গাছপালা সে যতই তুচ্ছ হোক না কেন, তা যদি মানুষের বিন্দুমাত্র নাও কাজে আসে তাকেও সংরক্ষণ করতে হবে, তাকেও বাঁচতে দিতে হবে। এই পৃথিবীতে তারও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। কুড়মিরা তাদের টোটেম সিস্টেমের মাধ্যমে এভাবেই বিস্মৃতকাল থেকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবকে পালন করে আসছে।

বাঁদনা পরবের একটি গুরুত্ব পূর্ণ অঙ্গ হল জাগরণ। যা অমাবস্যার দিন প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে গিয়ে ঝাঁগেড়ারা জাগায়। অহিরা গীত সহযোগে ঢোল ও ধমসার বাজনায়। এই উৎসবের মাধ্যমে কুড়মিদের গৃহপালিত পশুদের প্রতি ভালোবাসার ছবি ফুটে উঠে।

'জাগ মা লছমিনি জাগ মা ভগবতী / জাগে তো অমাবস্যার রাত।
জাগে কা পতিফল দেবে মা লছমিনি/পাঁচ পুতায় দশ ধেনু গাই যে।'

এই গীতটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে বাঁদনা পরবের আসল তাৎপর্য। গৃহপালিত পশু এবং চাষীদের সম্পর্ক সুন্দরভাবে গানটার মধ্যে প্রকাশিত। লক্ষী এবং ভগবতী তাকেই সম্বোধন করা যায়। যার সঙ্গে সম্পর্কটা অনেক ভালোবাসার এবং গুরুত্বপূর্ণ। কুড়মিরা গরুকে পরিবারের অংশ হিসেবেই মনে করে। কুড়মিদের পরিবারে এবং অর্থনীতিতে গোরুর ভূমিকা অপরিসীম। গোরু ছাড়া কুড়মিদের পরিবার একসময় অচল ছিল। গোরুর সংখ্যা দিয়েই একটা পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা একসময় বিবেচিত হত। বলদ ছাড়া চাষবাসও অচল ছিল। জমিতে সার এর জন্য ও প্রয়োজন ছিল গোরুর। গোরু মহিষ মানুষের জীবনের প্রথম সম্পদ। তাই গোরুকে ভগবতী এবং লক্ষী বলে সম্বোধন করা হয়েছে। গোরুগুলিকে তাই লক্ষী এবং ভগবতী বলে উল্লেখ করা হয়েছে গানটিতে। একটা প্রাণীকে তা সে যতই গৃহপালিত হোক না কেন, তার লক্ষী বা ভগবতী বলে সম্বোধন করাটাই একটা বিশাল ব্যাপার। কুড়মিদের পশুপ্রেম যে কত আন্তরিক, তা এই গীতেই বোঝা যায়।

কুড়মিদের সবচেয়ে জনপ্রিয় গীত হল টুসু। জনপ্রিয় এই কারণে, অন্যান্য গীত গাইতে পারুক না পারুক, কুড়মিরা টুসু আর ঝুমুর একটা না একটা গাইতে

পাইরবেকেই। টুসুকে অনেকে মূর্তি পূজা ভেবে ভুল করলেও, টুসু আদ্যপ্রান্ত একটা প্রকৃতি এবং কৃষির উৎসব। 'Eco-criticism' প্রকৃতি এবং সাহিত্যের মেলবন্ধনের কথা বলে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে টুসু গীতের প্রায় সত্তর শতাংশ (আনুমানিক) গীতেই প্রকৃতির চিত্রকল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে। বর্তমানের কিছু গীত বাদ দিলে এবং প্রচলিত বেশির ভাগ গীতই মানুষ, প্রকৃতি এবং সমাজের মেলবন্ধনের কথা বলে। টুসু শুধুমাত্র জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত হিসেবে নয়, উৎকৃষ্ট সাহিত্য হিসেবেও স্বীকৃত।

'জল জল যে কর টুসু জলে তুমার কে আছে।
মনেতে ভাবিয়ে দেখ জলে শ্বশুর ঘর আছে।'

এই একটি জনপ্রিয় টুসু গীত। সাধারণত এটি একটি বিদায়কালীন গীত। আক্ষরিক ভাবে মনে হবে, টুসু যে ভাসানে চলে যাচ্ছে তারই একটি পরিপ্রেক্ষিত। 'Eco-criticism' এর দিক থেকে ব্যাখ্যা করলে এর অনেকগুলি অর্থ পাওয়া যায়। জল পঞ্চভূতের একটি অন্যতম উপাদান। জল ছাড়া প্রাণের উদ্ভব সম্ভব নয়। মৃত্যুর পর আমাদের দেহ জলে লীন হয়ে যায়। তাই তো হিন্দু সম্প্রদায়ের মূর্তি পূজায় সমস্ত দেবদেবীর মূর্তিকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। টুসু যদি এক সাধারণ মানবী হয়, তাহলে তাঁর মৃত্যুর কথায় বলা হয়েছে জলে চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। আবার অনেকে বলছেন, টুসু আসলে শস্য বীজ। চাষির ঘরে যতদিন থাকে তা হল শস্য অর্থাৎ বাপের ঘরে। বীজ যখন ক্ষেতে চলে যাচ্ছে এবং জলের সহায়তায় অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে, তখন টুসু শ্বশুর বাড়িতে চলে যাচ্ছে। এইভাবে টুসুর পুর্নজন্ম হয় বারবার।

যে সমস্ত গানে টুসুর রুপ বর্ণনা হয়, তাঁর বেশিরভাগ চিত্রকল্প উঠে আসে এই ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকার পরিবেশ থেকে।

দলমা পাহাড়ের উপর হাঁসা পাথর লড়ে গ।
আমার টুসুর গউর বরণ হেল্যে দুল্যে চলে গ।"

-এই গীতটিতে টুসুর গায়ের রঙ বর্ণনা করতে গিয়ে উঠে এসেছে 'দলমা পাহাড়', হাঁসা পাথর প্রভৃতি চিত্রকল্প যা এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশেরই অঙ্গ।

'Eco-criticism' এর উদ্দেশ্য হল প্রকৃতি এবং পরিবেশকে রক্ষা করা এবং প্রকৃতির প্রতি মূল্যবোধ গড়ে তোলা। কুড়মালি সংস্কৃতি টিকে রয়েছে পরিবেশ চেতনা ও প্রকৃতিবাদের উপর নির্ভর করে। কুড়মিদের যে বারো মাসে তেরো পরব রয়েছে, সবকটিই প্রকৃতি পূজার উৎসব। আখান যাত্রা তে কুড়মালি নববর্ষ থেকে শুরু করে রহীন, আমাবতী, করম, জিতিয়া, বাঁদনা, মকর সবকটিই প্রকৃতি পূজার উপর নির্ভরশীল। কুড়মিরা উৎসবের মাধ্যমে পরিবেশ চেতনার অনুশীলন ঘটায় নাগরিক দের মধ্যে। যেমন- রহিন পরবের প্রধান অনুষঙ্গ হল সর্পপূজা। পরবের

দিনে বাড়ির চারপাশে রহিন মাটির গন্ডী দেওয়া হয় অর্থাৎ বাড়ির চারকোণে মাটির ঢেলাগুলি রেখে দেওয়া হয়। যার অর্থ বাড়ির বাইরেই সাপের বাসস্থানের একটি উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা, যাতে তারা বাড়ি প্রবেশ করতে না চায়। এছাড়া রহিন, ডাক সংক্রান্তি, মাখন সংক্রান্তি ইত্যাদি দিনগুলোতে যদি বাড়ির ভিতরে বা বাইরে সাপ বেরোয় কোন কুড়মিই সে সাপটিকে হত্যা করেন না। বরং সাপটিকে নিরাপদে বাড়ির বাইরে বের করার ব্যবস্থা করে দেয়। এবং আসন্ন দিনগুলোতে পুজো দেওয়া হয় সর্পদেবতার নামে। এইভাবেই রহিন, ডাক সংক্রান্তির মত পরবগুলি মানুষের মধ্যে সাপের প্রতি ভক্তি হত্যা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

করম-জিতিয়ার মতো পরব মানুষের মধ্যে উদ্ভিদের প্রতি ভালোবাসা গড়ে তোলে। গাছকে কেন্দ্র করে উৎসব খুব কম জনগোষ্ঠীর মধ্যেই দেখা যায় পৃথিবীতে। কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষের করম গাছ দেখলেই তার মধ্যে করম বৃক্ষটির প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে। গাছ তো পরিবেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, সেই গাছকেই পুজো করা হচ্ছে ঈশ্বর মনে করে। এর চেয়ে বড় প্রকৃতি চেতনা আর কি হতে পারে। জিতিয়া পরবেও পূজা করা হয় একটি আখ গাছকে।

ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকায় যত কুড়মি গ্রাম আছে, প্রত্যেকটিতেই একটি করে গরাম থান অবশ্যই থাকবে। গরাম থান ছাড়া কোন কুড়মি গ্রামের অস্তিত্ব নেই। সাধারণত গ্রামের একপ্রান্তেই গরাম থান গড়ে ওঠে। যেখানে বড় বড় গাছ এবং ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ থাকে। আসলে যখন কুড়মি জনজাতির মানুষ গ্রাম পত্তন করেছেন, তখন প্রথমেই গরাম থান প্রতিষ্ঠা করে পুজো দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে জমি তৈরির কাজ শুরু করে। সারা গ্রাম জুড়ে বসত বাড়ি এবং জমি তৈরি করা হলেও গরাম থানের বেশ কিছুটা জায়গা গাছপালা, ঝোপঝাড় পরিপূর্ণ করে রেখে দেওয়া হয় আদিমতার স্মারক হিসেবে। কেউ কেউ বলেন গরাম ঠাকুরের বসবাসের জন্য গাছপালাগুলি অবিকৃত রেখে দেওয়া হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় এই অঞ্চলটিকে বলা হয় Sacred groves। এই পবিত্র থান অঞ্চলের গাছ কাটা নিষিদ্ধ থাকে। সাধারণত কেউ ঠাকুরের এলাকা বলে গাছগুলি কেটে ফেলে না বা ওই এলাকায় বসবাসরত পাখিদেরও কোন ক্ষতি করে না। গরাম থান অঞ্চলের Biodiversity খুবই সমৃদ্ধ হয়। ওই থান এলাকায় একটা অঞ্চলের সমস্ত ধরণের উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের এবং পাখিদের দেখা মিলতে পারে। তাই 'Eco-criticism' এ থানের গুরুত্ব অপরিসীম।

করম পরব হল কুড়মি সমাজ সহ এই ছোটনাগপুরের একটি বৃহৎ কৃষি উৎসব। পরিবেশ এর প্রধান উপাদান হল গাছ। শুধুমাত্র গাছকে রক্ষা করতে পারলেই বহু প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ecological Crisis) কে মোকাবিলা করা সম্ভব। গাছকে কেন্দ্র

করে বর্তমানে পৃথিবীতে বিখ্যাত সব পরিবেশ কবিতা (Nature text) লিখিত হচ্ছে। তো সেই গাছ যখন পুজো পায়, তখন তাঁর গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে যায়। করম গাছ এর ধর্মীয় গুরুত্ব কুড়মিদের কাছে অ পরিসীম হলেও, এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব ততখানি নয়। 'Eco-criticism' এর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল environmental ethics। যার মুল ভাবনা হল, কোন গাছ বা প্রাণী সে যতই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হোক না কেন, মানুষের কাজে লাগুক বা না লাগুক তারও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে এবং পরিবেশ এর বাস্তুতন্ত্রে তার সামান্য হলেও ভূমিকা রয়েছে। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে করম গাছ অর্থনৈতিক দিক থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ হলেও, কুড়মিরা এটিকে ঈশ্বররুপে পুজো করছে। যা পরিবেশ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, যদি সঠিকভাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রচার পায় এবং পরিবেশ কর্মীদের গোচরে আনা যায়। করম পরব ছাড়াও কুড়মিদের বিবাহ রীতিতেও বৃক্ষের গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পাত্র-পাত্রীর বিবাহের আগে পাত্রকে আমগাছের সঙ্গে এবং পাত্রীকে মহুল গাছের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। যা আমবিহা এবং মহুলবিহা নামে পরিচিত। তাই এই গাছগুলির প্রতি কুড়মি সমাজের একটা আলাদা আবেগ রয়েছে। এই গাছগুলিকে ছেদনের আগে অনেক ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেই তারা। কারণ এই গাছগুলিকে কুড়মি সমাজ আত্মীয় হিসাবে গণ্য করে।

কুড়মি সমাজে ঝুমইর গীতের গুরুত্ব অসাধারণ। ঝুমইর কে কুড়মিদের জাতীয় সঙ্গীত বলা চলে। ঝুমইর এর বিষয়বস্তু হল ছোটনাগপুরের জীবন, জীবিকা, সংস্কৃতি ও পরিবেশ। বেশ কিছু গীত রয়েছে যেগুলিকে এক একটা Nature text বলা চলে।

'ছুটুমুটু পাইখটি, হরইদ বনে চরে রে
'কন শালাঞ মারি দেল, কুহুর কুহুর করে রে।

(ঝুমুর পরিক্রমা, পৃষ্ঠা-৩৩)

উপরোক্ত এই গীতটিতে জঙ্গলের ছোট একটি পাখির প্রতি সহানুভূতি ব্যক্ত করা হয়েছে। গীতটির কবি শিকারীর দ্বারা আহত ছোট পাখিটির কষ্টে সেই অচেনা নিষ্ঠুর ব্যক্তিটিকে 'শালা' বলে সম্বোধন করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

"শাল কাঁদে পিয়াল কাঁদে কাঁদে মহুল বন
অযোধ্যা পাহাড়ে বসে কাঁদে হামার মন
তিরিঙ্গ রিঙ্গা গাছগিলা কথা থাইকে আইল্য
দেখাইল্য দেখাইল্য খেল বাবুরা দেখাইল।

(কবি-সুনীল মাহাত)

এই ঝুমইরটিও একটি 'পরিবেশ কবিতা' বলা চলে। কবি প্রথম লাইনেই বলেছেন, শাল বন কাঁদছে, পিয়াল গাছ কাঁদছে। কেন কাঁদছে কারণটা না বললেও, অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। শাল বন ও পিয়াল বন ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় কবির মনও কাঁদছে। অযোধ্যা পাহাড়ের আজকের এই পরিণতিতে কবির মনও কাঁদছে। এইজন্য কবি কিছু বহিরাগত মানুষকে দায়ী করছেন যাদের চক্রান্তে বনজঙ্গল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

"শাল মহুল সারি সারি / তর কলেই গো জনম লিলি।
গাছপালা মায়েরই সমান/গাছতলে গাঁয়েরই গরাম।'

বর্তমানের এই জনপ্রিয় গীতটিতে তো কুড়মিদের দর্শনেরই কথা তুলে ধরা হয়েছে। কবি এখানে বলেছেন গাছপালা মায়ের সমান, যা কুড়মিদের বিভিন্ন নেগাচারে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। গাছ এর ভূমিকা কুড়মিদের সংস্কৃতিতে কতখানি, তা আশাকরি সবারই জানা। গাছতলেই কুড়মিদের সবচেয়ে বড় দেবতা গরাম এর অবস্থান। কুড়মিদের যেকোন বিবাহ অনুষ্ঠানেও গাছের ভূমিকা আছে। 'আমবিহা' এবং 'মহুল বিহা' কুড়মিদের একটি বহুল চর্চিত সংস্কৃতি। যেখানে বরকে আমগাছের সঙ্গে এবং কনেকে মহুয়া গাছের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। গাছেদের সঙ্গে এই যে আত্মীয়তার ও ভালোবাসার সম্পর্ক 'Eco-criticism' এর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

'ডুংরি ডাহি বুদা পাহাড়/আর লালমাটির বনবাদাড়
সবন্নখা ডুলুং কাঁসাই ধারে/জনম ভূমির কলে জনম লিব বারেবারে।'

(কবি- তমাল মাহাত)

এই ঝুমুরটিতেও, 'Eco-criticism' এর নানা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। বর্তমান সময়ে শহরায়নের দাপটে ক্রমশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে গাছ, অরণ্য এবং ছায়া সুনিবিড় ছোট ছোট গ্রামগুলি। কিসের মোহে দলে দলে মানুষ গ্রাম ছেড়ে ভিড় জমাচ্ছেন শহরে। একতরফা অরণ্য, জলাশয় হত্যা করে শহরতলিতে নগর প্রসারিত হচ্ছে। সেদিক থেকে দেখতে হলে এই জনপ্রিয় ঝুমুর গীতটিতে কবি ডাহি, ডুংরি, বুদা, পাহাড়, সুবর্ণরেখা, কাঁসাই নদীর প্রতি তারা ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন। অরণ্য, পাহাড়বেষ্টিত এই প্রকৃতির কোলেই কবি বার বার জন্ম নিতে চেয়েছেন। যা অষ্টাদশ শতকের Return to nature কবিতার বৈশিষ্ট্য। বহু রোমান্টিক কবির 'Nature poems' এ এই আকাঙ্খা পরিস্ফুট হয়েছে। বিশেষ করে Shelley, Keats, Wordsworth প্রমুখ Romantician এর নাম উল্লেখযোগ্য।

কুড়মালি লিখিত সাহিত্যের ভাণ্ডার খুব একটা সমৃদ্ধ না হলেও, এর লোককথা, লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার অসামান্য। কুড়মালি রাতকহনীগুলি তো গীতে,

গল্পে পরিপূর্ণ থাকে। কুড়মালি রাতকহনী গুলির সঙ্গে রূপকথা ও পঞ্চতন্ত্রের গল্পের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এমন কোন কুড়মি মানুষ নেই, যিনি বিদুমুখীর গল্প জানেন না। সারা ছোটনাগপুর এর একটি বহুল চর্চিত লকচরিত্র হল 'বিদুমুখী'। যার দুঃখে প্রত্যেকটি কুড়মি শিশু কেঁদেছে ঠাকুমা, দিদামার কাছে গল্প শুনতে শুনতে। মূলত বৌদিদের হাতে বিদুমুখীর অত্যাচারের কাহিনীই এর বিষয়বস্তু। মা-বাপ হীন বিদুমুখী কে বৌদিদের কাছে রেখে সাত ভাই বাইরে চলে যায় জীবিকার প্রয়োজনে। সাত বৌদি ইচ্ছেমত বিদুমুখীকে অত্যাচার করে। একদিন হল কি ছেঁদা কলসিতে বিদুমুখীকে জল আনতে বলে বাঁধ থেকে। কিছুতেই জল আনতে না পেরে পুকুর পাড়ে বসে বিদুমুখী যখন রোদন করে, তখন তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে এক ব্যাঙ। যে ছেঁদার মধ্যে প্রবেশ করে বিদুমুখীকে জল আনতে সাহায্য করে। তেমনি বনের সাপ কাঠ বোঝার মধ্যে জড়িয়ে বিদুমুখীকে কাঠের বোঝা আনতে সাহায্য করে। অন্য একদিন, এক টুপা সরিষা বাঁহা বিলে ছড়িয়ে বিদুমুখীকে কুড়ানোর নির্দেশ দিলে দেখা যাচ্ছে, তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসছে একদল পায়রা। গল্পটির সারমর্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, বিদুমুখীর বিপদে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসছে পরিবেশেরই কোন না কোন জীব। অর্থাৎ, মানুষের অস্তিত্বের জন্য পরিবেশের সবকটা উপাদানকে বাঁচানো দরকার। সে যতই তুচ্ছ বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হোক না কেন। সবাই মানুষের বন্ধু। শিশুরা যখন এই গল্পগুলি শোনে, গল্পের বিশেষ মুহূর্তে এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবগুলিই তাদের কাছে 'হিরো' হয়ে ওঠে। যা শিশুদের মধ্যে ছোট থেকেই প্রকৃতি প্রেম গড়ে তুলতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। এরকম অনেক রাতকহনীতেই প্রকৃতি চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাইবেল এবং গ্রীক মাইথোলোজির মত কুড়মিদেরও নিজস্ব Myth of Creation রয়েছে। এই মিথ অনুযায়ী কুড়মিদের প্রথম মাতা পিতা হল রেঙ্গা বুড়া ও রেঙ্গা মাঈ। যাদের একটা সন্তানও জীবিত থাকে না প্রথমদিকে। জন্মে আর সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। তখন তাঁরা একটা করম বৃক্ষের তলায় বসে যখন কাঁদছিলেন, তখন করম গাছ তাদের আশ্বস্ত করে যে, এরপর সন্তান জন্মগ্রহণ করলে করম পাতায় শুয়ে দেবে, তাহলেই আর কিছু হবে না। এবং একে একে সন্তান জন্ম দেন রেঙ্গা বুড়া, রেঙ্গা মাঈ। তাহলে এখানেও দেখা যাচ্ছে কুড়মিদের জন্মবৃত্তান্তেও করম গাছের ভূমিকা। আসলে আদিবাসীদর বেশিরভাগ গীতি, গল্প এক একটা 'Nature Text'।

কুড়মিরা আদ্যপান্ত প্রকৃতি প্রেমিক। এরা গাছপালা, গোরু ছাগল, পশু পাখি নিয়েই সংসার করে। এদের সমস্ত উৎসবগুলিই প্রকৃতি আধারিত। ইদানীংকালে আদিবাসী কুড়মি সমাজের মত দুএকটা সংগঠন অরণ্য তথা শালজঙ্গল ধ্বংসের

বিরুদ্ধে জঙ্গল জিয়াও হামদুমির মত কর্মসূচী পালন করছে। তবে দুঃখের কথা বর্তমান প্রজন্ম বহুক্ষেত্রে তাদের উৎসব ও ঐতিহ্যের কথা ভুলে গিয়ে স্রোতে গা ভাসাচ্ছে। তবে আশার কথা সংখ্যাটা কম হলেও বহু ছেলেমেয়ে সমাজের কাজ করার জন্য এগিয়ে আসছে। তাদের হাত ধরেই কুড়মিদের পরিবেশ সচেতনতার ঐতিহ্য আরো বিস্তৃতি লাভ করবে।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থঋণ:

১) ঝাড়খন্ডের লোকসাহিত্য - বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত
২) ইকোক্রিটিসিজম ও বাংলা সাহিত্য- সুশান্ত মন্ডল
৩) 'Eco-criticism' Swarnalata Rangarajan.
৪) ঝাড়খন্ডের লোকভাবনা - বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত
৫) Laljol (Documentary Film), Mrinal Kanti Mahata
৬) ঝুমুর পরিক্রমা - কিরীটি মাহাত
৭) পিঁদাড়ে পলাশের বন - সুনীল মাহাত
৮) ঝুমরি - কিরীটি মাহাত

পুরুলিয়ার আদিবাসীদের বাঁধবিহা ঃ জলতন্ত্র সম্পর্কিত এক সমাজদর্শন

ড. নির্মল কুমার মাহাত

পুরুলিয়ার আদিবাসী মানুষেরা তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দিয়ে তৈরী করত পুকুর (বাঁধ), যা ছিল আসলে বৃষ্টির জলকে সযত্নে রেখে তার সুষ্ঠু ব্যবহার করার প্রয়াস। তাদের পরিবেশ কেন্দ্রীক জীবনযাপনে বাঁধ ছিল নিউক্লিয়াস। এই সমাজে পুকুর এক জীবন্ত সত্ত্বা, সেখানেই তার বেড়ে ওঠা ও বিবাহ। বর্তমান প্রবন্ধ সেই 'হৃদয়কে ছুঁতে চেয়েছে যার জীবন দর্শন জলের ওপর আধারিত, যে হৃদয় দেশের এই কোণা থেকে ওই কোণা পর্যন্ত নিজেদের শক্তি দিয়ে তৈরী করত পুকুর'।

সাহেব বাঁধ, অসুর বাঁধ, বারির বাঁধ- পুরুলিয়ার এরকম কত বাঁধ আদিবাসী সমাজকে সজীব সবুজ রেখে চলেছে কতকাল। 'বাঁধ' শব্দটি তো আসলে পুকুরকেই বোঝায়। বাঁধের জীবন শুধু সবুজ নয়, রঙীন। কোথাও সে দেবতা, কোথাও ভূত-প্রেতাত্মা। আবার কখনও সে কোন স্ত্রী বাঁধেরও স্বামী। বাঁধের এই যে নীরব যাপন তার বাঙ্ময় প্রকাশ ঘটে আদিবাসী সমাজ মননেই।

পুরুলিয়ার পূর্ব নাম মানভূম। কেবল আদিবাসী অধ্যুষিত নয়, জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ছিল এই জেলা।[১] দিকুদের থেকে দূরে পাহাড় জঙ্গলে ভূমিজ, কুড়মি, বীরহড়, খেড়িয়া, সাঁওতাল সহ কত আদিবাসী গোষ্ঠী নিরাপদে থাকতে চেয়েছে। প্রকৃতির কোলে লালিত তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। সহিষ্ণু মনোভাব নিয়ে তাদের এই যে বেঁচে থাকা তা এক সতন্ত্র সমাজ দর্শন তৈরী করেছে। তাদের আত্মপরিচয় তাই একান্তভাবেই বাস্তুতান্ত্রিক।

খাদ্যের জন্য কোন গোষ্ঠী সম্পূর্ণ নির্ভর করেছে জঙ্গলকেই, কেউ বা আবার চাষাবাদের উপর নির্ভরশীল থেকেছে। উঁচু নিচু ভূমির প্রকৃতি উপলব্ধি করে বৃষ্টির প্রত্যেকটি ফোঁটা জমা করেছে বাঁধ পুকরীর মধ্যে। পৃথিবী মায়ের শরীরকে সজীব রেখেছে এই জল। এই জল প্রবাহই তো এক জীবন। একে ঘিরেই রচিত হয়ে চলে

তাদেরও জীবন।

মা পৃথিবীর গর্ভ থেকে বাঁধের জন্ম। তারপর শিবের সঙ্গে তার বিবাহ। আদিবাসী তথা কুড়মি সমাজ মননে বাঁধ এক জীবন্ত সত্ত্বা। সাঁওতাল, ভূমিজ, কুড়মি ও হো গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ছিল বাঁধ বিহা বা বাঁধ বাপলা। কুড়মি সমাজে গ্রাম প্রধান বাঁধ তৈরীকে সৎ কাজই ভাবতেন। এই সমাজে বাঁধ হয়ে ওঠে এক বিশেষ গর্বের প্রতীক।

বাঁধ নির্মানে তবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে কড়ারা। উইলিয়াম উইলসন হান্টার তাঁদের পুকুর খননকারী[২] এবং কুপল্যান্ড তাঁদের মাটি খননকারী[৩] বলে বর্ণনা করেন।

কোথায় পুকুর তৈরী করলে ভূমিতে পতিত বৃষ্টির প্রত্যেকটি ফোঁটা জমা হবে, ভূ-গর্ভে প্রবেশ করে ভূ-গর্ভের জলের সমতা বজায় থাকবে- এসব জ্ঞানে সমৃদ্ধ বিশেষজ্ঞ ছিলেন সমাজে। তাঁরা এসে জায়গা দেখতেন। শৎ জায়গা পছন্দ তাঁদের। যেখানে ঢাল কম সেখানে পুকর তৈরীর ক্ষেত্রে এই উই ঢিবিই নির্দেশক।[৪] এইরূপ বিষয়ক জ্ঞানের (Biomonitoring) নিদর্শন মেলে ভারতের আদি ইতিহাসের কৃষাণ যুগে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী বরাহমিহির (৫০৫-৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দে) উই ঢিবির সঙ্গে ভূ-গর্ভের জলের সম্পর্কের কথা বলেন।

জায়গা নির্বাচন হয়েছে। আমন্ত্রিত মুদি মুদান। নতুন কাপড় পরে তৈরী কুলহির মুড়ায় গ্রাম প্রধান মাহাত। গাঁত, কোদাল, ঝড়া, বাহাং নিয়ে এগিয়ে চলে মুদি মুদান। গ্রামের আরও কত লোক বাদ্য বাজিয়ে খই ছড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। নির্বাচিত স্থানে পৌঁছে প্রথম চট্ দেন গাঁতে। মুদান ঝড়াতে ফেলেন মাটি। বাঁধ বা পুকরী তৈরীতে কড়াদের বিশেষ পারদর্শিতা, আল তৈরীতে তাঁদের ব্যবহৃত প্রযুক্তি বিদ্যাকেই নির্দেশ করে এই অনুষ্ঠান।

ঢালের বিপরীতে তৈরী হয় আল বা আইড়, পিরামিডের গঠন শৈলীর মতোই আলের উপর দিক ক্রমশ সরু হয়ে আসে। যে পথ দিয়ে জল প্রবেশ করে বাঁধে, তাই হল গড়ান। আর বাঁধের অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যায় উকানে। আল কতটা শক্ত, জল ধারণ কতটাই বা করতে পারবে- এনিয়ে স্বচ্ছ ধারণা ছিল বলেই তো সঠিক জায়গায় উকানের তৈরী। জলের ধাক্কা থেকে আলকে বাঁচানোর জন্য বসিয়ে দেওয়া হত চ্যাপ্টা পাথর।

ভূমির ঢালের প্রকৃতি নির্ধারণ করে আলের সংখ্যা। ঢালের ভিন্নতানুযায়ী Ontogenical শ্রেণী বিন্যাস তৈরী হত। এক আল বিশিষ্ট বাঁধ এক আড়্যা, দুই আড়্যা দুই আল বিশিষ্ট বাঁধ, তিন আল বিশিষ্ট বাঁধ তিন আড়্যা। মৃদু ঢালযুক্ত ভূমিতেই

সাধারণতঃ তৈরী হয় চার আড়্যা বাঁধ।[৫]

বাঁধের আল শক্ত রাখার জন্য রোপন করা হত বিভিন্ন গাছ। এইসব গাছ হল অর্জুন, তাল, তেঁতুল প্রভৃতি। ১৮৬৮ তে প্রকাশিত ভূ-তত্ত্ববিদ ও প্রকৃতিবাদী ভ্যালেন্টাইল বলের প্রবন্ধতেই এইসব গাছের নাম রয়েছে।[৬] উত্তর ও পশ্চিম দিকেই কেবল লাগানো হত বড় বড় গাছ। বাঁধের বাস্তুতন্ত্রের পর্যাপ্ত আলোর জন্য পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থাকত ফাঁকা।[৭]

বাঁধ তৈরী হয়ে গেলেই শুরু হয় বিবাহের বন্দোবস্ত। বাঁধের মালিক তাঁর সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের আমন্ত্রণ করতেন হলুদ সুপারি পাঠিয়ে, বিবাহে যেমন হয়ে থাকে।

এলাকার আমন্ত্রিত মুদিরা মহড়া পূজা করতেন। বাঁধের কোন এক স্থানে ধর্মঠাকুরের জন্য পায়রা, গাঁ গেরামের জন্য মোরগ সাঁঢ়া এবং বাঁধ কুদরার জন্য ভেড়া বলি হত। দেবতাদের সন্তুষ্টি, তাঁদের অনুমতি আদায়, নিজেদের মঙ্গল কামনা নিজেরাই করতেন। সাংস্কৃতায়নের সঙ্গে সঙ্গে কুড়মিরা এই ভার ব্রাহ্মণদের উপর অনেকে অর্পণ করেন।

বাঁধ বিহার দিন সর্বপ্রথমে হত একটা অনুষ্ঠান। মুদিরা নতুন ধুতি কাপড় পরে, নতুন কোদাল ঝড়া নিয়ে বাঁধের আল কাটত। বাঁধের মালিক তা বন্ধ করতেন। এই রীতির পুনরাবৃত্তি হত দু-তিন বার। বাঁধ 'আকাটা' থাকবে চিরকাল, তবেই না সে জীবন্ত। কাটা মানেই তো দুর্ঘটনা। মৃত্যুর দিকে যাওয়া। এখন তো প্রায় সব বাঁধ কাটা। আর তাই তারা কেউ বা মৃত কেউ বা মৃত্যুর পথযাত্রী। আকাটা বাঁধের জলছাড়া আগে গ্রাম্য কোন দেবতাই সন্তুষ্ট হতেন না। এইসব দেবতার অসহায়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এখন বাঁধের জীবনও অসহায়।[৮]

শুরু হয়েছে বিবাহের আয়োজন। বাঁধের গাভার ঠিক মাঝখানে খনন করা হয়েছে চকখাল। জল বেরিয়ে গেলেই এই চার কোণা খালটির খননকার্যের সমাপ্তি ঘটত।

চকখালের এক পাশে শাল কাঠ দিয়ে ছামড়াও তৈরী। বাবই দড়িতে আমপাতা গেঁথে বানানো বনমালাও টাঙ্গানো হয়েছে ছামড়ায়। ছামড়ার নিচে মহুল আর সিধা ডাল পুঁতে তার সঙ্গে বড় বেঁধে মাড়ুয়া খুঁটাও প্রস্তুত। চকখালের পাশে নিয়ে আনা হত চকখুঁটি।[৯] এর কারুকার্য অসাধারণ। চারটি বড় কোণের মাঝে আরও চারটি ছোট কোণযুক্ত এই খুঁটি সোজাভাবে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে সেজন্য তাকে বড় চার কোণা পাথরের মাঝে ছিদ্র করে ঢোকানো হত। খুঁটির উপরে লাগানো হত ত্রিশূল (চোখ)[১০] আসলে এটি যেন শিবলিঙ্গেরই অন্যরূপ।

সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গেই ছামড়াতলাতে দুটি ছিদ্রযুক্ত কলসি 'ঝারা' ও 'বারা' -র মধ্যে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় মাটির প্রদীপ। রাত্রে নতুন কাপড় পরে মাহাত-মাহাতান আর মুদি মুদান ছামড়া তলাতে বসে পড়তেন তালাই বা কাঁথার উপর। গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজন ও আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে শুরু হত 'মহুলবিহা'। নারী কণ্ঠে তখন বিহার গীত।[১১]

বাঁদানির পরেই চকখুঁটির পূজা। এই পূজার জন্য প্রয়োজন চকখাল থেকে নির্গত জলের। মুদি মুদান যেহেতু এই খালের খননকারী, তা খাল থেকে জল নেওয়ার সময় তাদের দিতে হয় উপহাররূপে গরু, চাল আর কাপড়। জল প্রদানের বিনিময়ে অন্ন বস্ত্র তথা বাঁচার যোগাড় পাওয়া। এই সম্পর্ক মৌলিক জিনিসকে নিয়েই, তার গুরুত্বকে সম্মান দিয়েই। জল ছাড়া যেখানে অন্ন নেই সেখানে জলের যোগানদার কত সম্মানীয়, সম্পর্ক কত গভীর ও মমতাময়।

চকখালের জল নিয়ে বাঁধের মালিক তৈরী করেন প্রসাদ। নিবেদিত হয় চকখুঁটার উদ্দেশ্যে দুর্বা ঘাস, হরিতকি, ধান, চাল। সেই সঙ্গে সাপ, ব্যাঙ, মাছ, শামুক, হাঙর, ঝিনুক ও কুমীরের মাটির বা রূপো পিতলের তৈরী প্রতিরূপ। চকখুঁটিকে চকখালে স্থাপন করা হয়।[১২]

এই অনুষ্ঠান আদিবাসীদের প্রকৃতি বিষয়ক বোধশক্তিরই প্রকাশ। তাঁরা জলের বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে বসবাসকারী সমস্ত জীব এবং গাছ-পালার মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত ছিলেন। শুধু মানুষ নয়, বাস্তুতন্ত্রের সমস্ত জীব সম্পর্কে সহিষ্ণু মনোভাব এক নতুন সমাজ মননকে স্পষ্ট করে। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই রয়েছে তার নিজস্ব গুন, তার মর্যাদা দেওয়ার ভাবনা গ্রীকদের গাইয়াকেই মনে করায়।

বিবাহের সারারাত জাগরণ। বাঁধের চার দিকেই কোথাও নাচনীর নাচ, আবার কোথাও বা নাটুয়াদের শক্তি প্রদর্শন। হঠাৎই বা হাজির ময়ূর পিঠে কার্ত্তিক। এরই মাঝে সারি সারি বসে ভোজ খাওয়াও সারা। রাধিকার নৃত্যে নেচে ওঠে মাদল।

এই নাচের লোভ পারেন কি সামলাতে সিঙ বোঙা। তিনিও হাজির। এদিকে তাঁকে দেখেই ছুটে আসে মুদি মুদান মাহাত মাহাতান আরও কতজন।

ঝারি বারি ছেঁদা হাঁড়ি মাথায় একেবারেই রেডি মাঝি-মাঝাইন/ মাহাত-মাহাতান। মুদি মুদান তখনই চকখালের জল ঢালেন ঝারি বারির হাঁড়িতে। চলতে চলতে ঘর যেতে যেতে জল যতই পড়ে ততই ঢালে। চকখুঁটায় বাঁধা সুতাও চলে এরই সঙ্গে। কিন্তু জল কি ফুরায়। কখনও না। বাঁধের জলও কি শেষ হয়। প্রাচুর্যে ভরা যার প্রাণ তার কি শেষ আছে!

এরপর বৈতরণী পার। বাঁধ গাভার কোন স্থান থেকে চকখাল পর্যন্ত এক

কৃত্রিম জল প্রবাহ তৈরী করা হয় চকখালের জল নিয়েই। এই প্রবাহ পার হয় গরুর লেজ ধরে ঐ মাহাত গুষ্টির সবাই। বিশ্বাস, স্বর্গে পৌঁছানো যাবে।[১৩]

বাঁধ কি শুধুই থাকে সমাজ মানসলোকে। নারী শরীরেও তার ফুটে ওঠা উল্কি হয়ে। সামান্য রেখাচিত্রে বৃহৎ জগৎ। তারা শাঁখা, মালা, পুকুরে বসবাসকারী জীব আর বাঁধের স্বামী শিব হাজির সেখানে।[১৪] তারা ও মালা তো জীবনের যুগন্ধির বন্ধন।

বাঁধের এই বিবাহ আসলে আদিবাসীদের জলতন্ত্র সম্পর্কিত সমাজ দর্শনেরই প্রকাশ। বাঁধকে জীবন্ত সত্ত্বা ভেবে তাকে সামাজিক আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে ফেলাই তো জল সংরক্ষণ ও তার ব্যবহার সম্পর্কিত মহান নৈতিকতা। আর এই নৈতিকতা তাদের একান্তই নিজস্ব। তাদের আত্মপরিচয়ের এক দিক জল বিষয়ক আত্মপরিচিতি।

আজকের পরিবেশবিদরা ভূগর্ভের জল ব্যবহার না করে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের জলের ব্যবহারের কথা বলেছেন, বহু যুগ আগেই যা আদিবাসীরা উপলব্ধি করেছেন। তাই তো বিবাহের সময় নির্মিত যে চক খাল তার ভূমিকা ভূ-গর্ভের জল ও ভূ-পৃষ্ঠের জলের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার। তাঁদের নির্মিত বাঁধ বৃষ্টির জলকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে, দেশীয় জীববৈচিত্র্যকে করেছে সংরক্ষণ। আর মাটি, ভূ-পৃষ্ঠ, ভূগর্ভ এবং আবহমন্ডল তথা মানবসমাজে জলচক্র সুষ্ঠুভাবে বজায় থেকেছে। বাঁধ তাই পরিণত হয়েছে মনোজগতের অন্যতম উপাদানে। বাঁধবিহা তাই আদিবাসীদের জলতন্ত্র সম্পর্কিত এক সমাজদর্শন।[১৫]

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

* এই প্রবন্ধটি Communique পত্রিকা, ১ম খন্ড, ২য় সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত করা হল।

(১) অধ্যাপক শুচিব্রত সেন, ইতিহাস বিভাগ, বিশ্ব-ভারতী, (২) অধ্যাপক সন্দীপ বসু সর্বাধিকারী, ইতিহাস বিভাগ, বিশ্ব-ভারতী, (৩) শ্রী অর্চন ভট্টাচার্য, (৪) হিন্দী কবি শ্যাম অবিনাশ, (৫) শ্রী অনুপম মিশ্র, পরিবেশবিদ।

তথ্যসূত্র:

১। Malik, K.C., 'A Contribution to the Flora of Purulia District', W.B. Surv. Ind. Vol.-8, No.-1, pp.45-49.

২। Hunter, W.W., Statistical Accounts of Bengal, Vol.-XVII. 1973 (reprint), p-303.

৩। Coupland, H., Bengal District Gazetter : Manbhum, Cal, 1911, pp.1-2.
৪। সাক্ষাৎকার ঃ শ্রী দুঃখিত রাম সহিস ও শ্রী নারানচন্দ্র মুদি, পুরুলিয়া জেলা।
৫। সাক্ষাৎকার ঃ শ্রী সৃষ্টিধর মাহাত, শ্রী দুঃখিত রাম সহিস ও শ্রী নারানচন্দ্র মুদি, পুরুলিয়া জেলা।
৬। Ball, V., 'Notes on the Flora of Manbhum', Journal of Asiatic Socitey of Bengal, 1868.
৭। সাক্ষাৎকার ঃ শ্রী বাবুরাম কিস্কু, সুড়া, পুরুলিয়া জেলা।
৮। সাক্ষাৎকার ঃ শ্রী শঙ্কর মুদি, ডাকাকেন্দু, পুরুলিয়া জেলা।
৯। Bodding, P.O., A Santal Dictionary, Vol.-1, P.-197, Reprint-1993, New Delhi.
১০। সাক্ষাৎকার ঃ শ্রী লক্ষ্মীকান্ত মুতরুয়ার, রাঁচী জেলা, ঝাড়খন্ড।
১১। সাক্ষাৎকার ঃ শ্রী শঙ্কর মুদি, ডাকাকেন্দু, পুরুলিয়া জেলা।
১২। সাক্ষাৎকার ঃ শ্রী দুঃখিত রাম সহিস, জামবাদ, পুরুলিয়া জেলা।
১৩। সাক্ষাৎকার ঃ শ্রী সৃষ্টিধর মাহাত, জামবাদ, পুরুলিয়া জেলা।
১৪। Mahato Nirmal. Kr., 'Bandhbiha (marriage ceremony of pond) of the Tribals of Manbhum : The question of Identity and its relation with the present day water crisis'. Presented at the International Seminar held on 26-27 Nov., 2005.
১৫। ঐ

সর-সগুনে বিহা

সিরিপদঅ বঁসরিআর

সারনা ধরমে কুড়মালি চারিঁই আর কুড়মি সমাজে আপন গুসটিক সঁগ আর আপন গুসটি নাম বাচিক গুসটিক সঁগ বিহাক চলন নেখেইক। উ-বিহাটাঁই খাটাবাড়হা হেইক নিঁহিঁ। কুড়মিক এহে চারকর অর উধনাইকন হালে বাছট গেআন মতে বর আর কেনিআঁইকর গাতেক লহু বিড়ন চার চালু হেলাহেইক।

আউতি মরসুমে চাসকাম বিরিতে ঢড়হা ভরাউঅন আহার দানা ধান দানা অরজেক খাতির ধান দানা বেটিকে অকর সঁইআঁ সঁগ জেনি মিলনে মিলাউএক খাতির অকর সসুর ঘার পাঠাউঅন রিঝে মাস-পিঠাক পরব মকর পরব বাসিলেই কুড়মি সমাজে কুটুম বেড়হাউঅন চার চালু আহেইক। অহে চার লাতাইড়ে কুটুম ঘার পরবি পঁহচাউঅন বতরে কাজাপ কনঅঁ কুটুম ঘারে বর বা কেনিআঁইকর লাইএক মানে পহনা উমেইরকর ছউআ নেজেইরে বাঝলে অহে ছউআক বাপকে বিহা ঘার ডউরেক খজ-পুছার লেথিন বা বিহা ঘার ডউরে গালসাল করত আর কাথা ফেঁকত।

কুড়মি সমাজে বিহা ঘার ডউরে বিরিত ধরি বিরিতালি অরে উঁগইত বা আগুআ-পাছুআ নিঁহিঁ রহত। আপন কুটুম-বাটুম, আপুস-পর, ফুল-পরান, হিত-মিতানেই উঁগইতকর কাম করত। উঁগইতে বরেক বাপকে কেনিআঁইকর টউআ দেইক আর কেনিআঁই ঘার ঝিঁকেইক। কুড়মি সমাজে কেনিআঁই টউরা বরেক বাপেক বিসবিসুআস কাম হেকেইক। কেনিআঁই বাপেক বর টউরা সমাজিআ টঁড়হা ভরা দস হেকেইক।

সারনা ধরমে কুড়মালি চারিঁই কুড়মি সমাজকর বিহা সর সগুনে বিহা কহালাহেইক। কুড়মালি চারিঁই কুড়মি সমাজকর বিহা সর সগুনে সগুন সাড়াটাক মানে সরেস কাম বা সুঘড় কাম (শুভকর্ম্ম)। বিহাক সভে নেগ-চার ভাঁজলে সলঅটালে ঢেইর সাঁগি নেগ-চার মানলে গানি বিহা সরেইক। মেনতুক সভে নেগ সভে চার সরেস নেগ-চারকর গেনতিঁই গেনাইক নিঁহিঁ। মর ঠাননে সর সগুন নেগ চারে বিহা

কাথাটাক উচরন অর সলকলাই পুরন। কলা করেই চাঁদে। আর সলকলাঁই পুরেই চাঁদ। চাঁদেক সঁগে কুড়মিক সভেলে ঠাঁউএক নাতা। কুড়মিক বুড়হা বাবাক মুড়ে চাঁদেক বাথান। আর কুড়মিক জিউ-জিনগানি পুহাউঅন ঠেইড় বুড়হাবাবাক গড়তর। আসাড় মাসেক গুরু পুরল চাঁদে চাঁদ সলকলাই পুরেই আর বিহাক বাঁধনে বাঁধালে গানি মানুআ সলকলাই পুরঅত। মর ঠাননে অহে অরে কাথাটা সর সগুনে বিহা কহালাহেইক। আর সলটা সগুন নেগ চারঅ বাছালাহেইক। বতরে সভে নেগ-চার লেইকুন তচবিচ হেতেইক গালমারা মারাতেইক।

কুড়মি সমাজে বেটাক বিহা করত আর বেটিকে বিহা দেথিন। বেটাক বিহা করা আর বেটিকে বিহা দেউআ টুমটাঁই মুড় টমড়াউলন। টমড়া মেনতুক মুড় নিঁহিঁ টুন টমড়া। কুড়মালি আহনাঁই কহালাহেইক “ধরি বাঁধি বিহা। মন সউদা সাঁঘা।” পুরখেইন বেরিআঁই পহনা উমেইরে মানে নিম জুআন বা দরজুআন উমেইরে বেটাকে বিহা করে বেটাক বাপ উটপুটাইহেলে। মেনতুক অহে উমেইরটা কুড়মি ঘারেক ছউআক হঁতে বাপেক অরজন খাইকে উদমা ঘুরিবুলি আইড় চড়ি হাগা উমেইর। বিহাক বেউরা থড়েই বুঝেই। বিহাক গালসাল গঁদরানি অনাউলেই পাড়ন পেঁদাই লুকান উমেইর তঅ অহে পহনা উমেইর। বেটাকে রিঝাই-বুঝাই বর সঁপড়াউহেলথিন। বেটিক উমেইর তঅ আরঅ থড়এক হেঁটবাটে রহেহেলেইক উ-উমেইরটা তঅ ছউআক হঁতে আম খাবে নঅ হঁ আর নিম খাবে নঅ তাউ হঁ করা উমেইর। বেটিক বাপে বেটিকে বিহা দেউআঁই বেটি বঝলে খালাস হেউআ হেকেইক। অহে অরে কুড়মি সমাজে সড়ঘড়িআ একটা কাথা চালু আহেইক বেটিকে বিহা দেউআ মানে বেটিকে ডাইর ধরাই দেউআ। বেটিক বাপেক বেটি বঝ বহেই বা উভেই বরে। বহা বা উভা সাড়ালে বিহা সাড়াটা সিরজালাহেইক। বেটিক বাপেক বেটি বঝ বহইআকে বর কথিক। বর সাড়াটা কুড়মালি ভাখিক সাড়া হেকেইক একর মানে সরেস (শ্রেষ্ঠ) বর কেনিআঁই নিঁহিঁ হেলে বিহা সাড়াটা ঠানাঁইক নিঁহিঁ। বর কেনিআঁই ছাড়ি বিহা সাড়াটাক আপন কনঅ চিনহাপ নেখেইক। অসনে বিহা ছাড়ি বর আর কেনিআঁই সাড়াদিঅক আপন কনঅ চিনহাপ নেখেইক। বেগর বর কেনিআঁইএঁ বিহা ঠানাইক নিঁহিঁ দসরবাটে বেগর বিহাঁই বর কেনিআঁই ঠানাত নিঁহিঁ। বিহাকে টানলে বর কেনিআঁই টানাত আর বর কেনিআঁইক টানলে বিহা টানাইক। ঢেঁসনাই কহা জাইক কান টানলে মুড় টানাইক আর মুড় টানলে কান টানাইক। বিহা আর বর কেনিআঁই সাড়াগিলি এসন লটপটানিঁই লটপটালাহেইক জাকর অর ফেড় নলা দাই। মেনতুক অর ফেড় তঅ বিসবিসুআস আহেইক। বেসসির উটকি ইঁচরি গঁ করে হেতেইক গমে হেতেইক। বচকালাহেইক বহা সাড়ালে বিহা সাড়াটা সিরজালাহেইক। টুঁড়হে হেতেইক বরে

কিনা বহেই আর কেনিআঁইএঁ কিনা বহেই। বিহাক বাঁধনে বর আর কেনিআঁই বাঁধাবাঁধি হেউআক বাটেলে বরে কেনিআঁইকর জিনগানি ভইরকর ঢড়হা ভরাউঅন বঝা বহেক আপাভার বহে হঁমান হেই। দসর বাটে কেনিআঁইএ বরকর জিনগানি ভইরকর জেনিমিলন (যৌন মিলন) ভুখ মেটাউএক আপাভার রহে হঁমান হেই। এহে ভুখ মেটামেটি হেউআ। বঝ আহেক আপাভার বহে হঁমান হেউআ বাটেলেই বিহা সাড়াক সিরজন।

সারনা ধরমে কুড়মালি চারিহি কুড়মি সমাজে বিহা চাইর খাঁধাঁই খাঁধালাহেইক। ঢেঁসনাঃ- ১) পিঁড়হা বিহা, ২) জুঁআঁইট বিহা, ৩) কাইরা বিহা, ৪) বেঁধ খাড়হি বিহা। এহে চাইর খাঁধাক বিহাই সড়ঘড়িআ হাঁড়ি বিহা কহাইক। আর হাঁড়ি বিহা নেগটা বিসবিসুআস মানি চলেহেইক।

১) পিঁড়হা বিহা: পুরখেইন পেরিআঁই বা বিতি পেরিআঁই কুড়মি সমাজে বেটা বেটিকে বিহা দেউআ থানিজ উমেইর রহেইক পহনা উমেইর (কিশোর বয়স)। পহনা উমেইরে বেটাবেটি মানসাত নিঁহিঁ মানে জুআন হেত নিঁহিঁ। বেটাক গাতে বুঁদ বা বরুম সঁসরেইক নিঁহিঁ আর বেটিক অরঅ ফুল ফুটেইক নিঁহিঁ মানে রজঅ সিনানে সিনাই নিঁহিঁ বাচিক করি জন কেনিআঁ ইটি রজঅ সিনানে বেগর সিনাল রহেইস অহে কেনিআঁইটিকে মউহা কাঠেক পিঁড়হাঁই গবচাইকন বিহা দেথিক। পিঁড়হাঁই গবচাইকন বিহা দেউআটাকে পিঁড়হা বিহা কথিক।

২) জুঁআঁইট বিহা: কুড়মি সমাজে বেটা বেটিকে বিহা দেউআ থানিজ উমেইর হেকেইক পহনা উমেইর। মেনতুক সমাজিআ বেজাঁই নিআঁর হাইহবড় রহাক হঁতে আর ভগবানকর মিলাউঅনে বতরকর আকরাঁই সভে ছউআক পহনা উমেইরে বিহা নিঁহিঁ সলগেইন। জন ছউআগিলিক পহনা উমেইরে বিহা নিঁহিঁ সলগঅলেইন উমেইর ডেগলেইন বাপ ঘারে মানসালা, রজঅ সিনানে সিনালা উ-ছউআগিলিকে মউহা কাঠেক পিঁড়হাক অজি মউহা কাঠেক জুঁআঁইটে গবচাইকন বিহা দেথিন। জুঁআঁইটে গবচাইকন বিহা দেউআটাকে জুঁআঁইট বিহা কহথিক।

৩) কাইরা বিহা: সারনা ধরমে কুড়মি সমাজে বেটি ছউআক আবগা একধাঁউ বিহা চলউএক হঁক আহেইন। একধাঁউ বিহা লেবাইএ অখর জিনগানিত ভইর কর কুঁআঁরিআনা ছিঁটেইন। কুঁআঁরিআনা ছিটলে সঁইআঁ পাউএক ডহর মুদাইক। সঁইআ পাউএক ডহর মুদালে মেহরারুক মাঁই হেউএক ডহরঅ মুদাইন। মেহরারু হেইকে জনমঅঁলাহি মাঁই হেউআ অকর ধরম হেকেইক হঁক আহেইক। ধরম ছাড়াউঅন, হঁক কাটা সমাজিআ দস হেকেইক। সমাজকে ঠিক ডহরে চালাউএক খাতির মানুআঁই সমাজিআ কানন বনাউঅত। মেনতুক পেরিআক পেরিআ জিউ সিরজন জরক

জরকাউতে রহা ভগবানকর কানন হেকেইক। অহে খাতির ভগবানে মরদ মেহরারুকে জেনি মিলনে মিলাউএক কাঁড় বিঁধতে আহেইন। অহে কাঁড় বানেক বিঁধনিঁই মরদ মেহরারু জেনিমিলনে মিলেলাই দাই গিরঅত কুদতে রহত। মরদ মেহরারু জেনিমিলনে মিললে গানি মেহরারুক মাঁই হেউএক ডহর খলাইন। কুড়মি সমাজে এহে সব ঠিক বেঠিক ধরম বেধরম হঁক বেগর হঁক সাত পাঁচ দাঁজি ভাঁজি রাঁড়ি-ছাড়ি সঁইআ হারা হলে মেহরারুক সঁইআ মিলাউএক অসারবিসার অইল ফইল ডহর বনাউলাক সাঁঘা। সাঁঘাক বাটেলে কুড়মি সমাজকর রাঁড়ি-ছাড়ি মেহরারুরাঁই আপন মন মউজি সঁইআ বাছিলেইকন সঁইআঁক সঁগ মিলঅহত আপন মেহরারু ধরম মাননি চলেক হঁকে হঁকদারি বনঅঁহত। কুড়মি সমাজকর কাইরা বিহা মুলে সাঁঘা হেকেইক। কাইরাক বিহাক কেনিআঁই কুঁআরি নিঁহিঁ রহেইস। রাঁড়ি নিহি তঅ ছাড়ি কেনিআঁই সঁগ কুঁআঁর বরকর বিহা হেউআটাকে কাইরা বিহা কথিক। একহেতু বিহউলিক সঁগ কুঁআঁরকর বিহা হেই নিহি পারেইক। বরকেউ বিহউলা হেইকন কুঁআঁর বাব ঘুচাউএ হেইক। অহেখাতির কেনিআঁই সঁগ মেলাউএক আগু বিহাক সভে নেগ-চার মানি চলি কুঁআঁর বরকে কাইরা গাছেক সঁগ বিহা দেলে পাছু কেনিআঁই সঁঘ সাঁঘা দেল বাটেলে বর কেনিআঁইকে মিলাউঅনটাকে কাইরা বিহা কথিক। মর ঠাননে সঁঘা সাড়াটালে সাঁঘা সাড়াটা সিরজালাহেইক। দুই বাটেক দুইটা উঁচা টুঁগরি বা পাহাড়কর মাঝেক গাভাটা সঁঘা কহাইক। রাঁড়ি বা ছাড়ি মেহরারুকরঅ একবাটে পাহাড় নিআঁর উঁচা সসুরঘার আর একবাটে পাহাড় নিআঁর উঁচা নেইহর। মেনতুক অঁই নেইহরকরঅ নাঁহি আর সসুরঘারকরঅ নহি দিঅক মাঝেক গাভটা হেকি। সঁইআঁ বাছন হঁকটা অকরে বরতালাহেইক। সঁঘাঁই সঁইআ বাছিলেহেইক অহেখাতির সঁঘা লে সাঁঘা হেলাহেইক। কুঁঅঁর কুঁআঁরিরা বিহাক হঁকে হঁকিঅতি হেকঅত। দসরবাটে রাঁড়ি রাঁড়া ছাড়ি ছাড়ারা সাঁঘাক হঁকে হঁকিঅত হেকঅত। মরদ মেহরারু এক খাঁধাক নিঁহিঁ হেলে মিলন হঁক জুটেইক নিঁহি। অহেখাতির কাইরা বিহা মাঁহাঁন বরকর কুঁঅঁরামি মেটাউএক খাতির সর সগুনে বিহাক সভে নেগ-চার মানি চলি পেহিল কাইরা গাছ সঁগ বিহা সরাউঅল পাছু সাঁঘাক কেনিআঁই সঁগ সাঁঘা দেইকন সাঁঘাক বর সাঁঘাক কেনিআঁইকে মিলাউঅনটাকে কাইরা বিহা কথিক।

৪) **বেঁধখাড়হি বিহা:** কাজাপ (যদি) কনঅঁ কুঁঅঁর বেটাছউআ কনঅঁ কুঁআঁরি বেটিছউআ বা বিহউলা বেটা ছউআ আর কুঁআঁরি বেটি ছউআ বা বিহউলি বেটি ছউআ আর কুঁঅঁর বা ডগুআ বেটাছউআ সমাজিআ বিহাক বাঁধনে বাঁধাইএক আগুই বেসবাসাবাসি হেইকন আপন ঘার ছাড়ি বাহরাই জাইকন দসর কনঅঁ ঠেহড়ে মাগ ভাতার ডুল ঘারকননা বাঁধঅত হেলে অখর দিঅ লককর বাপ ঘারকে আর অরাকে

দিঅ লককে সমাজে ছাড়এক কানন কুড়মি সমাজে চালু আহেইক বা অহে কানন বলে সমাজে অরাকে ছাড়থিন। সমাজে ছাড়অনিক চিপানিঁহি কচড়া চিপা চিপাইকন বাহরাই জাউঅইআ জাউঅনিরা আর খর দিঅকর বাপ ঘারেক লক দস মানে হঁমান হেইকন পরগনইত ঠিন জাইকন দস মানি লেত আর সমাজে উঠাউএক ডহরে ডহরত। পরগঅনইতে বাইসি কুটুমকে জানান দেইকন বাহরাইজাউঅইআরাকে সর সগুনে বিহা সরাউএক আড়াপাটা লেউএ হুকুমনামা দেইন। সমাজিআ টঁড় ভরিকন থানিজ দিনে সর সগুনে বিহা সরাউঅত। এহে বেসবাসাবাসি হেইকন টঁড় ভরা বিহাটাকে বেঁধখাড়হি বিহা কথিক।

সমাজিআ সরসগুনে বিহাক নেগ-চার বেগর মানি চলি বিহাক বাঁধনে বেগরবাঁধাইকন মাগ-ভাতার ডুল জিনগানি পুহাউঅন ডহর বাছি লেলা তঅ অখর অহে মিলন ডহরটাক নাম বেসবাসাবাসি বিহা হেইআ ঠিক রহেইক মেনতুক বিহাটাক নাম হেলেইক বেঁধখাঁড়হি বিহা। এহে নামটাক বাছট গেআন মতে ভাঁগান টুঁড়হিকন সমাজে পছড়ে হেতেইক পসরাউএ চাইড় আহেইক নিঁহিঁ হেলে সমাজে মানতেইক কাহে।

বনআঁ জিনগানি পুহাউঅন পেরিআঁই কুড়মিঁই বনে আইগ হুদকনি গমলরহত। বনে আইগ হুদকনিক হেতু গমলরহত। সটাসটি রহল দুইটা মরল গাছেক উজাড় হেইক। বনুআঁ পাইক পাখুড় পসু জানুআর পড়িকন মরি রহহত। অহে আইগে পড়ি মরল পসু জানুআরকর মাস কাঁচা মাসলে সাঁগি সউআদ তারকর হেইক। অহে নিআঁরে মানুআঁই পড়াউঅল মাস খাইলাই হিঁসকালা। অহে হিঁসকঅক হতে আইগ জরে সিখে দাইএ গিরলরহত। অরা তঅ দেখি সিখল রহত সুখল কাঠকে সুখল কাঠ সঁগ ঘঁসলে আইগ সলগেইক। আঁগুর নিআঁর মটা দুইটি সুখল কাঠি বা ঝুড়িকে বাছলেথিন। একটি কাঠিকে ঢাইড় বনাউলেথিক একটিকে সাঁড়হা বনাউলেথিক। ঢাইড়টিকে ভুঁইএ সুতাই দেইকন দুই সুড়িঁই দিঅগড়ে জাতলেথিক আর সাঁড়হাটাকে অকর উপর সজঅ ঠাড় করি দিঅ হাথে ঘুরাই ঘুরাই ঢাইড় আর সাঁড়হা ঘঁসাঘঁসি কলা আর আইগ সলগাউএ সিখলা। আইগ সলগাইকন পড়ল মাস খাই হিসকালা। এহে কাঠিঁই কাঠিঁই ঘঁসাঘঁসি করিকন আইগ সলগাউঅন টাকে বেঁধখাড়হি আইগ সলগাউঅন কথিক। কাঠেক আইগে কাঠ পড়ল ঢুল মরদ মেহরারু সমাজকে বেভরম করি বাদে সমাজকর হুকুমনামাই মাগ ভাতার ডুল জিনগানি বিতাউএক বতরে বতরানি বিহাটা বেঁধখাড়হি বিহা কহালাহেইক। বেঁধখাড়হিঁই আইগ সলগাউঅন বেঁহুটাকে বেঁধখাড়হিক আইগ বচকনিটা হালে কুড়মি সমাজে বা কুড়মালি ভাখিঁই বচকে নিঁহিঁ সুনাইক। বিচকুম অকর অজি কনঅঁ কনঅঁ মুলুকে আড়কাঠিক আইগ বা কনঅঁ

কনঅঁ মুলুকে কাঁড়কাঠিক আইগ বচকইতে সুনাইক। নামেক অলটগলট হেলাহেইক মেনতুক সারভার (উপকরণ) আর বেঁহঁক অলটগলট হেইক নিঁহিঁ।

কুড়মি সমাজে বেজাঁই নেগ-চার, বার-বিচ মানি চললেগানি, বেজাঁই নেতি-সারভার সঁপড়াউলে গানি সরসগুনে বিহা ঘার ডউরা হেই পারেইক। আড়কা লক আজবাঝাইকে ঢুসমি মরত। বঙ্গাব্দ খ্রীষ্টাব্দ বছর গেনতি মতে কুড়মিঁহি মাঘ মাসে বিহাঘার ডউরা বারন মানত। ডাক পুরুসেক কাথাঁই কহালাহেইক মাঘেক বহু বাঘ। ফাগুন মাসকর এঁধরিআ চউদঅ দিনিআঁ চাঁদে বুড়হাবাবাক বিহা। বুড়হাবাবাক বিহাক বাচিক দিনটাকেই শিব চতুর্দশী কথিক। বুড়হাবাবা বিহা বাসিঁহ গানি কুড়মি জাইতে বিহা ঘার ডউরেক আড়াপাটা করত। কুড়মি জাইত চইত মাসটা বুড়হাবাবাক জনম মাস মানত অহে খাতির চইত মাসেউ বিহা ঘার ডউরত নিঁহিঁ। ঠউকা কাথাঁই বাচিক করি কহা জাইক বইসাখ জেঠ এহে দিঅ মাস কুড়মি সমাজকর বিহা ডউরা মাস গনাইক। তাকেতুকে বতর বুঝি ফাগুনেউ কেউএ কেউএ পুচু করত।

বিহা আর বর সাড়াদিঅক উচরন অর গুড়িক ভাঁগান ভাঁগালাহেইক। মেনতুক কেনিআঁই সাড়াক উচরন অর গুড়িক ভাঁগাঁন আঁধারে আহেইক। অকে ফেইরছাউএক চাইড় আহেইক। কাহে ন কেনিআঁই নিঁহিঁ হেলে বিহা সরতেইক নিঁহিঁ। বর আর কেনিআঁইকর বিহা হেইন। অহেখাতির বাছট গেআন মতে কেনিআঁই সাড়াক ভাঁগাঁন ভাঁগেক কসনি করেক চাইড় আহেইক। বেটা ছউআঁই বা বরে সিরজন বুঁদ বা বিহিন বুনেক হঁতে বিহাক বাটেলে বিহিন গাড়হি ডুল কেনিআঁই বা বহু পাউএইক। কেনিআঁই হেলি বিহিন গাড়হি। বরে বিহিন গাড়হিঁহি বিহিন বুনিকন সিরজন জরক জরকাউতে রহেইস। অহেখাতির অঁই বর কহাইস। মেনতুক বিহিন বুনেক খাতির বিহিন গাড়হিক চাইড় রহেহেইক। বেগর বিহিন গাড়হিঁহি বরে বিহিন বুনত কাঁহাঁ। দসর বাটে আবগা বেটি ছউআ বা কেনিআঁই বিহিন গাড়হি বনেক হঁকে হঁকদারি হেকত। বিহাক বাটেলে বর সাজিকন বেটাছউআ বিহিন বুনেক হঁকে হঁকদার হেই অহে ডুল বিহাক বাটেলে কেনিআঁই বা বেটি ছউআ বিহিন গাড়হি বনেক হঁকে হঁকদারি হেত। অহে অরেই তঅ বিহা হেলেই বর আর কেনিআঁইকর চাইড় আর বর আর কেনিআঁই হেলেই বিহা। সিরজন তঁত টুঁড়হেইতকে কুড়মিঁহি সাবুত পাউলাহাত সিরজন অর সিরজন বুঁদ কেনিলে সিরজাইক। আঁইখে গমাইক নিঁহিঁ নিআঁর ছুটুলে ছুটু সভেলে ছুটু খাঁড়াকে কুড়মালি ভাখিঁহ কেনি কথিত। কেনি খুদি সাড়াগিলা কুড়মি সমাজে কুড়মালি ভাখিঁহ দমে চালু সাড়া হেকেইক। কেনিলে খাঁড়াইকন আর ছুটু খাঁড়াটাকে কেনি কথিত। কেনি আঁইখে গমাইক নিঁহিঁ, হাথে মানলু পাউআইক নিঁহিঁ। অহে অরে সিরজন সিরজইআ সভেলে ছুটু ছুটুলে ছুটু বুঁদটাকে সিরজন বুঁদ কথিত। অহে ছুটুলে ছুটু

সভেলে ছুটু সিরজন বুঁদ বহেক জেঁই হঁকদারি হেই অকে কেনিলে কেনিআঁই কথিক। আবগা বিহাঁইএঁ গানি বিহিন গাড়হি পাউআইক বিহিন বুনেক হঁকদার হেই পারাইক।

বর কেনিআঁই তই হেলা। বিহা সলগলেইক। এধাঁউ সরসগুনে বিহা সরতেইক। বর কেনিআঁই বিহাক বাঁধনে বাঁধাইকন সলঅকলাঁই জিনগানি পুহাউতা। জিনগানি সলঅ কলাঁই পুহাউএক হঁক বিহাক বাটেলে পাউআক খাতির বিহাক বাঁধনকে সর সগুনে বিহা কথিক।

বিহাক সর সগুন : (১) ছিপাচাউর বা গনাপড়হা, (২) রেবাইর বা বরতুক, (৩) লগন বাঁধা এইদবাস:- কুড়মি সমাজকর বিহা মাঁহাঁন এইদবাস দিনটা দমে ঝকঝলিআ ঝঁকমারিআ কামেক দিন গনাইক। সর সগুনকর সভেলে সাঁগি সগুনকাম এহে দিনে বিসবিসুআস সরাউএ হেইক। এহে দিনেক সভে কাম সরসগুনে গনাইক নিঁহিঁ মেনতুক কাম নিমটাউএ দাইএ গিরাইক। **টেঁসনা:** আড়পড়সি সভেকারাক বিহানেই ছামড়া বাঁধা পালহা লেইকন আনগাঁই টুঁসমত। দসরবাটে ভউজাঁইরাঁই বর ঘারে বরকে কেনিআঁই ঘারে কেনিআঁইকে করাঁইকরি আপন গুসটি ছাড়ি দসর গুসটিক তিন ঘারলে ধান ভিখ মাগাউথিন। অহে ভিখ মাগল ধানকে লড়হি পাটিঁই দড়রিকন আরুআ চাউর সঁগরাউঅত। আর অহে চাউরটাকে পানিঁই সেমাগিকন চুনি করঅত। অহে চুনিটাকে একটা পাতে মুহড়িকন পানিঁই সিজাউঅল পিঠা করঅত। ধবিন মাঁইএ অহে পিঠাক সঁগ তেল হেরেইদ মেসাইকন পাটিক উলটা পিঠে বসাইকন বর ঘারে বরকে কেনিআঁই ঘারে কেনিআঁইকে নাহাউএইন। এহে নেগটাকে (৪) ঘার ছাড়ি নেগ কথিক। সর সগুন সভে নেগ লেইকন বাদে সউআঁগ জখে তছবিচ হেতেইক। ইবেরা আবগা নেগগিলা উরুবুকার করাহেইক। দসরবাটে আনগাঁই ছামড়া বাঁধাল পাছু আজাবাপে মড়ই থানেক আগুবাটে মাড়ুআ বাঁধেই আর (৫) মাড়ুআ পুজা করেই। মড়ই থানেক দেহিনা হাঁথে গুঁগুবাপে নিঁহিঁ তঅ কাকাঁই (৬) পুঁড় খুখড়ি পুজা করেই। দসরবাটে ভউজাইরাঁই অদা উরিদ (বিরহি বা কলাই) লড়হি পাটিঁই পিসিকন অদউড়ি পাড়া নেগ সরাউঅত। অহে বেরাঁইএ নাউআ ঠাকুরে সিনেই সঁগরাউঅন খাতির বর ঘারে বরকে কেনিআঁই ঘারে কেনিআঁইকে নখ টুঁগান আলতা পিধাউঅন নেগ সরাউএই। নখ টুঁগেক বেরা বরকর বাঁউআঁ হাঁথেক কেনি আঁগুরকর নখে লহু বাহরাতেইক নিআঁর রিচিক গবচাইকন নখটি টঁগেইক আর নখলে বহি বাহরাল লহুটাঁই রিচিক মেহি সাফা চেঁথরা গাবাউএই। অহে লহুঁই গাবল চেঁথরাটা সিনেই কহাইক।

অহে সিনেইটা কাঁচা সারেই পাতে গুলপুটরাইকন হুসিআরে জগাউঅত। অহে একে বেঁহুঁই কেনিআঁইকরঅ সিনেই সঁগরাউঅত। সিনেই সঁগরাউএক বেরাঁইএঁ

বর ঘারে বরকে কেনিআঁই ঘারে কেনিআঁইকে মড়ই থানে পুরুব মুহে গবচাইকন ভউজাইএ হাঁথে আঁইখ ঢাপি আঁধা করেইন আর বুড়হাবাপ মাঁহাঁমাঁইকে সেঁউরাউথিন অহে বতরে নাউআ ঠাকুরকে বর কেনিআঁইকে উঁজরা ছাঁদা করাউএইন আর ছাঁদল উজরা ভরি উসনা চাউর একগাঁঠা হেরেইদ তিন লত দুব ঘাস, একটি হেইরলা ফর উঁজরাটাঁই দেইন আর রসে রসে উঁজরাটা খলাএইন উঁজরা খাল হেল বাদে ফেইর ঘুরিকন উঁজরা ছাঁদাউএইন আর অহে একে কাম করাউএইন। অহে নিআঁর অহে একে কাম তিনধাঁউ করাউএইন। এহে নেগটা সিনেই সঁগরাউঅন নেগ নামে চিনহাঁইক। নাউআঁ ঠাকুরে বর কেনিআঁইকর নখ টুঁগলেইন অরা তঅ ছুআইত হেলা। ছুআইত গুচাউএক খাতির নাহাই হেতেইন। অখর নাহান খাতির অখর আপন আপন ঘারে বহনইএ পখেইর কড়েই। বহনইকর কড়ল পখেইরে ভউজাইএ (৭) পখেইরে ঘাট বাঁধেই ঘাট পুজা করেই, পানি আনেই বাঁধল ঘাটে পাটিক উলটা পিঠে গবচাইকন নাহাউএইন। ঘার ঝিঁকেইন আর থুভড়া ভাত খাউআউএইন। থুভড়া ভাত খাইকন বর বিতি পেরিআঁই মামাঘারেক দেল বর পসাক পিঁধিকন বহনইকর করাঁই চড়হি আম মউরা খাউআউএ আম তর জাই। (৮) আম মউরা খাউআউঅন বা অমলঅ খাউআ, (৯) গুআটিকা, (১০) ডুভা ভাঁজন, (১১) হাঁড়ি বিহা, (১২) পিঁধান-অড়হান, (১৩) মহুআ মউরা খাউআউঅন, (১৪) সিঁদরাদান, (১৫) চুমান, (১৬) পরছন।

সরসগুন পছড়ালেইক। এধাঁউ বাচিক ধরি সগুনগিলা নেগ-নেতি, চারকর ভাঁগান আর সগুন সরাউএক চাইল-চলন লেইকন সউআঁগ জখে তচবিচ করেক কসনি করে ঠেসিঅ।

১। ছিপাচাউর বা গনা-পড়হা: সারনা ধরমে কুড়মালি চারিঁই বর কেনিআঁই মাগ-ভাতার জিনগানি পুহাউঅনকর আউতিবেরাক টঁগটাঁগ জানেক খাতির ছিপাচাউরকর বাটেলে তই তরা কুড়মি সমাজে চালু রহেইক বা হালেহুঁ রিচিক আধেক চালু আহেইক।
ছিপাচাউরকর সারভার: ধউঅল বিখরল একটা ছিপা মাজি ঘঁসি সাফসুথর একটা ঘটি মুনু পানি, মুনু সিঁদুর মুনু কাজর, তিনটা তুলসি পাত, তিনটা দুব ঘাস, একটি হেইরলা ফর, সেঁহরেই বা বঁদনা পরবে ঘারেক মুধেইন খুঁঠাই পিধাঁউঅল মেড়িঅর ধানকর নখে খঁটি ছড়াউঅল গটা দুইটা চাউর, দিআ ধুনা আইগ হেনতেন।
নেগকর করাকরন: মড়ই থানে বা তুলসি ঢিপে মড়লি দেউএ একঠিন গবর পানিঁই ধইকন সাফা করল পাছু দিআবরি ধুনা পড়াই বুড়হাবাপ মাঁহাঁমাঁইকে সেঁউরিকন সুধা ছিপাটা মড়লি দেউএকঠিন বেসসির বসাউএহেইক তাকর পাছু ঘটিক মুনু পানিটা ছিপাটাঁই ঢারে হেইক তাকর পাছু তুলসি পাতগিলা দুবঘাস গিলা হেইরলাফরটি ছিপাক পানিটাঁই ছাড়েহেইক। বরেক চিনহাপ বিহিন আর কেনিআঁইকর চিনহাপ ধরতিমাঁই

ঠানিকন একটা চাউরে বরেক নাম ধরি কাজর আর দসর চাউরটাঁই কেনিআঁইকর নাম ধরি সিঁদুর পিঁধাইকন ছিপাক পানিটাঁই ছউপলাউঅত। বিহাটা সগুনেক বিহা হেলে চাউরগিলা উপলাই পেঁইর একেঠিন সটেইক। আর বিহাটা বেসগুনেক হেউএক রহলে চাউরগিলা পেঁইরি পেঁইরি ফারাক বাটে ফরকেইক সটেক নিঁহিঁ। বিহাটা সগুন-বেসগুন মেসামেসি হেউএক রহলে চাউরগিলা ফরকি ফরকি পলমে (দেরীতে) সটেইক। বিতি পেরিআঁই এহে ছিপাচাউরকর বাটেলে কুড়মি সমাজে বর কেনিআঁইকর গনা-পড়হা তই করেক করা করন করেহেলা।

২। রেবাইর বা বরতুক: রেবাইর বা বরতুক সাড়াদিঅক ভাঁগান মাঁহাঁনে অহে সগুন কামেক করাকরণ টুঁড়হাইক। **টেঁসনা:**- রবঅ করা সাড়াটালে রেবাইর সাড়াক সিরজন। কুড়মালি ভাখিঁই রবঅকরা মানে পাহুড় করা বা হারাউঅন (পরাজয় করা)।

বরতুক: বর আর তুক দিঅ সাড়া একধাঁউরিঁই সঁঝড়ানে বরতুক সাড়াটাক সিরজন। বর সাড়াটাক মানে সার বা সরেস আর তুক সাড়াটাক মানে হাদলাউঅন বা হাসিল করা। বিহাক নিআঁর সগুন কাম হাদলাউঅন তঅ একধেরিআ কাম নহেইক। বরেক বাপেক মতেক সঁগ কেনিআঁই বাপকর মত একমত হেলেগানি বিহা সলগেইক। বরেক বাপ বেড়কাঠি একবাটে ফরকত আর কেনিআঁই বাপ বেড়কাঠি দসর বাটে ফরকঅলে বিহা কবউ সলগেইক নিঁহিঁ। বরেক বাপ আপন হিতমিতান পাঁচ কুটুম লেইকন কেনিআঁই ঘারে কেনিআঁই বাপকর হিতমিতান পাঁচ কুটুম সঁগএক সঁগে বসিকন সলহা সহমতে কেনিআঁই পন ছিটাউঅন কেনিআঁইকর পিঁধান অড়হান অমলঅ খাউআ সাড়ি হেনতেন সভে নিআঁর দেনা পাউনা ছিঁটাউঅন গটা করাটাকে বরতুক কথিক। বরেক বাপ ডঁগইত বা আগুআ পাছুআ আর কেনিআঁই বাপ একঠিন একসঁগে গবচিকন বরতুককর দিন থানিজ করঅত আর অহে থানিজ দিনে বরেক বাপ আপন হিতমিতান পাঁচ কুটুম জহড়াইকন কেনিআঁই ঘার পঁহচেই। রেবাইর বা বরতুক সগুন নেগটা কেনিআঁই ঘারে সরাউএক নেগ হেকেইক।

রেবাইর বা বরতুককর সারভার: বরেক বাপেক মুহাউএক সারভার- কেনিআঁই সাজাউঅন সভে নিআঁর লুগাফাটা, তেল সাবুন, আড়সি কাঁকই, ফিতা, আলতা, কাজর হেনতেন। আর কেনিআঁইকে চুমাউএক খাতির জাঁগড়া জখে এক থান গহনা। কেনিআঁই বাপকে মুহাউএক সারভার- নাউআ থারি আরুআ উসনা দিঅ নিআঁর চাউর হেরেইদ গুঁড়ি, গুআ, হেইরলা ফর, দুব ঘাস, দিআ, ধুনা হেনতেন।

নেগকর চলন: সলহাসহমতে সভে নিআঁর গালমারা ছিঁটাউঅন পাছু মড়ই থানে কেনিআঁইকর কাকি নিঁহিঁ তঅ দিদি নিঁহিঁ তঅ ফুঁফুঁই চউক পুরেই। ভউজাইএ ঘটিঁই পানি লেইকন পানি টিপকাই কেনিআঁইকে মড়ই থান বাহরাউএইক আর সারেই

পতরিক উলটা পিঠে পুরল চউটাক উপরে গবচাউএইক আর আঁহুদেহিনা বাটে গবচেই। হালে বরেক কাকা কেনিআঁইকে চুমাউএক খাতির আইকন দিআ বরেইক ধুনা পুড়াউএই আর জাঁগড়া জখে কেনিআঁইকে গহনা পিঁধাউএইক আর ঘটিক পানিটা বাঁউএঁ দেহিনা গিরাউএই আর আরুআ চাউরে দুব ঘাসে কেনিআঁইকে চুমাউএইক। আসিস দেইক। এহে চাইলে কেনিআঁইকে পতউহু মানে হঁমান হেই। তাকর পাছু কেনিআঁই চউকটাকে আড়াই বেড়া বেড়িকন ভউজাইএ কেনিআঁইকে ঝিঁকেইক। অহে বেরাঁইএঁ কেনিআঁইক কাকা চউকটাকঠিন আউএই আর বরেক কাকাক মুহামুহি সারেই পতরিক উলটা পিঠকে বসনা করি গবচেই। বরেক কাকা কেনিআঁইকর কাকা গড় ধউআ ধউই হেত গুলাজ ফুলেক মালা অদলবদল করি হাঁথ ধরাধরি হেইকন ঠড়হুআত। পাঁচ কুটুম অখর হাত ধরাধরি হেউএক হেতু সুধিআউথিন। জবাবে বরেক কাকাঁই কহেই মঁই বেটা হারেহেঁই দসর বাটে কেনিআঁইকর কাকাঁই কহেই মঁই বেটি হারেহেই। এহে হারাহারিক বাটেলে দিঅ লকে তঅ পাউঅত। বরেক কাকাঁই বেটা হারিকন বেটি মানে পুতউহু পাউএক দসর পাটে কেনিআঁইকর কাকাঁই বেটি হারিকন বেটা মানে জাঁউআঁই পাউএক। এহে পাউআ পাউআ পাউই রিঝে হামরা হিআখালাস হিআঁই হিআ মিলাউএ হাত ধরাধরি হেইকে ঠুঁড়হুআলাইহ কহিকে ভেট আঁকাইড়ে আঁকড়াআঁকড়ি হেত। বেটা হারা বেটি হারা মানে বরেক কাকাঁই কেনিআঁইকর কাকাকে রবঅ করলেইক কেনিআঁইকর কাকাঁই বরেক কাকাকে রবঅ করলেইক। অহে রবঅ করাকরি হেল বাটেলেই নেগটাক নাম রেবাইর হেলাহেইক। রেবাইর চুকঅল বাদে খাউঅন ধউঅনকর ঘটি নাভাউঅন। কুড়মি ঘারে রেবাইর ভজ মানে ঘারে অরজন উরিদ/বিরহি/ কলাইকর দাইলে পতেইরলে বহি বাহরাতেইক নিআঁর লথলথিআ দাইল আর ঘার পসুআ ঘাসিক দনা ভরতি অরসন পরসন মাঁস। একরবাদে বিদাই বেরাঁই কেনিআঁই বাপে বরেক বাপকে কাটল খাসিটাক চেড়ু দেইকন বিদাই দেইন। কুড়মি সমাজে রেবাইরে আর বিহাঁই কেনিআঁই বাপে বরেক বাপকে কাটল খাসিক চেড়ু আর বঁহরতে বরেক বাপে কেনিআঁই বাপকে কাটল খাসিক মুড়ি দেউআ চার চালু আহেইক। পহনা উমেইরে বেটাবেটিকে বিহা দেউআ আর রেবাইর বিহা আর বঁহরতে চেড়ু মুড়ি দেউআ দেউইক হঁতেই কুড়মি সমাজে দগলামু সামাইক নিঁহিঁ। লহুক সরেসানি হালেহুঁ বলবত আহেইক। কেনিআঁই বাপে চেড়ু দেউআটা ইজজত দেউআক ঠিরিআনি হেকেইক। কেনিআঁই বাপে চেড়ু দেইকন বরেক বাপকে ইজজত দেল ঠিরিআনি বিরিআউএইক। দিঅ চেড়ুক মাঝে মেহরারুকে ইজজত রহেইক। অহে অরে চেড়ু দেউআক মানে ইজজত দেউআ। বরেক বাপে কেনিআঁই বাপকে বঁহরতাঁই মুড়ি দেউআ মানে বরেক বাপে কেনিআঁই বাপকে জবাবে ঠিরিআউএইক

তর দেল ইজজত মানঅঁত মেনতুক ইজজত লুঠনি সহত নিঁহিঁ। লুটইআকে জহতে রহথিক বদলা বিসবিসুআস ঘুরাউথিক। অহে অরে আহনাঁই কহালাহেইক "আহি মনে মারবঁ বনে"। তই মর কুল লুটলাহিস। মই তর জিউ লুটবঁ। তর মরদাঁগিটা গুসড়াই ছাড়বঁ।

৩। লগন বাঁধা: লগন বাঁধা মানে বিহাক লাঘাইর ধরানা লগন বাঁধা দিনলে বর ঘারে বরকে কেনিআঁই ঘারে কেনিআঁইকে হেরেইদ তেল মাখাউঅন উচরেইক। নিতে নিতে বেরা ডুবল বাদে আপন ঘারে বিআরি খাইকন (সান্ধ্য ভোজন সেরে) ঘার বাখেইর আড় পড়সিক বেটি ছউআ বর ঘারে বর ঘারেক আনগাঁই কেনিআঁই ঘারে কেনিআঁই ঘারেক আনগাঁই জহড়িকন বিহাগিত গাহিকন আউঅল উঠাউঅত আর ডমকচ নাচ নাচিকন আনগাকে ধুরা ফুটাই দেথিক। অহে অরে আহনাঁই কহালাহেইক "বিহাকলে হুব নিঁহিঁ আর মরনলে সক নিঁহিঁ।" দসর বাটে ঘার কিসানে হিতমিতান কুটুম বাটুমকে বিহাক নেউতা বুলাউএ উচরাউএই। খাউআউঅন ধউআউঅনকর সারভার মুহাউএই। বিতি পেরিআঁই কুড়মি সমাজে কুড়মালি চারিঁই লগন বাঁধাই হেলেইক বর ঘারে। লগন বাঁধাল পাছু লগন চুমাইকন বাঁধাল লগন কেনিআঁই ঘার পঁহচাঁই দেইহেলথিন। কেনিআঁই ঘারে লগন চুমাইকন কেনিআঁই লগন পিঁড়হাঁই মানে মহুআ কাঠেক পিঁড়হাঁই গবচিকন লগন ঝাঁকা চার চালু রহেইক। অহে অরে হালে লগন বাঁধনকর সভে সারভার বর ঘারলে কেনিআঁই ঘার লেগঅত আর অহে সারভারে লগন কেনিআঁই ঘারে বাঁধান চার চালু হেলাহেইক। কুড়মি সমাজে হালেহুঁ গাঁউ মাহতঁই আকরাঁই বাখেইর বুড়হাঁই লগন বাঁধেই।

কুড়মালি চারিঁই লগন ধরানকর চারিআলি সিঁআড় বাঁধালাহেইক। **ঢেঁসনা:-** বিতি পেরিআঁই কুড়মি সমাজে রকাসাঠিআ হাঁথ লগনে বিহাক চার চালু নিঁহিঁ রহেইক। কাহে নঅ লগন বেগর ধরাইকন বিহাক নেউতা বুলাউঅন ঠিক কাম নহেইক। মেনতুক হালে দসরকর গুহে পিছড়অ বাইএ দসরকে ভেঁসুআই দেবাইএ দমে বিহা হাঁথ লগনে সরাউহত। তিন দিনঅ বতর নিঁহিঁ পাউলে বিহাক কাম হাদলাউএ আজবাঝ লাগেইক। বরতুক বা রেবাইর দিনেঁ বিহাক দিন থানিজ করিকন লগন ধরান আগুই নেউতা বুলাউহত। হালে আরঅ নাউআ নেতিক চলন চালু হেলাহেইক কিনা নঁঅঁ বেগর রেবাইর বেগর লগন ধরান আগুই বিহাক নেউতা বুলাউহত। ই নেগ-নেতিগিলা সারনা ধরমকে বেভরম করা নেগ-নেতি কুড়মি সমাজে চালু হেই উচরলেইক। কুড়মি সমাজে সারনা ধরম মতে তিনদিনআঁ নিঁহি তঅ পাঁচদিনিআঁ লগন ধরান ধরমিআ নেগ হেকেইক। ইটাঁই বিহাক নেউতা বুলাউঅন বা আরঅ দসর সারভার মুহাউঅন সভে সমকাঠা করেক বতর পাউআইক। একর ধরম বিচারে ধরমিআ

ভাঁগাঁন আহেইক। কুড়মি সমাজে কুড়মালি চারিঁই পাঁচ দিন ডেগিকন আগুবাটে আগুআইকন লগন ধরান নেগ সারনা ধরম মতে ধরমিআ ভাঁগাঁন তনতঁত সাধনে টউরাইক নিঁহিঁ। পাঁচ দিনিআঁ লগন বাঁধানকর মর ঠাননে **ভাঁগাঁন:** রজঅ আর বরমএক মিলনে জিউ সিরজাইক আর সিরজাল জিউকে জিউআউএক জআউএইক তাইতে বাউএ আর বু মানে পানিঁই। অহে খাতির রজক চিনহাপ মাঁহাঁমাঁই মানে পরকিতি মাঁই বরম বা বুদঁকর চিনহাপ, পুরুস মানে বুড়হাবাপ, তাইতকর চিনহাপ ধরমঠাকুর বাউকর চিনহাপ, বাঘুত ঠাকুর আর বুকর চিনহাপ বানসিন ঠাকুর। এহে সিনাসিনিক চিনহাপ ধরি তনতঁত সাধন সাধিআ কুড়মি জাইতে বিহাক চলন চালু হেলে পেরিআঁইএঁ পাঁচদিনিআঁ লগন বাঁধন চার চালাউএই চরাউলাহাত। দসর দসর সমাজিআ হাইহবড় জুইত বেজুইত সমাজে রহাক হঁতে তিন দিনিআঁ লগনে বিহা সরাউএ দাই গিরন খাতির তিন দিনিআঁ লগনে বিহা সরাউঅত মেনতুক লগন বাঁধাইক পাঁচটা। পাঁচটা লগন বাঁধাল বাদে লগন চুমাউঅত। লগন চুমাউঅল বাদে দুইটা লগন খুজাই দেথিক। তিনটা লগন রাখিকন তিন দিনিআঁ লগন কহত আর তিন দিনে বিহা সরাউঅত। লগন বাঁধইআঁই অহে পাঁচঅ সিনসিনিকে সেঁউরিকন লগন বাঁধেই। বিহাক নিআঁর ধরমিআ চারে সভেলে সগুন চার হেকেইক লগন বাঁধন। বেগর লগনে বিহা হেই নিঁ পারেইক। অহেঅরে লগন আর বিহা একেঠিন লটপটাইকন এসন লটকরাই লটকলাহেইক জে কেউএ কাকেউ ছাড়ে নিঁ পারেইক। **টেঁসনা:-** বেগর লগনে বিহা ঠানাইক নিঁহিঁ। দসর বাটে বেগর বিসঁই লগন ঠানাইক নিঁহিঁ। বিহাক আগু লগন আর লগন ধরালেই বিহা অটকেইক নিঁহিঁ।

এইদবাস: লগন সিরান দিনটা এইদবাস দিন কহাইক। সরসগুনে বিহাক (৪) ঘারছাড়ি মাড়ুআ বাঁধা মাড়ুআ পুজা, (৬) পুঁড় খুখড়ি, (৭) পখেইর কড়া পখেইর ঘাট বাঁধা ঘাট পুজা, (৮) আম মউরা খাউআউঅন বা অমলঅ খাউআ, (৯) গুআটিকা, (১০) ডুবাভাজন, (১১) হাঁড়িবিহা, (১২) পিঁধান-অড়হান, (১৩) মহুআ মউরা খাউআউঅন বা কেনিআঁইএঁ অমলঅ খাউআউঅন, (১৪) সিঁদরাদান, (১৫) চুমান এতগিলাক সগুন চার এইদবাস দিন সরাউএ হেউক। অহেখাতির এইদবাস দিনটা বিহাক চারে সভেলে ডাগর ঝঁকমারিআ আর ঝকঝলিআ দিন হেকেইক। এইদবাস দিন বিহানে সুতি উঠিকন মেহরারুরাই সভেলে পহিল তুলসি টিঁপে ঘার আনগাকে গবর কাঁটা দেইকন সাফা সুথরা করে দাইএ গিরত। দসরবাটে ঘার বাখেইর আড়পড়সিক মরদরা ছামড়া বাঁধা পালহা লেইকন আনগাঁই ঢুসমত। দসরবাটে বর ঘারে বরকে লেইকন কেনিআঁই ঘারে কেনিআঁইকে লেইকন ভউজাইরা আপন গুসটি ছাড়ি দসর গুসটিক তিন ঘারে আরুআ ধান ভিখ মাগাউএ জাত। ভিখ পাউঅল আরুআ ধানকে লড়হি

পাটিই দড়রিকন আরুআ চাউর জহড়াউঅত। অহে চাউরটা পানিঁই সেমগিকন চুনি করত। অহে চুনিটাকে কেটা সারেই পাতে মহড়িকন পানিঁই সিজাউঅল পিঠা করত। (৪) খারছাড়িঃ- ধবিন মাঁইএ বর ঘারে বরকে কেনিআঁই ঘারে কেনিআইকে পিছুআইড় বাটে পাটিক উলটা পিঠে চুগুমুগু গবচাইকন পানিঁই সিজাউঅল পিঠাটাকে খেজি খেজি গাতেক গাঁইঠে গাঁইঠে চিপাকরাউএইন আর হেরেইদ তেল মাখাইকন নাহাউএইন। হালে কুড়মালি চারিক খারছাড়ি নেগটা কুড়মি সমাজে লাহালাহি উঘড়ে মুহালাহেইক। খারছাড়িক অজি বাভনিআ চারিক গুরুমুখ নেগটা চালু হেলাহেইক। গুরুমুখে বইসটমে বরকে কেনিআঁইকে সলঅ নাম বততিরিস আখড় মনতর কানে সুনাইদেই। অহেঅরে একর দসর নাম কান ফুঁকা। গুরুমুখ আর খারছাড়িক বাদেইর বসমতা ফারাক আহেইক। মেনতুক বাভনিআ চারিঁই ভেদাইরহল কুড়মিঁই বুঝত নিঁহিঁ, বুঝেক গেআন মগজে নেখেইন। বিতি পেরিআক কুড়মিক পুরখেইন পুরুসরাঁই তনতঁত সাধন বাছ গেআন মতে টউরল রহত পহনা উমরিআ কুড়মি ঘারেক ছউআঁই ঘার-কননাক ভেদ বেউরা কিছু বুঝঅত নিঁহিঁ। মাঁই-বাপেক অরজন খাইকন উদমা সাঁড় ডুল খেলি খাত। এহে খেলি খাউআ মনেক মেইল সাফা করি অরাকে ঘার-কননা বাঁধেক বাটে মুহড়ি ঘুরাউএক খাতির খারছাড়ি চারটা কুড়মালি চারিঁই বিহাক চারে সঁঝড়লাহাত। খারে মেইল ছাড়েইক। মনেক মেইল ঘুরিবুলি বেগর অরজনে উদমা খাউআ। মেনতুক বিহাক বাঁধনে বাঁধালে তঅ মাই-বাপেক অরজনে মাগ-ভাতার দিঅক উদমা খাউআ চলতেইন নিঁহিঁ। আপনকে অরজেক ডহরে চলি অরজেক গেআনে গেআনমান হেউএ হেতেইন। আপন ঘারকননা বাঁধে হেতেইন। আপন গড়ে ঠঁড়হুআই হেতেইন। বরকর মাঁই-বাপ নাতাঁই কেনিআঁইকর সাস-সসুর। দসর বাটে কেনিআঁইকর মাঁই- বাপকর সাস-সসুর। মাঁই-বাপে খাউআই পিঁধাই পালথিন পসথিন। সাস-সসুরেক কিনা দাই গলঅলাহেইন জে রা বেটা পুতউহুকে বা বেটি-জাঁউআইকে পালবেথিন পসবেথিন। বর কেনিআঁই বিহা বাসিলেই তঅ মাগ-ভাতার নাউআ নাতাঁই নাথালা। আপন ঘার-কননাঁই সামালা। অরা আপন ঘার-কননা সামলাউএ দাই গিরতা। দসর বাটে গুরুমুখ চারে বইসটমে সলঅনাম বততিরিস আখড় কানে সুনাইকন কান ফুঁকবাই পহনা উমরিআ বর কেনিআঁইকে ভগবান ভজন বাটে মুহড়ি ঘুরাউএক গেআন দেইন। পহনা উমরিআ ছউআঁই ভগবান লেইকন থড়াই কনঅঁ বুঝত নঁআঁ বুঝেক গেআন অখর মগজে রহেহেইন। ভগবান লেইকন কনঅঁ গালসাল নিজে করত নঁআঁ দসরকর করল গালসাল অনাউঅত। জাখরা ভগবান লেইকন কনঅঁই জানত নিঁহিঁ বুঝত নিঁহিঁ অরাকে ভগবান কাথা সিখাউঅন মানে তঅ চাটানি বিহিন বুনা। মেনতুক হালে দসরকর গুহে পিছড়ইআ কুড়মিঁই

আপন চারি কুড়মালি চারিক বাছট গেআন বুঝেক কসনি নিঁহিঁ করিকন বাভনিআলি চারি হঁবুআউএ লচ্ছুহা বাভন বইসটমকর পেট ভাথাইকন নিজে গাড়হাঁই গিরে গাড়হাবাটেই কুদঅহত। অচেট সুতঅনিঁহ সুতি রহল এহে কুড়মিকে জাগাউঅন দাই। জাগাউএ গেলে জাগাউতাহারকেই কুহনাউহেথিক। তনতঁত সাধন ডহর বেঁড়াউলাইহা মেনতুক তনতঁত সাধন বাছট গেআন মতে গড়হাল কুড়মালি চারিক নেগ-চার বুঝেক কসনি করা মানি চলা। আপন পুরখেঁইন পুরুসকর গড়হলকে লাইথ মারি দসরবাটে ঘসকাউঅন বেসন হেইক। ডঁড় ভরা কাম হেকেইক। অহেখাতির হালে আপন চিনহাপ হাজাউবাইএ কুড়মিকে ডঁড় ভরে হেহেইন। আউতি বেরাঁই আরঅ ডঁড় ভরে হেতেইন। আউতি বেরাক কুড়মিকে জিআউএক খাতির এহে বেরাঁইএঁ সতর হেইকন আপন মাঁই ভাখি কুড়মালি ভাখি আপন চারি কুড়মালি চারিকে পকতাউএক পসরাউএক ঝবরাউএক কসনি করা। কাম করলে বেরহন প ডিআতেইকএ। কসনি করলে কাম সমফলাতেইকএ এহে পরতুক মনে করি কামে ঠেসা। দসরকর উচকাউনিঁহ পুলকাউনিঁহ ইরখাকাথাঁই কাম ছাড়ি হেঁজমারি গবচি রহলে কবউ সমফলাতেইক নিঁহিঁ।

৫) মাড়ুআ বাঁধা- মাড়ুআ পুজা: আনগাঁই ছামড়া বাঁধল পাছু আজাই-আজিঁই নাউআ লুগা পিঁধিকন মড়ইথানে মাড়ুআ বাঁধা, মাড়ুআ পুজা করা নেগ হেকেইক। **মাড়ুআ বাঁধা- মাড়ুআ পুজাক সারভার:-** হেরেইদ গাঁঠা, আরুআ চাউর, তাঁবা, দুব ঘাস, হেইরলা ফর, নাউআ সুপ, দিআ, ধুনা-ধুপ, বঁহতা, পঁউআরেক বড়, সাবইদড়ি, সিঁদুর, আরুআ চাউরেক মেরখু, আরুআ চাউরেক গুঁড়ি, বর ঘারে আম ডাইর, কেনিআঁই ঘারে মহুআ ডাইর, সারেই ডাইর, সিধা ডাইর, সারুআ, কাজর হেনতেন। পহিল তআ আজাকে মড়ই থানেক ছামড়াঁই আমপাতেক বনআঁমালা টাঁগাউএ হেইক। তাকর পাছু মড়ই থানেক আগুবাটে মানে মুঁহানবাটে মড়ই থানেক চাইর কুনে চাইরটা গাড়হা কড়ি সারেই ডাইর গাড়ে হেইক। অহে ডাইর গিলাক মাঝবরাবইরে দসর একটা গাড়হা কড়ি অহে গাড়হাটাঁই পহিল বঁহতাঁই টিপি মুহাউঅল হেরেইদ গাঁঠা, আরুআ চাউর, তাঁবা, দুব ঘাঁস, হেইরলা ফরকর বঁহতাটা কাকিঁই নাউআ সুপে দিআবরি সারুআঁই ধুনা পড়াই সুপটা আজিকে দেইক। আজিঁই বঁহতাটা আজাকে মুঁহাই দেইক। আঁজাই বঁহতাটা মাঝেক গাড়হাটাঁই ভাঁসাউএই। তাকর পাছু সারেই ডাইর সিধা ডাইর বর ঘারে আম ডাইর, কেনিআঁই ঘারে মহুআ ডাইর, তিন ডাইরকে একসঁগে মুঠা করি গড়হাটাঁই গাড়েই। গাড়ল ডাইরগিলাকে একসঁগে গটা করি পঁউআরেক বড় আড়হাই পাক মেটিকন সাবই দড়িঁই কটকটিআ পকতঅকরি বাঁধেই। কাকিক মুহাউঅল কাচামাটিক কাদাঁই আজিঁই দড়িগিলাকে কাদাঁই লেপেইক। লেপল মাটিক উপরে

আজাঁই আরুআ চাউরেক গুঁড়ি লেপিকন তাকর উপরে সিঁদুর কাজর পিঁধাউএই। মাহাভারত পেরিআক জড়ল কেহনিক দাপটে হালে কুড়মিঁই মড়ই সাড়াক চলন বিসরিকন তুলসি সাড়াটা চালাউঅত। তুলসি সাড়াটা চালু হেউএক আগু মড়ই সাড়াটা চালু রহেইক। অহে অরেই মড়ই সাড়া লেমড়লি সাড়াটা সিরজালাহেইক। মড়ইলে মড়লি, মড়ইআন, মাড়ুআ সাড়াগিলা সিরজালাহেইক। মড়ই থানে সসটি মাঁইএক বাথান। মাড়ুআ পুজাঁই সসটি মাঁইকরে পুজা করাইক। মেনতুক পুজাটা মড়ইথানে করাক হঁতে পুজাক নাম মাড়ুআ পুজা। সারনা ধরমে কুড়মালি চারিঁই নউগঠ সিন-সিনিক বাচিক পাউআইক। সসটি মাঁই অহে নউ গঠ সিন-সিনিঁই গনাই নিঁহিঁ মেনতুক আল ছউআক নিক সুখ কাঁদন হাঁসকর মুলে সসটি মাঁই গবচি রহা পরতুকে কুড়মিঁই সসটি মাঁইকর বাথান থান মড়ই থানে সসটি মাঁইকর পুজা করা চারটাকে মাড়ুআ পুজা নামে চালই আউঅহত। বচকনিটা বেগর লাতাইড়কর বেগর ভেদেক হেতেইক নঅঁ কিনা তাউএ খাইস মেটাউএ বচকহঁ। সারনা ধরমে কুড়মি সমাজে দস গঠ মাঁইকর নাম পাউআইক। এরা দসঅ মাঁইএ আউল ছউআক নঅঁ নিঁ কনঅঁ হিত কামে জউআত। (১) জনম দেউআ মাঁই, (২) ধাই মাঁই, (৩) ছাগেইর মাঁই, (৪) সসটি মাঁই, (৫) আজি মাঁই, (৬) দুধু মাঁই, (৭) চাঁদঅ মাঁই, (৮) বেরা মাঁই, (৯) হাঁসন মাঁই, (১০) কাঁদন মাঁই।

সসটি মাঁইএঁ আউল ছউআকে রগ দুখলে রেহাই দেইন, গিরন, পড়নলে রেহাই দেইন গাত পুসটাউএ সাহাই দেইন, হাঁসাউএই, কাঁদাউএইন। অহেঅরে কুড়মি সমাজে নিতে নিতে দুইবেরা আউলছউআকে তেল মাখাউএক বেরা সসটি মাঁইএক সেঁউরনে গিত গাহি সুনাউথিন। গিতটা এহে নিআঁর-

কাঠ বাঁধঅঁ, পাত বাঁধঅঁ/বাবুকে/মিআঁকে বাঁধেই।
বাবু বাড়অই/মিআঁ বাড়অই/ অরই বাঁস
পইনা পাহাড়/ সসটি মাঁইকে নমঅঁ নমঅঁ।।

অহেখাতির ছউআক জনম আগুই ছউআ জনমকর অরহান বিহাক চারেই সসটি মাঁইকে তুসটাউএক খাতির অকর বাথান থান মড়ই থানে মাড়ুআ পুজা নামে সসটি মাঁইকর পুজা করা চার কুড়মালি চারিঁই সঁঝড়ালাহেইক।

এহে সসটি মাঁই কুড়মিক নউ গঠ সন-সিনিঁই গনাই নিঁহিঁ মেনতুক সিনিক মাইনে মাইন পাউএই। অহে খাতির সসটি মাঁই সাড়াটাক উচরন গুড়ি তাড়ি উচরন গুড়িক ভাঁগাঁন ভাঁগি মানে নিখরাউএক কসনি করিঅঁ।

কুড়মালি ভাখি সবে ভাখিক আদি আর সভেলে পুরখেইন ভাখি হেউআক খাতির কুড়মালি ভাখিক আবগা একুড়রা একুকটি কড়ে একুকটা সাড়াক মানে

নিখরাউএক সউআঁগে সঁউআঁগকর ভাখি হেকেইক। হিঁআঁকা কইখে ধরি জনম দেউঅনি মাঁই বাপেক বহু (স্ত্রী) কাথাটাক মানে স/ দসরবাটে জিউ দুনিয়াকে কইখে ধরি জিউ সিরজইআ মাঁহাঁমাঁই বা পরকিতি মাঁই বুড়হাবাপেক বহু (স্ত্রী) মানে স। ঠউকা কাথাঁই স কড়টিক মানে বহু বা (স্ত্রী)। এহে দুই মাঁই মানে দুই স বলকর এক সঁগে সঁঝড়ান ঠিনলে তেসরা এক মাঁই স সিরজাইকন দুই স কর সঁগ ঠিনলে সাড়াক ঠিকড়টি সঁঝড়ানে সসটি সাড়াটা সিরজালাহেইক। মেনতুক সসটিমাঁই জনমদেউঅনি মাঁইঅঁ নঁহিঁ আর মাঁহাঁমাঁইঅঁ নহিঁ। মেনতুক মাঁইকর কাম নিমটাউএই। অহে অরে সসটিমাঁই তেসরা এক মাঁইবল হেকি। অহে অরে সসটি মাঁই কুড়মিক নউগঠ সিন-সিনিক গঠে নি গনাইক নঅঁ সিনিক মাইন পাউএই। ছউআক জনম অর মরদ-মেহরারুক বিহাক বাঁধনে বাঁধান। অহেঅরে বিহাক চারে মড়ই থানে মানে সসটি মাঁইকর বাথান থানে মাড়ুআ পুজা নামে সসটি মাঁইকর পুজা করা চার কুড়ালি চারিঁই সঁঝড়ালাহেইক।

স কড়টি মানে বহু (স্ত্রী) মই আনসাঠিআ কহি বুতে করহঁহ এসন কাথা নহেইক। কুড়মি সমাজকর সভেলে ঠাঁউএক আর ডাগর নাতা সসুর সাড়াক ভাঁগাঁনে সাবুত পাউআইক স মানে বহু (স্ত্রী) আর সু মানে সঁইআ (স্বামী)। ঢেঁসনা:- স সু অর সাড়াগিলালে সসুর সাড়াটাক সিরজন। সসুর সাড়াক স কড়টিক মানে বহু (স্ত্রী)। স কর মানে (স্ত্রী) কর বাপ আর সু (স্বামী) কর বাপ স কে আর সু কে মাগ ভাতার ডুল মিলাউএক অর হেকঅত। অহেঅরে সু কর পাপ স কর সসুর। দসর বাটে অহেঅরেই স কর বাপ সু কর সসুর। স সু অরলে সসুর। কুড়মালি ভাখিক সাড়া ভাঁড়ার জড়ইআরাঁই অতনাটা টউরলহাহাত নঅঁ নিঁহিঁ মর জানল নেখি। কুড়মালি সাড়া ভাঁড়ারে স কড়টিক মানে বহু (স্ত্রী) নিখরাউলাহাত নঅঁ নিঁহিঁ মর নেজেইরে নলাল নেখি।

সসুর সাড়াটাঁক ভাঁগাঁনে সু মানে সঁইআক সাবুত পাউআলেইক। দসর আরঅ একটা নাতা সাড়াইঅঁ সু মানে সঁইআক সাবুত পাউআইক। সাড়াটা হেলেইক ননদঅসু। সঁইআঁক বহিন বা দিদিক সঁইআঁকে নাতাঁই ননদঅসু কথিক। ননদকর সু মানে সঁইআ ননদঅসু। টউরলে আরঅ দসর সাড়াঁই চলল স আর সু কড়গিলাক মানে বহু (স্ত্রী) আর সু মানে সঁইআ হেকেইক একর সাবুত প াউআতেইক। বারেককে বার বেজাঁইবার বহু সাড়াটা কহালেইক আর বহু সাড়াক বাঁগলা ভাখিই স্ত্রী বচকালেইক। অহেখাতির বহু সাড়া করঅ উচরন গুড়ি ভেউরাউএক চাইড় আহেইক নিআঁর ঠানহঁ। বহু সাড়াটাকে ভাঁগলে বহ + উ সাড়াগিলা পাউআত। বহ সাড়াক মানে উভা বাঁগলাই বহন করা উ কড়টিক মানে সিরজন। জেঁই বহেই অঁই বহু কহাই। ঠউকা কাথাঁই জেঁই

সিরজন বহেই অঁই বহ।

এহে নিআঁর কুড়মি সমাজে চালু রহল নাতাক সাড়াগিলাক উচরন গুড়ি বাছট গেআন অরে রহল সাবুত পাউআইক।

সসটি মাঁই সাড়াটাক স গিলাক লেইকন এতনা বচকনি বচকালেইক। পেরিআক পেরিআলে চলি আউঅল সসটি মাঁইকর বাথান থান মড়ই হেউআক পরতুকে পরতুকিআ হেকঅত কুড়মি। মড়ই থানে সসটি মাঁইকর পুজা করাইক মেনতুক পুজাটাক নাম সসটি পুজা কহাইক নিঁহি। পুজাটাক নাম কহাইক মাড়ুআ পুজা। মাড়ুআ পুজাক আগু আজাঁই মাড়ুআ বাঁধেই। মাড়ুআ বাঁধেক নেগ আড়হাই পাক পাক ঘুরাউঅন। এহে আড়হাই পাক পাক ঘুরাউঅনকর বেউরা টুঁড়হেক কসনি এহে লাতাইড়ে করা বেস হেকেইক। পাছু আর লাতাইড় পাউআতেইক নিঁহিঁ। কামটা দরপুরা রহতেইক। দুই পাক পাক ঘুরাউলে বুঝাইতেলেইক ইটা পুরুস পরকিতিক চিনহাপকর ঠিরিআনি হেকেইক। তিনপাক পাক ঘুরাউলে বুঝাইতেলেই ইটা সততঅ, রজঅ, তমঅ এহে তিন গুনকর চিনহাপকর ঠিরিআনি হেকেইক। মেনতুক দুঅ নিঁহিঁ তিনঅঁ নিঁহিঁ ঘুরাউঅন পাকটা হেকেইক আড়হাই। আড়হাই পাক ঘুরাউঅনে কনঅঁ বাছট গেআন আহেইক নঅঁ নিঁহিঁ ইটা টুঁড়হেক চাইড় আহেইক। কাহে নঅঁ কুড়মালি চারি গড়হাইএক মুলে গটাটাই বাছট গেআন রহল সাবুত পাউআইক।

আউআ আড়হাই পাক ঘুরাউঅন লেইকন রিচিক বেরা গাঁউআইঅ: বিতি পেরিআঁই হালি কুড়মিক পুরখেইন পুরুস সিনধু মুলুকে বসাগইত করি রহল পেরিআঁই চাসকাম টুঁড়হিকন চাসকাম আহার দানা অরজেক খাতির দাইএ গিরিকন তনতঁত সাধন ডহরে ডহরিকন জিউ সিরজন তঁত টুঁড়হল রহত। চাইর নিআঁর জিউকর এক নিআঁর জিউ হেকেইক ভুঁইফড় জিউ। সভে জিউকর সিরজন ডহর এক হেকেইক। সভে জিউকর মুলাধার চাকে কুলঅ কুঁড়ুলি নি (কুলকুন্ডলিনী) আড়হাই পাক পাক খাইকন হেঁঠ মুনে সুতলআহি। কুড়মালি ভাখিক কুঁড়ুল সাড়াটাক মানে হাঁঠু টেহনি মুড় একঠিন জড়অ সড়অ করিকন সুতা। কুড়মালি ভাখিঁহ কুঁড়ুল হেইকে সুতা কাথাটাক চলন চালু আহেইক। কুড়মালি ভাখিক কুঁড়ুল সাড়াটাকে চরাইকন সঁগসকিরিত (সংস্কৃত) ভাখিঁহ কুন্ডলিনি সাড়াটা সিরজলাহাত। বাদ দেহাক কুলঅ কুঁড়ুলিনিক সঁগ বিহাক নেগকর নাতা ইতঅ বেড়ে বেঠিক কাথা। কাথাটা বেড়েবেঠিক নঁহেইক ভাঁগলে বেড়েঠিক কাথাক ভেদ বেউরা টুঁড়আইক। টেঁসনাঃ- কুলঅকুঁড়ুলিনিকে জাগাউলে উচরাউঅল কাম সমফলাউএ কামে কেমিআক মন গড়াই রহেহেইক। তনতঁত সাধন সাধইআরাঁই তনতঁত সাধনে মন গড়াই রাখেক খাতির সভে পহিল কুলঅকুঁড়ুলিনিকে জাগাউথিক। বিহাক নেগ চারে বর কেনিআঁই বিহাক বাঁধনে বাঁধাত। বিহাক বাঁধনে

বাঁধান মানে তঅ পেরিআক পেরিআ আপন কুলকে জিআই রাখিকুলকে আগুবাটে অগুআউঅন বিহা বাসিলেই বর কেনিআঁইকর বর কেনিআঁই নাতা ছিঁটেইন আর মাগ ভাতার নাউআ নাতাই জিনগানি পুহাউঅত। মাগ ভাতারকর কমা থিআপুতাক জনম দেউআ আর কুলকে আগুবাটে অগুআউঅন। মাগ ভাতার হিআখালাস বেসবাসাকবাসিই রাইকন মাগ ভাতাকর ভাতার মাগকর টানে টানাই রহি আপন কুলকে আগুবাটে অগুআউঅন মাগ ভাতারকর উচরাউঅল কাম হেকেইন, ধরম হেকেইন। মাগ ভাতার কর এহে উচরাইউঅল কাম সমফলাউঅন বাটে মনগড়াই রাখন খাতির কুলঅকুঁড়ুলিনিকে জাগাউএক পরতুকে পরতুকিআ কুড়মিঁই বিহাক নেগে আড়হাই পাক ঘুরাউঅন নেগ বিহাক চারে সঁঝড়ালাহাত। আড়াই প াক ঘুরাউঅন কুলঅকুড়ুলিনিক চিনহাপকর ঠিরিআনি হেকেইক। কুড়মালি চারিঁই আরঅ দসর নেগেউ আড়হাই পাক ঘুরাউঅন সঁঝড়ালকর সাবুত পাউআইক।

৬) পুঁড় খুখড়ি পুজা: পেঁড়কা সাড়াটালে পুঁড় সাড়াটা সিরজালাহেইক। চড়কে চড়ক চাড়কা বরনকে পেঁড়কা কথিক। সভে সিনসিনিক আদি সিন মাঁহাঁসিন কুড়মিক বুড়হাবাবাক বরন পেঁড়কা। বিহাক চারে সঁঝড়াইররহল পুঁড় খুখড়ি চারে সিরজন মুলে গবচি রহা কুড়মিক অহে পেঁড়কা বুড়হাবাবাক আরদাস করাইক। বিহা মানেই তঅ বেগর রকটেকে মাগ ভাতার আপন মনমউজিঁই জেনিমিলনে মিলেক সমাজিআ হুকুমনামা পাউআ। নর মেদিক বেগর জেনিমিলনে কনঅঁ জিউকর সিরজন হেই নিঁহিঁ পারেইক। মানুআক হঁতেউ অহে একে ডহর বনাউঅল আহেইক। ইটা সাইবত কুড়মিক বুড়হাবাবা সিরজন মুলে মুল কারিগর নিআঁর গবচলাহে মেনতুক মুল কারিগরকে পিঠসাহাই দেউঅইআ দসর সাঠা দেউআ কারিগরকর চাইড় রহেহেইক। পরকিতি মাঁই মানে মাঁহাঁমাঁই বা জাহির মাঁই হেকি অহে সাঠা দেউঅনি কারিগর। আবগা কারিগর রহলেই সিরজন সিরাই নিঁহিঁ পারেইক। সারভারকর চাইড় রহেহেইক। তেসনে আবগা কারিগরে সিরজন সিরজাই নিঁহিঁ পারেইক। সারভার আর কারিগর সভেকর মিলনে সিরজন সিরজাইক। এহে ঠাননি ঠানি দাঁজি ভাঁজি পাঁজি তনতঁত সাধন সাধইআ পরকিতি পুজইআ কুড়মিঁই বিহাক চার পুঁড় খুখড়ি জাক চারে অখর পরকিতিআ নউগঠ সিনসিনিক আরদাস করা চার পুঁড়খুখড়ি পুজাঁক চারে সঁঝড়লাহাত। ঠউকা কাথাঁই পুঁড় খুখড়ি পুজাক চারে কুড়মিঁই অখর পরকিতিআ নউগঠ সিনসিনিক পুজা করঅত। কুড়মিক পরকিতিআ নউগঠ সিনসিনিক বাচিক। (১) বম, (২) বুড়হাবাবা, (৩) মাঁহাঁমাঁই, (৪) ধরমঠাকুর, (৫) বাঘুত, (৬) বানসিন, (৭) বসমতামাঁই, (৮) চাঁদঅ রাই, (৯) গঁসাঁই রাই।

কুড়মালি চারিক পুঁড় খুখড়ি পুজা চারটাকে অজি বাভনিআলি চারিঁই নানদি

মুখ (নান্দীমুখ) চার নামে চালাউঅত। বাভনরাক এহে নান্দীমুখ চারটাকে কুড়মিঁই ঘিউঢারি কথিক আর তনতঁত সাধন বাছট গেআন অরে সিরজাল পুঁড় খুখড়ি পুজাকে ঠেকলিকন আনগাক বাইরে বাহরাউলাথিক আর বেগর ভেদে সিরজাল ঘিউ ঢারিকে আঁকড়াইকন হবুঁআউ হেথিক। পুঁড়খুখড়ি পুজা আর ঘিউঢারিক ভেদ বেউরা বাছট গেআন অরে নিখরাউএক কসনি করল জাহেইক। তই করইআ তরা তহরঠিন তই করেক আপাভার সঁপল জাহেইক।

জিউ সিরজন অর পাঁচ ভুত সিরজনকর সারভার। নউগঠ সিনসিনিঁই সারভার পাঁচ ভুত আহেইক। নর মেদি মানে পুরুস পরকিতি মানে মাগ ভাতার মানে বুড়হাবাবা মাঁহাঁমাঁই নউগঠ সিনসিনিঁই আহাত। সিরজনকর সভে সারভার আর কারিগর নউগঠ সিনসিনি মাঁহাঁন আহাত। আগুই বচকালাহেইক বিহা মানেই তঅ ধিআ পুতাকে জনম দেউআ আর পেরিআক পেরিআ আপন কুলকে জিউআইকন আগুবাটে অগুআউতে রহা। ধিআ পুতাকে জনম দেউআক ডহর মাগ ভাতার জেনিমিলনে মিলা। এহে জেনিমিলনে মিলা বাটেলেই ভাতারকর খেজা মাটি পানি আর তাইতকর আধা মানে আড়হাই আর মাগকর বম বাসাত আর তাইতকর উবরল আধা মানে আড়হাই। এহে দিঅ আড়হাই একসঁগে সঁঝড়ালনে গটালিঅ পাঁচভুতে জিউকর সিরজন। এহে অরে কুড়মালি চারিক পুঁড় খুখড়ি পুজাক চারে গটাগটি গঠা সিরজন চেউরকর আরদাস করাইক। টানা পুরখেইন পুরুসরা কিনা জিউ সিরজা বলে বলিআন হেই পারত। মঁই হাঁকাইকে কহহঁ কুড়মিক পরকিতিআ নউগঠ সিনসিনিক বেগর আসিসে জিউ দুনিআক কনঅঁ জিউকর সিরজন হেই নিঁহিঁ পারেইক। আর কনঅঁ জিউ জিউই নিঁহিঁ রহতা।

পুঁড় খুখড়ি পুজাক সারভার: আরুআ চাউরেক গুঁড়ি হেরেইদ গুঁড়ি কইলা গুঁড়ি পড়ল মাটি বা চুলহা মাটিক গুঁড়ি সিঁদুর পাহুড় আরুআ চাউর দিআ ধুনা-ধুপ হেনতেন।

পুজাক নেগ-জগ: খেআল রাখে হেতন আপন গুসটিক জাখরা মাগ ভাতার দিঅ জিঁঅত আহাত অহে ডুল গুঁগুঁ আকরাঁই কাকা পুঁড় খুখড়ি পুজা করাক হঁকে হঁকদার হেকত। গুঁগুই আকরাঁই কাকাঁই নাউআঁ ধতি পিঁধিকন মাড়ুআক দেইড়া বগলে হেরেইদ গুঁড়ি কইলাগুড়িক চুলহা মাটিক গুঁড়িই আড়ি চাইরটা ডাঁইড় টানঅত। আড়ি কাঁইড় গিলাক উপরে ঠাড়হি চাইরটা ডাঁইড় টানত হেলেই নউটা খঁড় কাটাইক। ঠউকা কাথাঁই নউটা খঁড় কাটেহেইক। তাকর পাছু আজাক বাঁধল পুজল মাড়ুআক গাতে তর হাঁথে আরুআ চাউরেক গুঁড়িই তিনটা থাপনা থাপত। থাপনাগিলাক মাঝে সিঁদুর টিকাঁই টিকাউতেইক। সারনা ধরমে কুড়মিক নউগঠ সিনসিনিক নউ বরন নউ টঁগেক খুখড়ি পাহুড়কর চাইড় রহেহেইক।

বরন আর টঁগকর বাচিক: ঠাড়হ মউরা ধব সাঁড়হা ধঁপা মউরা ধবঅ সাঁড়হা ঠাড়হ মউর রঁগুআ সাঁড়হা ধঁপা মউরা রঁগুআ সাড়হা, রিসা সাঁড়হা, ঠাড়হা মউরা, ঝিঁঝরিআ সাঁড়হা, কুইলি কঠেইর, কুড়থিআ বরনিআ কটেইর ঝিঁঝরিআ কটেইর।

কাটল নউটা খঁড়ে বাচিক বাচিক সিনসিনিকে মনে মনে থাপনা ঠানেঁই। ঠানঅল খঁড়ে ঠানঅল সিনসিনিক আরদাস করেই আর অকর হঁতে বাচিক খুখড়ি পাহুড়কর মুড়ে তিন ঝিমকন পানি ঝিমকাইকন সিঁদুর টিকাঁই টিকাইকন আরুআ চাউরে চরাউএইন। চরাউএক বেরা মানে আরদাসন বেরা সিনসিনিকে নেউরাঅন বচকনি টুম হে মর পুরখেইন পেরিআলে মানিআউঅল পুজিআউঅল ধরল সঁচল অমুক সিন আর সিনি আইজ মঁই মর ফাঁনলা পুতাকে বা ফানলি ধিআকেবিহাক বাঁধনে বাঁদে অকর বিহা ডউরঅলাহঁ। সউআঁগ জখে জুটাউঅল আঁটাউঅল পাহুড়ে তকে আরদাস করি আসিস মাঁগহঁ। তর আসিসে অকর বিহউলা/বিহউলি জিনগানি নিকে সুখে সঁলতঁতে রহউক আর ধিআ পুতা জনে অনে ধনে ঘার ভরল রহউক নিতে নিতে নাউআঁ ডগ ফেঁকতে রহউক। চরাউঅল পাহুড় কাটি বাঁউএ দেইনে পানি ঢারি সভে সিনসিনিক হঁতে গড়করি পুজা সরাউএই।

হালি পেরিআঁ টুনকি রগেক বাইড়ে খুখড়ি ঘুঘসি মরনে মরবাইএ কুড়মি ঘারে খুখড়ি উঘড়ি সিরাল খাতির খুখড়িক অজি সিননি চড়হাউঅন নেগ চালু হেলাহেইক।

এইদবাস দিনকর ঝঁকমারিআ আর ঝকঝলিআ নেগে বাচিক করি ভউজাইরাক কালঘাম ছুটেইন। কালঘাম ছুটাইকন নেগ সরাউলেউ এইদবাসে দিনকর সভে নেগ সরসগুন নেগে সঁঝড়াইক নিঁহিঁ গনাইক নিঁহিঁ।

টেঁসনাঃ- (১) অদউলি পাড়া বা বড়িপাড়া নেগ, (২) সিনেই সঁগরাউঅন নেগ।

অদউলি পাড়া বা বড়ি পাড়া নেগ: অদাউরিদ সাড়ালে অদউড়ি সাড়াটা সিরজালাহেইক। অদউড়ি পাড়ত ভউজাইরাঁই। অদাউরিদ মানে বিরহি বা কলাই দাইলকে লড়হি পাটিঁই পিসিকে পাক করথিক। অহে পাক উরিদে বাসেক ছাতাঁই আকরাঁই নাউআঁ সুপকর উলটি পিঠে অদউড়ি পাড়ত। কেনিআঁই ঘারে বর ঘারলে সাজনি ডালাঁই সাজল বেইগন সঁগ অদউড়িক বড়ি মেসাইকন তিঅন রাঁধত আর অহে তিঅন বর কেনিআঁইকে খাউআউথিন। বেইগন মরদলিঁগাক চিনহাপকর ঠিরিআনি হেকেইক আর উরিদ দাইল জেনি দুআইর চিনহাপকর ঠিরিআনি হেকেইক। দাইল মানেই তঅ দুই ফাঁড়াই ফাড়াল দানি মেহরারুক জেনি দুআইরঅ দুই ফাঁড়াই ফাড়াইল। অহেঅরে দাইল সাড়াটা মেদি লিঁগা লিঁগাঁই বাইচকাউঅল জাইক। বেইগন সঁগ উরিদ বড়ি মেসাউঅল তিঅন বর কেনিআঁইকে জেনিমিলন মিলাক চিনহাপকর

ঠিরিআনি হেকেইক।

সিনেই সঁগরাউঅন : অদউড়ি পাড়া চারটাক নিআঁর সিনেই সঁগরাউঅন চারটাউ সরসগুন গুনে গনাইক নিঁহিঁ মেনতুক বিসবিসুআস করেক চার হেকেইক। সিনেই ফেরন নেগ বেগরসরাই কন সিঁদরাদান চার সরাউএ পারাইক নিঁহিঁ। অহে খাতির সিনেই সঁগরাউঅন চার বিসবিসুআস সরাউএক চার হেকেইক।

সিনেই সঁগরাউঅন চারকর সারভার: নউসেরা উসনা চাউর, নউটা দুব ঘাসকর লত, নউ গাঁঠা হেরেইদ, নউটি হেইরলা ফর।

ছামড়াতরে মাড়ুআক রিচিক বিচে বর ঘারে বর আর কেনিআঁই ঘারে কেনিআঁই লগন পিঁড়হাঁই পুরুব মুহে গবচত। আর মনে মনে বুড়হাবাবা মাঁহাঁমাঁইকে সেঁউরথিক। আর দিঅ তর হাঁথকে সটাইকন উঁজরা ছাঁদত। অহে বেরাঁই নাউআ ঠাকুরে উততর মুহে গবচিকন ছাঁদল উজরা ভরি উসনা চাউর তিনটা দুবঘাঁসকর লত তিনটা হেরেইদ গাঁঠা, তিনটি হেইরলা ফর চাউরটাক উপরে রাখেই। বরে কেনিআঁইএঁ রসে রসে উঁজরা খলি সভে সারভার ফুচকাই দেথিক। দুই ধাঁউএক বাদে তিন ধাঁউএক বেরা বরকে বরেক ভউজাইএ কেনিআঁইকে কেনিআঁইকর ভউজাইএ হাঁথে আঁইক ঢাপিকন কানা করথিন অহেবেরাঁই নাউআ ঠাকুরে বরকর দেইনা হাঁথেক কেনিআঁগুর আর কেনিআঁইকর বাঁউআ হাঁথেক কেনিআঁগুরকর নখ লহু বাহরাতেইক। ধেরিআ রিচিক গবচইকন টুঁগেইক। নখ টুঁগনিঁই বাহরাল লহুঁই সাফা চেঁথরা গাবাউএই। লহুঁই গাবঅল চেঁথরাটা সিনেই কহাইক। এহে সিনেটা হুঁসিআরে জগাই রাখেক খাতির নাউআ ঠাকুরে বরকে বর পছউরাক খুঁটেই গেঁঠিআই দেইক আর কেনিআঁইকে অকর পিঁধল লগন সাড়িক ঠেঁপে গেঁঠিআই দেইক। সিনেই সামলাইকন হুঁসিআরে জগাউন দাই বর কেনিআঁই দিঅক আপন আপন বহনই। সিঁদরা দানেক বেরা সভেলে পহিল সিনেই ফেরন নেগ সরাউএক চাইড় গিরেইক। অহেবেরা সিনেইটা চারে জউআইক।

(৭) পখেইর কড়া ঘাট বাঁধা ঘাট পুজা: আনগাক পানি বাড়ি বাটে বহি বাহরাইক অহে গলি মুড়িটাই রিচিক আড়ে বেবহন কুনে বসমতা মাঁইকে সেঁউরিকন তিন ঝিমকা পানি ঝিমকাইকন বানসিন সিনকে আরদাস করি নাউআ আকরাঁই পাজাউঅল কদাইরে বহনইএ পখেইর কড়া নেগ হেকেইক।

ঘাট বাঁধা: কড়অল পখেইরটাক পিঁড় পেঁদাঁই পুরুব মুহে গবচিকন ঘারেক লড়হি পাটিক আবগা পাটিটিকে উলটাইকন বসে জুইত হেতেইক নিআঁর পাটিটিকে বসাইকন বহনইএঁ পাটিটিকে তেল মাখাউঅন তিন টিকা সিঁদুরে টিকাউঅন তিন টিকা কাজরে কাজরাউঅন বহনইকর নেগ হেকেইক। কাজরাউঅন বাদে আরুআ চাউরে দুব

ঘাঁসে ঘাটটাকে বহনইএঁ চুমাউঅন বহনইকরে নেগ হেকেইক। ঘাট চুমাউঅল পাছু ঘাটটাকে গড়লাগা বহনইকর নেগ হেকেইক।

ঘাট পুজা: বহনইকর বাঁধল ঘাট পুজেই ভউজাইএ। নাউআ সুপে দিআবরি সারুআই ধুনা পড়াই ঘাটেক পাটিটিকে তেল মাখাই তিন টিকা সিঁদুরে সিঁদরাউঅন তিন টিকা কাজরে কাজাউঅন পাছু আরুআ চাউরে দুব ঘাঁসে ঘাট চুমাউঅন ভউজাইকর নেগ হেকেইক।

বর ঘারে বরকে কেনিআঁই গারে কেনিআঁইকে নাহাউএক পানি আনা ভউজাইকর নেগ হেকেইক। বহনঁইকর কড়ল ঘাট বাঁধল আর ভউজাইকর পুজঅল ঘাটে বর ঘারে বরকে কেনিআঁই ঘারে কেনিআঁইকে পুরুব মুঁহে গবচাইকন ভউজাইএ তেল হেরেইদ মাখাইকন ভউজাইকর আনঅল পানিঁই নাহাউঅন ভউজাইকর নেগ হেকেইক।

নাহাউঅল বাদে বরকে কেনিআঁইকে ভউজাইএ করাঁই চড়হাইকন ঘার ঝিঁকা ভউজাইকর নেগ হেকেইক।

ঘার ঝিঁকল বাদে মামাঘারলে আউঅল আকরাঁই আপন গুসটি ছাড়ি দসর গুসটি ঘারলে আউঅল থুভড়া ভাত বর কেনিআঁইকে ভউজাইএ খাউআউঅন নেগ হেকেইক।

পথেঁইর কড়া ঘাট বাঁধা ঘাট পুজাক সারভার: (১) পাটরা কুঁড়হা, (২) ছাগেইর লাদাড়ি, (৩) ভুস মাটি, (৪) হেরেইদ গুঁড়ি, (৫) চুলহামাটিক গুঁড়ি, (৬) ধান, (৭) দহিক চুকা, (৮) চেঁগ মাছেকর চুকা, (৯) চাউর ভুজল, (১০) চিউড়া ভুজল, (১১) লহা, (১২) কুড়থি, (১৩) রসুন, (১৪) হেরেইদ গাঁঠা, (১৫) ঘিউ, (১৬) নাটই আর নাটই সুতা, (১৭) বেগর বাঁধনাক ডালি টুপা বেউনি সুপলি গুড় চিউড়া, (১৮) বেইগন / কঁঠঅর, (১৯) ফুল ডালা চমক চুকা সিরিবারি ঝারাবারি সেইলতা সিধিআ, (২০) হঁসুআক বাঁবেইর, (২১) পাত পিতর, (২২) সন, (২৩) সিঁদুর, (২৪) জড়ঠিলিআ, (২৫) আজি সাড়ি, (২৬) মাঁই সাড়ি, (২৭) ধাই সাড়ি, (২৮) কেনিআঁই সাজ মউর, (২৯) সালাধতিক ধতি, (৩০) সাজনি সাড়ি, (৩১) তেল, (৩২) কেনিআঁই বাহরাউঅন ডালা, (৩৩) আকন্দ ফুলেক মালা, (৩৪) পান পাত, (৩৫) খিলি পান, (৩৬) হঁঠুআ বিতি পেরিআঁই গুড়েক পিঠা হালে মিঠাই।

(ক) গাঁড় মাহতঅক হঁতে ২৫ টা, (খ) কেনিআঁই মাঁইএঁক হঁতে পাঁচকুড়ি, (গ) আনগাঁই জহড়ল পাঁচকুটুম হঁতে পাঁচকুড়ি, (ঘ) সলঅআনাক হঁতে পাঁচকুড়ি।

থুভড়া ভাত খাল বাদে বরে মামা ঘারলে আউঅল বর সাজে সাজিকন আম মউরা খাউআউঅন খাতির বাজবাজনা সহবতে আম তর জাই।

আম মউরা খাউআউঅনকর সারভার: নাউআ সুপ সারুআ ধুনা দিআ আরুআ চাউরকর গুঁড়ি আরুআ চাউরকর গুঁড়িক ঢেলা গবর ঢেলা মাটাইএ সুতা সিঁদুর দুব ঘাঁস দহি গুড় সেইরসা বঁগউরা আরুআ চাউর ভেলুআ এক ঘটি সুঘড় পানি হেনতেন।

(৮) আম মউরা খাউআন: আম মউরা খাইএক হঁকে হকদারি:- মাঁই, গুঁগুঁমাঁই, কাকিমাঁই, আজিমাঁই, ফুফু, মসি হেনতেন। ঠউকা কাথাঁই দুধ পিআ আল ছউআ উমেইরে জাখরাক দুধ পি কন জিউই রহাইক।

আম মউরা খাউআউঅন বা আম মউরা খাউঅন নেগটাঁই হালেহুঁ পুরখেনি নেগ চার চালু আহেইক। মেনতুক নেগটাক নামটা বিলটিকন আম বিহা নামটা চালু হেলাহেইক। ই-নেগটা আম গাছ তরে হালে আকরাঁই আম গাছকর ডাইর কাটি আনি পিছুআইড় বাড়ি বাটে গাড়িকন আম মউরা খাত বা অমলঅ খাত। নেগটাক নেগ-চার, চাইল-চলনেক ভাঁজনে ভেউরাউঅনে আর নেগি গিতে সাবুত পাউআইক নেগটাক নাম আম বিহা নঁহেঁইক। সাইবত মাঁহাঁন আম মউরা খাউআ হেকেইক। নেগ-চার, চাইল-চলন আর গিত ছাড়ি কুড়মাল ভাখিক ভাঁউঅর অরে লিঁগগা বাছনে আম নর লিঁগগা বাছাইক।

ঢেঁসনা: আমটা গিরেহেইক। আমটাকে খাঁহি। হেনতেন। কুড়মালি ভাখিঁই 'টা' সাড়াঁই নর লিঁগগা আর 'টি' সাড়াঁই মেদি লিঁগগা বাছাইক। বর নর লিঁগগা আর আমঅঁ নর লিঁগগা হেকেইক। বরাকবইর লিঁগগাই বিহা হেউএ নিঁহিঁ পারেইক। নর লিঁগগাক সঁগ মেদি লিঁগগাক বিহা হেইক। অহে অরে সাবুত পাউআইক নেগটাক নাম আম বিহা নহেইক আম মউরা খাউআ নামটাই ঠিক হেকেইক।

এহে নেগটাক বেউরা ভেউরাউএক বা হেতু টুঁড়এক কসনি করিঅ। সারনা ধরমে কুড়মালি চারিঁই বিহাক নেগে-চারে চালু রহল নেগ-চার গিলাক নেগি গিতে আর নেগ-চার গিলাক বাছট গেআন অরে বেসসির ভাঁগাঁন ছাড়ি বিহাক বেউরা টুঁড়হনকর দসর ডইর নেখেইক। কাহে নঁঅঁ বিহাক নেগ-চার লেইকন চিসল কনঅঁ পথি রহল সাবুত নিঁহিঁ পাউআইক। টউআ টউরনে টউরাইক নিঁহিঁ নিআঁর কন আরজান পেরিআলে পেরিআক পেরিআ চলি আউঅল নেগে-চারে কুড়মি সমাজকর বিহাক নেগ-চার চালু আহেইক। দেখি সিখি, সুনি সিখি কুড়মিঁই আপন চারি বেগর ভজাল নিফুট, নিদাগি জিআউলাহাত জগাউলাহাত।

অহে বেগরভেজাল বিহাক চারে-নেগে আর নেগি গিতে সাবুত পাউআইক বরেক বাপে কেনিআঁইকর জনম বেরাঁই কামে জউআল সারভার কেনিআঁই বাপকে ঘুরাই দেউঅন চার কুড়মালি চারিক নেগে-চারে চালু আহেইক। অহেঅরে আল লে ঠাড়, ঠাড় লে কেনিআঁই থানিজ হেউআ তড়িক কেনিআঁইকর তেঁতার-সুঁসারে,

আলন-পালন খাতির কামে জউআল সারভার খরচ-পাতি বরেক বাপে কেনিআঁই বাপকে ঘুরাই দেইকন কেনিআঁইক দাদন দাই ছাড়া করা চার বাটেলে কুড়মি সমাজে কেনিআঁই পনকর চার উচরল রহেইক আর হালেহুঁ চালু আহেইক। আবগ অতনে নিঁহিঁ কেনিআঁই থানিজ হেউআ লে সিঁদরাদান তড়িক কামে জউআল সভে সারভার লুগা-ফাটা, গনহনা গুড়িআক ভার বরেক বাপে বহা চার চালু আহেইক।

সারনা ধরমে দাদন দাইএ গিরি রহা কেনিআঁইকে পহনা উমরিআ বেটা জেঁই ঘার-কননা কিছু জানেই নিঁহিঁ সমাজ বুঝেই নিঁহিঁ অহে বেটাক কাঁধে চড়হাই দেউআ গরহিত গনাইক। বিহাক বাঁধনে বাঁধাইকন বরে জিনগানি ভইর কেনিআঁইকর সভে আপাভার বহেই। অহেঅরে কেনিআঁইকে দাদন দাই ছাড়াইকন নিফুট, নিদাগি করা সারনা ধরমে ধরমিআঁ কাম গনালাহেইক।

বরেক আবগা জেনিমিলন ভুখ মেটাউঅন আপাভার কেনিআঁইএঁ বহেই। অহে ভুখ মেটাউঅনে কন খরচ-পাতিক চাইড় রহেহেইক নিঁহিঁ। অহেখাতির কেনিআঁই বাপঠিন বরেক বাপকর কনঅঁ দেনা-পাউনাক নাতা রহেহেইক নিঁহিঁ। মেনতুক বরকর আপন দাদন দাই ছাড়া হেউঅন চাইড় রহেহেইক। দাদন দাই গিরি রহিকন কেনিআঁইকর আপাভার কেঁধিআউঅন আরঅ ডাগর গরহিত কাম গনাইক।

বর দাদন দাইএ গিরিরহা-ই- তঅ বেড়ে বেঠিক কাথা। কাথাটা বেড়ে বেঠিক নহেঁইক বিচকুম বেড়ে ঠিক হেকেঁইক। আপন হাঁতটাকে মুড়েক মগজেক গেধিটাক ভাঁড়ার ঘার সামকরাইকন বেসসির হাঁতড়াউলে হাঁতড়াই পাউবেহে মাঁইএঁক কইখলে নিছড়াইকন ধরতি মাঁইএঁক করাঁই ঝঁকাই রহল বেরালে আল লে ঠাড়, ঠাড়লে মুঁহ জুঠি আগু তড়িক ধরতিআলি আহার জিরাউঅন সউআঁগ নিঁহিঁ রহেহেইক। উ-বেরা আবগা মাঁইএঁক দুধ সার, সাহাই আর ভরসা রহেহেইক। আম মউরা খাউআউঅন নেগকর নেগ-চার আর নেগি গিত বেসসির ভেউরাউলে বেউরা পাউবেহে আর নেগি গিতটাক বেসসির ভাঁগাঁন ভাঁগলে সাবুত পাউআইক মাঁইএঁক দুধেক দাদন সুধান চাইড় রহেহেইক। গিতটাঁই কহাইক—

এহ পারে আমেক বাগান।
অহে পারে জামেক গঅ।।
মাঝে তহ খিরাই নেদিক বান।
কাটি দে গঅ বাপু মরঅ।
খিরাই নেদিক বান গঅ।।
হামে জাবঁ ধনি আননে।
তঁই এ জে জাবে বেটা ধনি আননে গঅ।।

দেইএ রাখেঁ দুধেকেরি ধার।
দুধেকেরি ধার মাঁই গঅ।।
সুধালে নি সুধাই গঅ।
পিনডি পাড়ি করবঁ উপার।।

সাইবত মাঁহাঁন দুধ পিইকন বাঁচি রহা উমেইরে জাখরাক দুধ পিই বাঁচি রহা উমেইরে জাখরাক দুধ পিই বাঁচি রহাইক, গাতে সউআঁগ সঁগরেইক রকমে রকমে বুঁদ (বিন্দু) ডাঁটাইক বর অখরাক ঠিন দাদন দাই-এ গিরি রহেই। দুধ পিআউএক হঁকে হঁকদারি হেকত মাঁই, আজিমাঁই, গুঁগুমাই, কাকিমাঁই, দুধু মাঁই, মাঁমিমাঁই, মসিমাঁই, ফুফু। অহে অরে অখরাই আম মউরা খাইএক হঁকে হঁকদারি রহত। বরেক বাপে অখরাকে সবাইকে নাউআ লুগা দেইন।

হিঁআঁকা ডাগর খঁচ উঠেক ছেউর মাঁইএক দুধেক সঁগ আমকে ভেউরাউঅন? মাঁইএক দুধে সঁগ আমকে ভেউরাউএক পহিল ছেউর আল ছউআ মাঁইএক দুধ পিইকন সঁগে সঁগ অকাইকরি দুধটা উলগি বাহরাই দেথিক। ইটাকে দহি উলগা কথিক। উলগঅবাইএ দুধটাই আল ছউআঁক ঢড়হা সুধা হেইন। ঢড়হা ভরি নিঁহিঁ রহেহেইন। ঢড়হা সুধা হেইন। আর অহে খাতির ছউআ কাঁদত। দুধটা অকর গাতেক হিতে লাগেইক নিঁহিঁ। জন ছউা সাঁগি উলগেই অকে আম পাতেক ভেঁখুআক রস পিআউলে অকর উলগনিঁটা রকাইক। পিঅল দুধটা ঢড়হাঁই ভরি রহেহেইক আর অহেখাতির পিঅল দুধটা অকর গাতেক হিতে লাগেইক। অহেঅরে আম পাতেক ভেঁখুআক রসকে মাঁইএক দুধেক সঁগ বরাকবইর ভেউরাউলাথিক আর পুরখেই পিড়হিক বুড়হা পুরখারাই কন আনজান পেরিআঁই বার আম মউরা খাউআউঅন নেগটাক বাটেলে অকর আপন দাদ দাই ছাড়াহেউঅন ভাঁজিকন নেগটাক বিহাক চারে সঁঝড়লাথিক। আর ইটাক নাম বরে আম মউরা খাউআউঅন রাখলাহাত। দসর ছেউর মাঁইএক দুধেক ঢড়হা ভরাউঅন গুনে গুনমান হেকেইক। আম ফরকর ঢড়হা ভরাউঅন গুন আহেইক। মাঁইএক দুধেক তার সউআদ অহেখাতির মাঁইএক দুধকে কথিক। আম ফর করঅ তার সউআদ অহে খাতির আম ফরকেউ অমরিত ফর কথিক। আবগা অতনে নিঁহিঁ বসমতা মাঁইএক করাঁই মানুসেক আহারেক আলেখা গাছেক পাত, ফুল, ফর, কাঁদা মানউআঁই আহরাউঅত মেনতুক আবগা আমএঁ বিহাক বানার বানরাউএ বাছালাহেইক।

টেঁসনা: বেগর বিহউলা বিহউলি কুঁআঁর কুঁআরি ছউআঁই কুহুআল মেনতুক বেগর এঁঠিআল আম ফর খাইকন কুহুটিকে দুইটি আঁগুরে চিপিকন উপরবাটে ছিটকাই উঠাউথিক আর কহত "কুহু গে কুহু, মর কন বাটে বিহা হেতি"।

পহিলে বচকালাহেই কুড়মি সমাজে বরে বিহা করেই আর কেনিআঁইএঁ বিহা লেই। অহেঅরে বর সঁপড়ন আগু আর কেনিআঁই সঁপড়ন পাছু। আম মউরা বেগর খাউআইক বিহা করে জাইএক হুকুমনামা বরকর নিঁহিঁ রহেহেইক। আম মউরা খাউআউঅল পাছ বরকর ঘার সামাইএক হুকুমনামা নেখেইক। অহেখাতির সিনান-নাহান সরাইকন থুভড়া ভাত খাইকন বর সাজ পিঁধি-অড়হি বর বহনঁইকর কাঁধে চড়হি আম মউরা খাউআউএক হঁতে আমতর জাই। জাইকন পহিল আমগাছটাকে তিন ধাউ পানি ঝিমকা ঝিমকাইকন আরুআ চাউরেক চুনিকে পানিঁই গরি আমগাছটাঁই পাঁচটা থাপনা থাপেই। থাপনাগিলাক মাঝ বরাকবইর দাঁজি সিঁদুরকর টিকা টিকাউঅঅত। অহে টিকা গিলাক মাঝেক টিকাটি ঠিন বরে নাটাইকর সুতাক অর টে পটাকে চিপি রাখেইক আর বহনঁইএঁ নাটাইএক সুতাটাকে উধনাই উধনাই বরেক বাঁউআ গড়কর কেনি আঁগুঁরটিই বাঝাইকন বাঁউআঁকান তড়িক উঠাইকন বাঁউআ কানে বাঝাইকন সাত ধাউ বাঝাউতাক আর গড়েক কেনিআঁগুরটি ঠিন সুতাটাকে টুঁগতেইক। টুঁগল অহে সুতাটাকে তিন দবড়ে দবড়াইকন তিনটা আম পাতে তিনটা গটা আরুআ চাউর তিনটা দুবঘাস তিন টিপকা হেরেইদ গুঁড়ি গুলপুটাইকন সুতাটাঁই আড়াইস গাঁইঠে গেঠিআউঅত। অহেটাকে কথিক কাঁকনা।

অহে কাঁকনাটা বহনঁইএঁ বরকর দেইনা হাঁতে বাঁধি দেইকন অহেটাকে কথিক কাকনা বাঁধা। তাকর পাছু পাঁচটা আম পাতেক ভেঁখুআ বরকে বহনঁইএঁ দেতেইক। বরে অহে ভেঁখুআগিলাকে মুঁহেঁ নুড়িকন রমে রমে চাবিকন রস বাহরাউঅত। আম মউরা খাউঅনিরা নাউআ লুগা পিঁধিকন আম তরে পুরুব মুঁহে গড় পাসরাই থেপড় গবচঅত। বর অখরাক জাঁঘে গবচেই আর আম ভেঁখুআক রসটা আম মউরা খাউঅনিরাক ছাঁদল উঁজরাঁই রিচিক পুরকি দেইন। অহে পুরকল রসটা সঁগ দহি,গুড়, পানি মেসাউঅত। অহে আম ভেঁখুআক রস সঁগ দহি, গুড়, পানি মেসল রসটা আম মউরা খাউঅনিরাঁই সুরপ পিঅত। ইটাক আম আমলঅ খাউআ কথিক। তেখড় তেখড় তিনধাঁউ আমলঅ খাউআ নেগ কুড়মালি চারিঁহি চালু আহেইক। সভেলে আগু আজি মাঁইএঁ আর সভেলে পাছু মাঁইএঁ আমলঅ খাই। মাঁইকে আম মউরা খাউআউল পাছু বর মাঁইকর করালে উঠি ঠঁড়হুআই আর মাঁইকে হাঁথে ধরি উঠাউএইক তাকর পাছু মাঁইকে গড়লাগেইক। মাঁইকে গড়লাগল পাছু উতনা আম মউরা খাউঅনির হত একাঁই একাঁই সভেকে গড় লাগেইন। তাকর পাছু আম গাছটাকে তেখড় তেখড় তিন তেখড় ভেঁট আঁকাইড় লেইক। ভেঁট আঁকাইড় লেল বাদে বরিআত সহ বাজবাজনা সহবতে বর বরিআত সভেকারা এক সঁগে কেনিআঁই ঘার বিহা করেক হঁতে জাত। কেনিআঁই ঘার বিহা করে জাইএক আগু মাঁইঁএ বরকর বাঁউআ হাঁথেক

কেনিআঁগুরটিকে রিচিক চাবেইক আর সুধিআউএক "কাঁহা জাহিস বেটা"? জবাবে বরে মাঁইকে কহেইক "কামিন আনে জাঁই মাঁই। হিঁআঁকা দুইটা ডাগর খঁচ উঠলেইক। রঁদিকে খঁচ গিলা উঠাউএ হেতেইক। পহিল খঁচ বরে আম গাছকে ভেঁট আঁকাইড় লেউঅন। দসর খঁচ কামিন আনে জাউঅন।

সারনা ধরমে কুড়মালি চাঁরিঁই বরাকবইর বরাকবইরে ভেঁট আঁকাইড় লেউআ লেউই হেত। সমধিঁই সমধিঁই ভেঁট আঁকাইড় লেউআলে লেউই হেত। ফুলে ফুলে ভেঁট আঁকাইড় লেউআ লেউই হেত। বর আর আম গাছ সমধি সমধি হেই নিঁহিঁ পারঅত। বিচকুম ফুল ফুল হেউএ পারত। আর হিঁআকা বর আর আম গাছ অহে ফুল ফুল নাতাঁইএঁ ভেঁঠ আঁকাইড় লেউআটা সাইবত মাঁহাঁন ঠিক হেকেইক। ফুলেক কাম কাজাপ ফুল ঘারে আকরা দিন আউএইন হেলে অহে আকরা মেটাউঅন। বরেক কাম আপন তিরিআক ঢড়হা ভরাউঅন। বরেক ফুল হেলেইক আমগাছ। বরে আম গাছকে আড়হাই রাখেহেইক কাজাপ মর মরন হেই হেলে মার লেগে তঁই তর ফুলিন মর তিরিআকর ঢড়হা ভরাউঅন আপাভার তকে সঁপলঁ। হিঁআঁকা তচবিচ করেক কাথা আম গাছকর কিনা মানুআকর ঢড়হা ভরাউঅন সঁউআঁগ আহেইক। বেসসির দাঁজলে ভাঁজলে টউরাইক। হঁ আম গাছকর মানুআক ঢড়হা ভরাউঅন সউআঁগ আহেইক। ভুখে ছিছিআড় বুলাক বেরা কইটা আম পাকল নুড়লে মানুআঁক পেটে রিচিক থলহেইন। ছিছিআনিটা থুমাইক। মনটা থিরপিতাইক। ঢড়হা ভরাভরি আম ফর খালেউ মানুআক পেট বা গতর বগড়েইক নিঁহিঁ। আমফরকর গুন সগুন গুন হেকেইক বদগুন নঁহেইক। অহে সাত পাঁচ ঠানিকন বুড়হা পুরখারাঁই আমগাছ সঁগ বরকর ফুলপাতাউঅন চারটা কুড়মি সমাজেক বিহাক চারে সঁঝড়ল আহাত।

দসর খঁচ কামিন আনে জাউঅন। কাথাটা কামিন আনে জাঁই হেউএ নিঁহি পারেইক। বিচকুম কামি আনে জাঁই হেই পারেইক বা হেকেইক। কামিন কাথাটাঁই সড়ঘড়াহি হামরা বুঝিঅ। জন মেহরারুটি নিত বেরনে বা মাসাহি বেরহনে কাকরঅ ঘারে কামে খাটেই অঁই কামিন কহাই। মেনতুক জাকে মুঁড়ে সিঁদুর ঘঁসিকন বরেক বহু বা তিরিআ আর ঘারেক পতউহু মানিকন ঘার ঝিঁকেই হউক উ তঅ নিত বেরনিঁআ বা মাসাহি বেরনিআঁ গনাই নিঁহিঁ। বিচকুম উ তঅ ঘারেক দসর লক নিআঁর ঘারেক এক লক হেই জাই। অঁই তঅ ঘারেক কামিন হেই নিঁহিঁ পারেই বিচকুম কামিন খাটাউতাহির গলিন হেই। এহে মতে কাথাটা কামিন নহেইক। কামিন কাথাটা বগড় কাথা হেকেইক। আসলে কাথাটা কামি হেকেইক। কামি সাড়াটা তনতঁত সাধন মতে 'ক' কার 'আ' কার (া) 'ম' কার আর 'ই' কার (ি) কড়টি বেগ (গতি) নিখরান কড় হেকি। অহেঅরে গটালিআ কামি সাড়াটাক মানে বরম জেনি বা মাঁহাঁজেনি মাঁহাঁন

বাউ বা বাসাত ভরলাহেইক আর বরমে বেগ আহেইক। কামি আনে জাঁহঁ কাথাটাক মানে জাকর বরম জেনি বা মাঁহাঁ জেনি বাউএ ভরলাহেইক আর জাকর বরম মাঁহাঁন বেগ আহেইক অকে আনে জাঁহঁ। মাঁহাঁ জেনি বাউএ ভরি রহেহেইক আর বরমে বেগ রহেহেইক অহে দসাঁই ছাঁড়ে ছউএইল মাঁই হেই। জাকর ছাঁড়ে ছউএইল মাঁড় হেএক গুন আহেইক অকে আনে জাঁহ। মাহাঁজেনি বাউ বাঁড়ি (বায়ুশূন্য) আর বরম মাঁহাঁন বেগ নিঁহিঁ রহেহেইক অকর সিরজন সউআঁগ নিঁহিঁ রহেহেইক। অঁই ছউএইল মাঁই হেউএক লাঅক নঁহি।

৯) গুআ-টিকা: বরকর সগুন আউঅনকে আগবাড়হা করাটাকে গুআ-টিকা কথিক। বরকে আগবাড়হা করেক খাতির কেনিআঁইকর কাকা ঘটিঁই পানি আর আমপাত লেইকন মুঁহাই রহেইস। বর দুআইরে লাগলেই কেনিআঁইকর কাকা ঘটিক পানিঁই আমপাত ভিজাইকন বরেক মুঁড়ে তেখড় তেখড় তিন তেখড় পানি ঝিমকা ঝিমাউএইক তাকরবাদে দহি আর হেরেইদ গুঁড়া মেসাউঅল দহিটাঁই গুআটিকে জবকাইকন বরেক কাপাড়ে তিন ধাঁউ টিকাউএইক। অহে টিকাউঅনটাকে গুআটিকা কথিক। গুআটিকা নেগ সরল বাদে কেনিআঁইকর কাকাঁই বরকে হালে গাড়িলে বিতি পেরিআঁই পালকিলে হাতে ধরি নাভাউএইক আর থানিজ বর ডেরা লেগিকন গবচাউএইক। হহে অরে গুআটিকা নেগ সরাউঅত।

১১) ডুভাভাঁজন: মড়ই থানেক আগুবাটে এক লক পুরুব মুঁহে আর এক লক পচছিম মুঁহে গবচেক ডুল দুইটা গবচন বিছনা বিছাউঅত আর বরেক কাকাকে আর কেনিআঁইকর কাকাকে গাগাথিন। দুই তরফিআ কাকারা আইকন বরেক কাকা পুরুব মুহে আর কেনিআঁইকর কাকা পচছিম মুহে গবচত। অরা পেহিল গড় ধউআধউই হেত তাকর বাদে গুলাজ ফুলেক মালা বদলাবদলি হেত। তাকর পাছু মিঠাই খাউআখাউই হেই কন মুগুড়িঅ করত। তাকর পাছু ধউঅল বিখরল একটা ডুভা তিন ধাউ অদলবদল করত। এহে ডুভা অদলবদল বা বদলাবদলি করাটাকে কথিক ডুভা ভাঁজন। সরসগুনে বিহাক চারে ডুভা ভাঁজন নেগটা সঁঝড়ান হেতু দিঅ সমধি আইজলে দিঅ ঘারেক আকরা বা কনঅঁকুছুক কট কিনা হেলে দিঅ ঘারে দেউআ দেউই হেইকন আকরা বা কটকিনা মেটামেটি হেব। এক সমধি ঘারেক আকরা আরএক সমধি ঘারে মেটামেটি হেতে রহব। এক সমধি ঘারে আর এক সমধি ঘারকে ধন দউলত দেউআদেউই হেতে রহা নাতাঁই নাথাই রহহত। অহেঅরে মর ঠাননে বিতি পেরিআঁই নেগটাক নাম রহেইক ডুভা ভাগঅন। রকমে রকমে পিড়হি উতার হেবাইএ ডুভা ভাগঅন সাড়াটা বিলটিকন ডুভা ভাঁজনে ঠড়হুআলাহেইক। ডুভা ভাঁজন সাড়াটা ডুভা ভাগঅন সাড়াক বিখনাল সাড়া হেকেইক। কাহে নঁআঁ সমধি জড়েক আগুই

তঅ ভাঁজা ভাজি হেত। কুড়মি সমাজে বেগর ভাঁজিকন সমধি ঘার জড়ত নিঁহিঁ। সুই সুতা পিঁধাউঅল বাদে তঅ ভাঁজাভাঁজি হেউএক কাথা নহেইক।

১১) পিঁধান অড়হান: বিতি পেরিআঁই কেনিআঁইকর সাজ কহেইতকে পাঁচন রহেইক। হালে সাড়ি, সাইয়া, বেলাউজ হেলাহেইক। কেনিআঁই সাজটা বরেক বাপে কেনিআঁই ঘারে জিমা দেইন। কেনিআঁই ঘার ভিতরে পিঁধি অড়হি কেনিআঁই সঁপড়নে সঁপড়ি বাহরাত। পিঁধান অড়হানকর খাতির কেনিআঁইকে বাহরাউঅন আগু কেনিআঁই কর কার্কিঁই নিঁহিঁ তঅ ফুফুঁই মড়ই থানেক আগুবাটে চউক পুরেই। অহে পুরল চউকটাক মাঝে কেনিআঁই গবচন বিছনা বিছাউঅত। তাকর পাছু কেনিআঁইকর কার্কিঁই নিঁহিঁ তঅ ফু ফুঁই কেনিআঁইকে করাঁই করি এক ঘটি পানি টিপকাই :টিকাই বাহরাউএইক আর চউকটাক চাইরবাটে আড়হাই পাক ঘুরিকন বিছনাটাঁই গবচাউএক। বর ঘরলে লেগঅল কেনিআঁই ঘার ঝিঁকল সিরিবারি ডালিটাকে কেনিআঁইকর বার্কিঁই বাহরাইকন কেনিআঁইকর আগুবাটে রাখেই। বরেক কাকা কেনিআঁইকে পিঁধাউএক খাতির আনল গহনা গুড়িআ লেইকন সিরিবারি ডালিটাক পাছুবাটে গবচেই আর সভেলে পেহিল সিরিবারিক দিআটি বরেইক তাকরপাছু ধুনাধুপ পড়াইকন পেহিল এক থান গহনাকে ধরতিমাঁইএঁ ছুআউএইক তাকর পাছু দিআটিক রাইসে ছুআউএইক। তাকর পাছু কেনিআঁইকর কাপাড়ে ছুআউএইক আর কেনিআঁইকে পিঁধাউএইক। সভে গহনা পিঁধাউঅল বাদে বাঁউএ দেইনে পানি ডারি কেনিআঁইকে চুমাউএইক। গহনা পিঁধাউঅন পালি সিরালেই ঘার আনগা সুধা করি সভে মেহরারু বিহা গিত গাহি গাহি মহউরা তর মউহা মউরা খাই জাত। অহে বতরে মরদরাঁ হাড়ি বিহা আর সালা ধতি লুটা নেগগিলি আনগাক ছামড়াতরে মড়ই থানেক পাসে নিমটাউঅত।

১২) হাঁড়ি বিহা: বরেক সালা দুই কাঁধে দুইটি ঠিলিআ উভিকন মড়ই থানেক আগুবাটে আইকন ঠঁড়হুআই। বরে আইকন একটি ঠিলিআঁই সিঁদুরকর দুইটা ইসটানেই আর দসর ঠিলিআঠিঁই তিনটা ইস টানেই আর ঠিলিআগিলা বাজতা নিঁহিঁ নিআঁরে দুইটা রুপাক টাকা রাখি দেইক।

সিঁদুরকর ইস টানা বেউরা: একটি ঠিলিআঁই দুইটিঁই সকর মানে বুড়হাবাবা মাঁহাঁমাঁইকর আরদাসকর ঠিরিআনি হেকেইক। দসর ঠিলিআটিঁই তিনটা ইস টানা তেজ মানে ধরমঠাকুর বাউ মানে বাঘুত ঠাকুর বু মানে বানসিন ঠাকুরকে আরদাসকর ঠিরিআনি হেকেইক। পরকিতি পুজইআ কুড়মি জাইতে তনতঁত সাধন সাধা বাটেলে নললরহত অহে পাঁচ পরকিতিআ বল ছাড়ি দসর কনঅঁ মতে জিউ সিরজাইএক জ নেখেইক আর সিরজাল কনঅঁ জিউ জিউই রহেক জ নেখেইক। হাড়ি বাঠিলিআগিলা মেহরারুক কইখকর চিনহাপ হেকঅত।

সালা ধতি লুটা: কেনিআঁইকর ভাই কেনিআঁইকর লগদি কাঁধে চড়হি মুড়ে নাউআ ধতিক পাগড়ি বাঁধি ছামড়া তরে ঠেঁড়হুআই বরঅ নাউআ ধতিক পাগড়ি বাঁধি আপন লগদিক কাঁধে চড়হি ছামড়া তর আউএই। পেহিল তথ ঘটিক পানিঁই আম পাত ডুভাইকন তিন ধাঁউ আম পাতেক পানি ঝিমকা ঝিমকি হেত তাকর পাছু গুলাজ ফুলেক মালা বদলাবদলি করঅত। তাকর পাছু মুড়েক পগড়িগিলি বদলা বদলি করঅত। ধতি মানে তঅ লুগা। লুগাঁই মানুআকর লাজ ঢাঁপাইন ভরম রহেহেইন। সালা ধতি লুটা বাটেলে দিঅ সালা বহনই দিঅ ঘারেক লাজ ভরম রাখারাখি হেউঅনকর ঠিরিআনি হেকেইক। ডুভা ভাগঅনে দিঅ তরফকর কাকারা দিঅ ঘারেক ধনকর কটকিনা বা আকরাক দিনে ধন দেউআ লেউআ হেইকন দিঅ ঘারেক আকরা নিমটাউঅনকর হঁমাইন হেউআ হেকেইক অহে ডুল দিআ সালা বহনই ধতি বদলাবদলি করিকন দিঅ ঘারেক লাজ ভরম রাখারাখি করে হঁমাইন হেউঅনকর ঠিরিআনি হেকেইক।

মউহা মউরা খাউআ: কেনিআইকে পুরাক পুইর কেনিআই সাজে সাজাইকন ঘার আনগা সুধা করি মেহরাকরুক গাহদি মউহা মউরা খাই খাতির মউহা তর জাত। অহে পাঁকে মরদকর দঁহগিঁই আনগা মাজে হাঁড়ি বিহা আর সালা ধতি লুটা নেগ সারঅত।

মউহা মউরা খাউঅনকর সারভার: নউআ সুপ, বরল দইকুআ, সারুআঁই আইগ, ধুনা, আরুআ চাউর, আরুআ চাউরেক চুনি, আরুআ চাউরেক গুঁড়িক ঢেলা, গবর ঢেলা, নাটাই সুতা, সিঁদুর, দুবঘাস, দহি, গুড়, ঘটিঁই পানি, সেইরসা, ভেলুআ, বঁগউরা হেনতেন।

মউহা মউরা খাউআউঅনকর হেতু: বরে আম মউরা খাউআইকন মাইএক দুধেক দাদন দাই ছাড়া হেই। অহেডুল কেনিআঁইকেউ মাঁইএক দুধেক দাদন দাই ছাড়া হেউআক চাইড় রহেহেইক। পরকিতি পুজইআ তনতঁত সাদন সাধইআ চাসকাম বিরিতে জিনগানি পুহাউতাহার কুড়মি জাইতে াসকামকর আগফেড় টউরনে পরকিতি মাঁইকর করাঁই ঝাঁকাই রহাল সভে নিআঁর ভুঁইফল জিউকর মানে গাছ লত পাতেক ধচর, গুন, মান টুঁড়লরহত। অহে টুঁড়হনিঁই অরা সাবুত পাউঅল রহত মউহা গাছেক ডাইরে মধু মাসে মউহা পাতকে জিউই রগেক রস জগাউঅন ছাড়া করেইক বিচকুম পাতেক রস চুহি সিরাউএইক। অহেখাতির মউহা ডাইরেক সভে পাত একে সঁগে মসুআই উচরেইক আর এক সঁগে পাতগিলি ঝড়িকন ডাইরগিলি খেড়রঅ হেইক। মউহাগাছ একদম খেড়রা গানি ফুলেইক। দুধ পিআ উমেইরে সভে ছউআ মাঁইএক দুধ পিইকন জিউই রহহত। মাঁইএক দুধেক সঁগ এক নিআঁর রস রহেহেইক জন

রসটা গাতে বহতে রহলে ছউআকে মানসাই নিঁহিঁ দেইন। অহে রসটা গাতে বহতে রহাক একটা থানিজ উমেইর আহেইক। থানিজ উমেইরটা হেকেইক ১৬ বছর লে ১৮ বছর তড়িক। মেনতুক তনতঁত সাধন সাধইআ কুড়মি জাইতে বেটাবেটিকে বিহা দেউএক উমেইর থানিজ করলাহাত। পহনা উমেইর পহনা উমরিআ ছউআক গাতে অহে রসটা বহতে রহেহেইক। অহেখাতির অহে রসটা লেগাতকে খেড়রাউএক চাইড় রহেহেইক। দসর বাটে পহনা উমরিআ কেনিআঁইকেউ মাঁইএক দুধেক দাদন দাই ছাড়া হেউঅন বরঅ চাইড় রহেহেইক। অহে দিঅ চাইড় নিমটাউএ চাসকামে ভুঁইফড় জিউ লেইকন কারবারিআ কুড়মি জাইতে বেজাঁই ঠানি, দাঁজি, ভাঁজি তই করল রহত মউহা গাছে পাতকে রস জগাউঅন চাড়া করিকন পাতেক রস নিজ চুহিকন খেড়রঅ হেইকন ফুলে ঝবরেই। অহে ডুল কেনিআঁইএউ আপন মাঁইএক ঘুরাই দেইকন আপন গাতকে খেড়রাউঅন দিঅ চাইড় নিমটেহেইক। ইড় নিমটাউঅন বাটেলে পুরখেইন পেরিআক বুড়হা পুরখারাঁই কুড়মালি চারিক বিহাক চারে কেনিআঁইএঁ মউহা মউরা খাউআউঅন চারটা কুড়মালি বিহাক চারে সঁঝড়লাহাত।

. মউহা গাছেক পাত ঝড়িকন গাছটা খেড়রালে গানি মউহা গাছ ফুলেক খাতির ডাইরে খঁচ ধরেইক। অহেডুল মেহরারুক গাত খেড়রালেগানি অখর গাতে মেহরারু ধরম মানন খাতির অখর কইখেরহল খঁচ ডুল কইখে ফুল ফুটেইক। আর মেহরারু ধরম মানন লহু জেনি দুআইরে টগরেইন। মউহা গাছেক খঁচ আর মেহরারুক কইখকর গড়অন আর ধরম একে নিআঁর। অহে খাতির মউহা গাছেক খঁচকে আর মেহরারুক কইখকে বরাকবইর ভেঁউরাউঅল জাইক। এহে নিআঁর বাছট গেআন আধারে কেনিআঁইএ মউহা মউরা খাউআউঅন চারটাকে সমাজে মাইন দেলাহেইক।

মউহা মউরা খাউআউঅন বা খাউঅনকর নেগ-চার: আম মউরা খাউঅনকর নেগ-চার, চাইল-চলন মাননেই মউহা মউরা খাউঅন নেগ সরেইক। কেনিআঁইএঁ পেহিল মউহা গাছটাক ফেড় গুড়িটাঁই তেখড় তেখড় তিন তেখড় পানি ঝিমকা ঝিমকাউএক নেগ হেকেইক। তাকর পাছু আরুআ চাউরেক চুনিটাকে পানিঁই গরিকন তর হাঁতটাকে গরল চুনিটাঁই চবড়াইকন মউহা গাছটাক ফেড় গুড়িটাঁই পাঁচটা চুনিক থাপনা থাপা নেগ হেকেইক। পাঁচঅ থাপনাক মাঝেক থাপনাটাক সিঁদুর টিকাটাঁই নাটইকর সুতাক অর টেঁপটাকে বাঁউআঁ হাঁথেক টেপনি আঁগুরটিঁই চিপি রাখা নেগ হেকেইক। এধাঁউ বহনইএঁ নাটইকর সুতাটাকে উধনাঁই উধনাঁই কেনিআঁইকর বাঁউআ গড়েক কেনিআঁগুরটিঁই বাঝাইকন বাঁউআঁ কান তড়িক উঠাইকন গড়েক কেনিআঁগুরটিঁই বাঝাউতেইক। সুতা উঠাউঅন নাভাউঅন নেগটা তেখড় তেখড় সাত তেখন করল বাদে কেনিআঁগুরটি ঠিন সুতাটাকে ঠুঁগতেইক। ঠুঁগল সুতাটাকে

তিন দবড়ে দবড়াইকন তিনটা মউরা পাতে তিনটা গটা আরুআ চাউর, তিনটা লত দুব ঘাঁস, তিন টিপকা হেরেইদ গুঁড়ি দেইকন পাতগিলিকে তিন ভাঁজ করি গুলপুটরাউতেইক আর দবড়াউঅল সুতাটাঁই আড়আইস গাঁইঠে গেঁঠিআউতেইক। অহে গেঁঠিআউঅল পাতেক গাঁইঠাকে কাঁকনা কথিক। বহনইএঁ অহে কাঁকনাটা কেনিআঁইকর দেইনা হাঁতে পিঁধাউএইক। তাকর পাছু বহনইএ পাঁচটা মউহা পাতেক ভেঁখুআ ঠুংগিকন ভেঁখুআগিলি কেনিআঁইকে দেইক। কেনিআঁইএঁ ভেঁখুআগিলি মুহে নুড়িকন রমে রমে চাবিকন রস বাহরাউএই আর আমলঅ খাউঅনিরাক ছাঁদল হাঁতে অহে মউহা রসটা সঁগ দহি, গুড়, পানি মেসাইকন সুরপি পিঅত। এহেটাকে কথিক মউহা মউরা খাউআ। মউহা মউরা সভে পেহিল আজিমাঁইএঁ খাই। আর সভেলে পাছু মাঁইএঁ খাই। মউহা মউরা খাউআউঅল পাছু কেনিআঁইএঁ মাঁইকে হাঁত ধরি উঠাউএইক আর গড় লাগেইক। মাঁইকে গড় লাগল পাছু একাঁই একাঁই সভে আমলঅ খাউঅনিরাকে গড় লাগেক নেগ হেকেইক। আমলঅ খাউঅনিরাক গড় লাগল পাছু মউহা গাছটাকে ভেঁট আঁকাইল লেউআ নেগ হেকেইক।

কুড়মালি চারিঁই সমধিঁই সমধিঁই ভেঁট আঁকাইড়ে আঁকড়াআঁকড়ি হেত। ফুলে মানে মিত্রঁই ফুলে ভেঁট আঁকাইড়ে আঁকড়া আঁকড়ি হেত। হিঁআঁকা মউহা গাছ কেনিআঁইকরসমধি হেই নিঁহিঁ পারেইক বিচকুম ভেউরাউলে ফুল হেই পারেই। কাহে নঁঅ অরাই ফুল নাতাঁই জড়াই পারত জারাক গাতেক গড়ন বরন একেডুল হেইন বা জারাক গুন, মানু, ধচর একে ডুল রহেহেইন। হিঁআঁকা মর ঠাননে মউহা গাছেক সঁগ কেনিআঁইকরক ফুল পাতাউঅনটা সহি হেকেইক। মউহা গাছ গটা গাছ খেড়রা লে গানি ফুলেক অহেডুল কেনিআঁইকর গাতে বহতে রহা রসটা জল রসটাঁই মেহরারুকে মেহ রা ধরম মাননে রকেটেকে টেকাউএইক অহে রসটা সুখি সিরাইকন গাত খেড়রালে গানি মেহরারু ফুলত মানে রিতু সিনানে সিনান। দসর হেতু মউহা ফুলেক রসে মানুআ মাতাই রহত। অহে ডুল মেহরারুঁই আপন সঁইআঁকে বেসবাসি জেনি মিলন ভুখ মেটাউঅন বাটেলে মাতাই রাখথিন। ফুলেক কাম হেকেইক আকরাক দিনে ফুলকে লরেই চোলাউঅন। অহেঅরে কেনিআঁইএঁ অকর ফুল মউহা গাছকে আড়হাই রাখেইক কাজাপ মই মরি হারআই জাঁউ হেলে মার লেগে তরা তহর ফুলেক রস পিআইকে মর সঁইআকে মাতাই রাখবাহান মর আকরা বুঝে দেবাহান নিঁহিঁ। কুড়মালি চারিঁই মাঁইএক দুধেক দাদন দাই ছাড়া হেউঅন আর আকরা মেটাউঅন ঠানন বাটেলে বিহাক চারে মউহা মউরা খাউআউঅন চারটা পুরখেইন পেরিআক বুড়হা পুরখারাঁই সঁঝড়লাহাত।

১৪) সিঁদরাদান: কুড়মালি চারি মতে সরসগুনে বিহাক নেগ-চার বুঝা বিসুম দাই।

কাহে নঅঁ কেনিআঁহি দেখাক বেরা কেনিআঁহি দেখইআরাকঠিন কেনিআঁহি দেখাই হেইলাই কেনিআঁহি চলি বাহরাই। রেবাইরেক বেরা কেনিআঁহি বরেক বাপ-কাকা, পাঁচ কুটুমকর আসিস ঝঁকে চলি বাহরাই। লগন ঝঁকেক বেরা লগন ঝঁকে কেনিআঁহি চলি বাহরাই। মেনতুক সিঁদরাদানেক বেরা দউরা মাঝে লহি পাটিক লড়হিঁই হালে পাটিই গবচিকন বহনরাক উভনিঁই উভাইহেইকন বাহরাই। এহে দউরা আর লড়হি ভগ আর বানকর চিনহাপ হেকেই। কাথাঁই কহাইক মেহরারুক হিআ ফাটেইন মেনতুক মুঁহ ফু টেইন নিঁহিঁ। জেনি মিলন ভুখে কতউ রগদালেই মেহরারুঁই কবউ মরদকে জেনি মিলনে মিলেলাই তইনাত আহঁ। দিঅ লকেক মত হেউআক খাতির জেনি মিলনে মিলেক ডহর ফেইরছাউঅন খাতির বরে সিঁদরাদান খাতির কেনিআঁহিকে হাঁতে ধরি দউরালে নাভাউএইক আর মাড়ুআসারকে আড়হাই পাক বেড়হাইকন আপন বাঁউআ বাটে গবচাউএইক আর নিজেউ গবচেই। এধাঁউ কাকিঁই সিরিবারি ডালিটা ঘারলে বাহরাউএই। সিঁদরাদানেক আগু পেহিল বরে কেনিআঁহিএঁ সিনে বদল করাকরি হেত। সিনেই বদলকর পাছু আঁকঅঁদ ফুলেক মালা পেহিল কেনিআঁহিএঁ বরকে পিঁধাউএইক তাকরপাছু বরে কেনিআঁহি পিঁধাউএইক। তেখড় তেখড় তিন তেখড় অহে নিআঁর পিঁধাপিঁধি হেত। এহে নেগগিলিাকে কথিক সিনেই বদল মালা বদল। সিনেই বদল মালা বদল বেরা আনগাক সভে মরদ মেহরারুঁই হরিবল সাড়াঁই আনগাকে আউল উঠাই দেথিক। এধাঁউ সিঁদরাদানেক পালি। পেহিল কেনিআঁহিএঁ বরেক ঘেঁচাক নটিঠিন হালে কাপাড়ে তিন টিকা সিঁদুরকর টিকা টিকাউএইক। তাকর প াছু বরে সনকে সিঁদুরে গাবাইকন কেনিআঁহিকর মুড়ে সিঁদুরে গাবাই দেইক। এহেটাকে কথিক সিঁদরা দান। সিঁদরা দান সরলে গানি কেনিআঁহিকে হাঁতে ধরি গবচাউঅনকর বাট বদলাউঅন খাতির বাঁউআ বাটলে দেইনা বাটে গবচাউএইক। এধাঁউ কেনিআঁহি মাঁইএঁ বেটি জাঁউআঁহিকে পরছেক পালি।

কেনিআঁহি মাঁইএঁ বেটি জাউআঁহিকে পরছন: পরছন সাড়াটা পর আর ছাঁহিরাউঅন সাড়া দিঅটালে গড়হালাহেইক। তনতঁত ডহর ডহরইআ কুড়মি জাইতে জানত তনতঁত দুইচেঁগাই চেঁগালাহেইক। এক চেঁগাঁহি ডহরলে জিউআতমা পরমআতমাঁই মিলিকন মকখ লাভ করাইক। আর কাজাপ ডহর বেঁড়াইকন মাঝ ডহরে দসর ডহরে ডহরলে বেগর লকিআ বল (অলৌকিক ... প্রাপ্ত হওয়া) জন বলে মানুআক বা আর দসর জিউকর হানিকরইআ বলপাউআইক। তনতঁত সাধন মতে এহে দিঅ বলকে সিখনাত বল (বিদ্যা) বেগর সিখনাত বল (অবিদ্যা) নামে নামাউলাথিক। বিহা ঘারে জহড়ল কাজাপ কনঅঁ বেগর সিখনাত বলিআনকর দুসান নেজেইর বর-কেনিআঁহি ঠিন বাঝেইন এহে দউআভউআঁহি কেনিআঁহি মাঁইএঁ কেনদ কাঠে ধুসরা গতাইকন কেন্দ

কাঠেক ঢেঁকিঁই কুটিকন দুসনি নেজেইরকে চুরচুর করেইক। এহেটাকে কথিক কেনিআঁই মাঁইএঁক পরছন।

খির খাউআ: কেনিআঁই মাঁইএক পরছল পাছু বর-কেনিআঁইকে ঘার ঝিঁকথিন। আর খির খাউআ নেগ সরাউঅত। বরে খির খাউআ নেগকর বাটেলে সসুর ঘারে পেহিল অন নুড়েই অহে খাতির সসুর ঘারে জাঁউআঁইকে পেহিল নুড়আউএক খাতির দুধেগুড়ে সিঝাইকন খির রাঁধঅত। আর বেটি-জাঁউআঁইকে খির খাউআউথিন।

ঘার ভরা: কুড়মি ঘারে ঘার মালকেইন মেহরারু। মরদে খাটিলুটি বাইরেক অন-ধন ঘার ঝিঁকেই মেনতুক নিজে সঁচেই-জগাউএই নিঁহিঁ। বাইরলে খাটিলুটি আনিকন আপন তিরিআক হাঁতে সঁপেই। তিরিআঁই সঁচেই-জগাউএই। অহে ডুল কুড়মি ঘারেক বেটি জেঁউতেঁউ পুতলি পিঁধা উমরিআ হেলি নঁ উ গবর পেথিআ লেইকন টাঁইড়ে টিকরে গবর বিছে চললি। হালে গবর বিছা পেসা ছাড়িকন পড়াসুনা খাতির পাঠসার জাহাত। চাস কামে মাটিকে সারগর করেক খাতির গবরকর চাইড় রহেহেইক। অহেঅরে আহনাঁই কহালাহেইক গবরে দবড়। চাসিভুঁই সারে মাতাউএক খাতির গবরকর চাইড় রহেহেইক। অহেখাতির বিছিকন সাঁগি গবর জহড়াউএ কুড়মি ঘারে জনমল বেটি গবরবিছা কামটাকে ধরমিআ কমা ঠানল রথিক। অহেঅরে কুড়ম ঘারে জনমল বেটি কুড়মি ঘারেক ডিনিমাঁই গনাইহেলা। অহে ডিনিমাঁ বাপ ঘার ছাড়ি সসুর ঘার জাতি। অকর জাবাইএ পাছে ঘারেক ডিনিমাঁই ঘার ছাড়তি নঁ কিনা এহে দউআভউআঁই কুড়মি সমাজে বিহাক চারে ঘারভরা চারটা সঁঝড়লাহাত।

১৫) চুমান: ঘার ভিতরে জাঁউআঁইকে খির খাউআউঅন আর বেটিকে ঘার ভরাউঅন নেগ মাঁই-কাকিরাঁই সরাউঅত। অহে বতরে ধি-পুতউহুরাই আনগাকে সাফা-সুথরা করি গবর পানিঁই লেপা-লরা করথিক। তাকরবাদে বর-কেনিআঁইকে চুমানে গবচাউথিন। চুমান সাড়াটা কুড়মালি ভাখিক সাড়া ভাঁড়ারকর সাড়া হেকেইক। চউ আরমান সাড়া দিঅ এক ধাঁউরিঁই সঁঝড়ান বাটেলে চুমান সাড়াটা গড়হালাহেইক। কুড়মালি ভাখিক চউ সাড়াটাক মানে চাইরবাটে।

টেঁসনা: চউকাটা। জাকর চাইর বাটে কাঠ রহেহেইক অহেটাকে চউকাঠা কথিক।

চউচড়: জাকর চাইরঅ বাটে উড়েক সউআঁগ রহহেইক অকে চউলল কথিক। আর মান সাড়াটাক মানে মান বা খাতির। জন নেগে চাইরঅ বাটেক মান খাতির জহড়েইক অহেটাকে চুমান কথিক। বিহা ঘারে কেনিআঁইকে চুমাউএক খাতির মামা, মসা, হিত-মিতান, কুটুম-বাটুম সবেকারা জাঁঘড়া জখে আপন চুমান হেঁথিআইকন কেনিআঁই ঘারে জহড়অত। আর চুমানেক বেরা কেনিআঁইকে চুমাউথিক। নৈঁহর ছাড়ি কেনিআঁই পেহিল জাতি সসুর ঘার। সসুর ঘার জাইকন জিনগানিক পেহিল নুড়াই হেতেইক

সসুর ঘারেক হেঁড়সারে। সাসে ননদে কঁদে কনটা সঁচি-জগাউলাহাত ঠিক ঠেকান নিঁহিঁ। অহেখাতির অঁই হেঁইসারে কামে জউআন সভে সারভার ঢেঁসনা- থারি, ঘটি, বাটি, ডুভি, ডুভা, বেঁইঠিন, খুসনি, ঝাঁঝরা হেনতেন চুমানে পাউঅল সভে সারভার লেইকন সসুর জাইএক নেগ হেকেইক। চুমান সরাউঅল বাদে বর-কেনিআঁইকে বিদাই দেউঅন।

১৬) বরেক মাঁইএক বেটা-পুতউহুকে পরছন: কেনিআঁই ঘারলে বিদাই লেইকন বর বহু লেইকন জিনগানি পেহিল ঘার সামাতাক। অহেখাতির বরেক মাঁই-বাপ, আড়-পড়সি সভেকাই বর -কেনিআঁইকে সগুন আউঅন জানাউএ আগবাড়হা করেলাই মুহাই রহহত। মেহরারু মহলে বিহা গিতে আউল ঠাই দেথিক। বরেক মাঁই-বাপ, বেটা- পুতহুকে করাঁই চড়হাই ঢবকা নাচ নাচে তইনাত রহত। ঢবকা সাড়াটা কুড়মালি সাড়া ভাঁড়ারকর সাড়া হেকেইক। একর মানে উপর বাটে চউকি উঠা। জন নাচে গড়কে উপর বাটে ঢবকাই উঠাউথিক আর ঢবকি উঠি উঠি নাচত অহে নাচটাকে ঢবকা নাচ কথিক। বরেক মাঁইএঁ নউতন পুতউহুকে আর বরেক বাপে আপন বর বেটাকে করাঁই চড়হাই আনগাঁই আরুআ ধান ঝিঁটি ঝিঁটি ঢবকা নাচ নাচত। ঢবকা নাচে মেহরারুক কইখ ফেইরছাইন ছাঁড়ে গাতে রহেহেইন। আর মরদকর সুক (বীর্য্য) বহা নাইরটি ফেইরছাইন সুক চেঠাল রহেহেইন। বেটা পুতউহুকে করাঁই চড়কহাই মাগ-ভাতার কর ঢবকা নাচ নাচাক তাকরম হেহেইক সাসে পুতউহুকে ঠিরিআউ হেইক এহে নিআঁর ঢবকা নাচ নাচলে চাঁড়ে ছউএইল মাঁই হবে। আর বাপে বেটাকে ঠিরিআউ হেইক জেনিমিলন আগু ঢবকা নাচ নাচলে চাঁড়ে ছউএইল বাপ হেবে। মঁই চাঁড়ে নাতি-নতকুরকর মুহ দেখম। আরুআ ধান ঝিঁটেক তাকতরম হেহেইক চাস বিরতি আর চাস কাম জিউআ চাসি কুড়মি জাইতে চাসকাম বাটেলে বচরি তচাসকামে মানুআক ঢড়হা ভরা আহার দানা ধান দানা উপজাঅত অরজত। তরা হামর বেটা-পুতউহু তরা বেসবাসিই রহিকন জেনি মিলনে মিলতে রহি ধিআ-পুতাক জনম দেইকন হামর মনেক খাইস মেটাউতে রহা। ঢবকা নাচ নাচি থকল বাদে বরেক মাঁইএ বরকে লহাক খাড়হু হাঁতে ধরাই দেইক বরে আপন বিহা করি আনল বহুকে অহে লহাক খাডহুটা পিঁধাউএইক। সরসগুনে হাঁড়ি রিহাক নেগ-চারকর সভে নেগ-চার লেইকন জাঁগড়া জখে তচবিচ করালেইক। তাউএ কাজাপ কাঁহুঁকা কনআঁটা ছাড়ালে বা কনঅঁ নেগে-চারে ভুল-চুক বা বিসরন হেলে দসিদার গনিহাঁ না কাহে নঁঅঁ মর উমেইর ৮০ বছর ডেগিকন ৮৫ বছরকর ধার পাস পঁহচা পঁহচি হেলাহি। অহেঅরে ৬০ লে ৬৫ বছর আগু মঁই বিহাক বাঁধানে বাঁধালাহঁ। অহেখাতির রিচিক আধেক ভুল-বিসর হেউআটা ধচিআ হেকেইক অহেখাতির মঁই

মাফি মাঁগি লেহন। অহেঅরে ঘুরিকন বচকঁহ সরসগুন বাদেউ কুড়মালি চারিক কুড়মি সমাজকর বিহাক নেগে-চারে আরঅ বেজাঁই নেগ-চার বিসবিসুআস মানি চলে কুড়মি জাইত গিরঅত।

টেঁসনা: (১) সিনেই সঁগরাউঅন, (২) অদউড়ি পাড়া, (৩) সালা ধতি লুটা, (৪) খির খাউআ, (৫) ঘারভরা, (৬) কেনিআঁই মাঁইএঁ পরছন, (৭) বরেক মাঁইএঁ দহরা চুমানে গবচাউন, চুমান সুঘড়াউঅন, (৮) ঘটি লুকা, (৯) গড়ধউআ হেনতেন। সগুন নেগকর বাইরেক কইটা নেগকর লাতাইড় ধরি তচবিচ করালাহেইক। বাদ বাকি গিলাক হঁতে জাঁগড়া জখে আঁতরাউইঁ। টেঁসনা:-

* **বরেক মাঁইএক দহরি চুমানে গবচাউঅনি, চুমান সুঘড়াউঅন:** বর -কেনিআঁইকে পরছল বাদে বরেক মাঁইএঁ আনগাক ছামড়া তরে মড়ই থানেক মুহান বাটে গবর পানিঁই লেপা-লরা করিকন ছামড়াতরকে সাফা-সুথরা করিকন চুমানে জহড়ল সভে সারভারকে ডিঁগাই দেইকন বর-কেনিআঁইকে দহরা চুমানে গবচাউএইন। অহে দেখাদেখি জহড়ল কুটুমেউ বর-কেনিআঁইকে ইটা সেটা চুমাউথিন। বরেক মাঁইএঁ চুমানে জহড়ল সভে সারভারকে পঁউআঁরেক আইগে রিচিক সেঁকি সুঘড়াউএইক আর বেটা-পুতহুকে আরুআ চাউরে দুব ঘাসে চুমাইকন ঘার ঝিঁকেইন। চুমানে পাউঅল সারভারগিলাকেউ ঘার ঝিঁকেইক।

* **ঘটি লুকা:** এধাঁউ ঘটি লুকাক পালি। বর-কেনিআঁই বর-কেনিআঁইকর সাজে সাজি রহল দসাঁইএঁ বাঁধ জাত আর লুগা ফাটা সাঁকটাইকন ঘটি লুকা খজাক হঁতে বাঁধে ডাঁড়া জখেক পানি হেলিকন পেহিল বরে ঘটি লুকাউএই কেনিআঁইএঁ অহে লুকাউঅল ঘটিটা খজেই তাকর পাছু অঁই লুকাউএই। অকর লুকাউঅল ঘটিটা বরকে খজেহেইক। অহে নিআঁর তেখড় তেখড় তিন তেখড় লুকা আর খজা করেহেইন। তাকর বাদে দিঅ লকে আপন আপন কাঁকনা খুজাইকন বাঁধে ডুবাই দেইকন সিনান নাহান সারিকন ভিজল লুগাঁই ঘার ঘুরত। ঘার ঘুরিকন বরে লুগা পালটেই। মেনতুক কেনিআঁইকে ভিজল লুগাইহিঁ গড় ধউআ নেগ সরাউএহেইক।

* **গড় ধউআ:** কেনিআঁইএঁ জিনগানি ভইরে জাখরাক সঁগ ছুউআছুউই হেউএক নাতা নিঁহিঁ রহেহেইক। টেঁসনা- ভেঁসুর, মামা সসুর এহে ডুল নাতা ধরিআ গুরু চিনহাপ লকগিলাকে জিনগানিক সিরান ছুআন এহে গড় ধউআ নেগ হেকেইক। হেরেঁইদ গাবল ভিজল লুগাঁই অখরা গড় ধইকন জিনগানিভইরকর ছুআন সিরাউএই। আউতি জিনগানিঁই আর কবউ অখরাক সঁগ ছুআছুউই তঅ হেতিএ নিঁহিঁ। অখরাক ছাঁহের এক গুঁহদতি নিঁহিঁ।

সারনা ধরম মতে সরসগুনে হাঁড়ি বিহা সরলেইক। এধাঁউ বঁহরতাক দিন

ঘুর-ফেরে বহু আনন হুকুমনাম নেগ সরাইকন বহু আনবেথিক। বর-কেনিআঁইকর বর-কেনিআঁই নাতা ছিঁটতেইন। মাগ-ভাতার নাউআ নাতা জড়াতেইন। মাগ-ভাতার নাতাঁই আপন ঘার-সঁগসার সামলাউতা। হিআখালাস বেসবাসাবাসিঁই রহিকন জেনিমিলন ভুখ মেটাউঅন বাটেলে আপন কুল, বঁগসঅ বাড়হাউতা। এহেটাই তঅ মাগ-ভাতারকর ধরম। কাহে নঁ আপন মাগ আপন ধরম তিরিআ হেকি আর আপন সঁইআঁ ধরম সঁইআঁণ হেকে। একর মুল হেতু কুড়মি সমাজে সারনা ধরম মত মানি সরসগুনে হাঁড়ি বিহা সরাউঅত। অহেঅরে মাগ-ভাতার ছাড়াছাড়ি হেউআটা ধরম নাসন কাম গনাইক। ধরম নাসন কাম করাটা বেস কাম নহেইক। ধরম নাসন কামে গতর হানেইক, ধন দউলত হানেইক। তনতঁত সাধন ডহরে কাঁটা সাটাইক। আতমাকে পরমাতমাঁই মিলাউএক ডহর মুদাইক এহে কামে সমাজ রগাইক। অহেখাতির সমাজকে পকতাউএক খাতির মাগ-ভাতার জিনগানিভইর বেসবাসাবাসিঁই রহাটা সমাজিআ কামা হেকেইক। মাগ-ভাতার ছাড়াছাড়ি হেউআ চলনটা কুড়মি সমাজে উঘড়লে মর খাটালিটা পসাতি। মর এহে খাখুস সমাজঠিন রহলি। থুম।

10.30 45

মানব সভ্যতার আদিবিন্দু এই ভারতবর্ষ। কৃষি আবিস্কারের মধ্য দিয়ে কোনও একদিন যার সূচনা ঘটেছিল। ক্রমান্বয়ে কৃষি থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল- কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ধর্মের। কৃষি শব্দটির অর্থ নাকি Peoples বা লোকসমূহ। এই লোক সমূহই হলো কুর, কুড় বা কুড়মি। কুর বা লেটিন Cul শব্দটি থেকেই সৃষ্টি হয়েছে- Cult, Culture এবং Cultivation শব্দের। যার পরিণতি কুড়মি জাতি, কুড়মালি ভাষা এবং সংস্কৃতি। বিষয়টির নিবিড় গবেষণা ও বিজ্ঞানসম্মত সন্দর্ভ নিয়ে এই আকর গ্রন্থ।

মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি
রামকৃষ্ণপুর, কালুহার, পুরুলিয়া